সংসার-চক্র।

(অত্যদ্ভুত জীবনী-রহস্য)

অত্যুৎকৃষ্ট ও অতি মনোহর অষ্ট-চিত্র-সম্বলিত।

"মহাভারত-নাট্যকাব্য" প্রণেতা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিরচিত।

২২।২৩নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Calcutta.

PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS.

AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,

No. 24, Beadon Street. E. C.

1896.

মূল্য ১৲ এক টাকা। কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০ টাকা।

উৎসর্গ-পত্র।

সংসার-সাগরে ভেসে— ভ্রমি কত দেশে দেশে
কত কথা কত ব্যথা কত গাথা নিয়ে—
কোথায় এসেছি দোঁহে কি কাজ স্মরিয়ে?
কি বিভোর-ভাবমোহে! কোথায় এসেছি দোঁহে?
এই কি জগত? ছি ছি সমাজ সংসার?
হেথায় আসার কথা ছিল কি ধাতার?
যদ্যপি জানিতে তুমি এ সংসার পাপভূমি!
হেথায় পাপের রাজ্য পাপের প্রশ্রয়,—
হে দেবি! বল নি' কেন আগে সমুদয়?
ব্রজেন্দ্রভূষণ দীন— পথধূলি চেয়ে হীন,
যদি হে জানিতে মোর পূর্ব্ব পরিচয়,
এত তাপ এ অধীনে কভু দিতে হয়?
প্রেমময়ী-দেবীরাণি! মহিয়সী-মহারাণি!
উদ্ধারিণী তুমি সতি! সর্ব্বস্ব আমার!
কভু কি শোধিতে পারি এ ধার তোমার?
এ ভীষণ পাপস্রোতেঃ— এ পাপ সংসার হ'তে—
তুলে নাও তুলে নাও—প্রেমাধার-বুকে,
তুমিই আমার স্বর্গ কি দুখে কি সুখে!
সংসার চাহিনা আর— তুমিই সংসার সার—
আমার হৃদয়ভেদী এই দুখ-গান—
তোমারে অর্পিনু, তুমি কর সদা গান!

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীভগবান্নারায়ণের অনুকম্পায় নানান্ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সংসার-চক্র এতদিন পরে পরিসমাপ্ত হইল। এই সংসার-চক্র বর্ষকতিপয় পূর্ব্বে "সুলভ-দৈনিক" নামা সংবাদ-পত্রে একবিংশচক্র পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহার কিয়দংশ পাঠে পাঠক-পাঠিকামাত্রেই অত্যন্ত বিমোহিত ও প্রীত হইয়াছিলেন, এবং 'সম্পূর্ণ-মিলন' দেখিবার জন্য একান্ত কৌতূহলী ও সমুৎসুক আছেন, সেই সেই ☞ সচিত্র **সংসার-চক্র** অত্যুৎকৃষ্ট ও অতি মনোহর অষ্টচিত্র সম্বলিত হইয়া, এতদিন পরে একখানি বৃহৎ পুস্তকাকারে অতি বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এক্ষণে যাহাতে অনাথ ব্রজেন্দ্রভূষণ বঙ্গবাসীর প্রতি গৃহে গমন করিয়া স্বকীয় অভিনব রহস্যময়ী জীবনীর অসামান্য রহস্যতত্ত্ব প্রকটিত করিতে পারেন, ইহাই সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট প্রকাশকের বিনীত নিবেদন।

কলিকাতা।
২২।২৩ নং বিডন ষ্ট্রীট।
১৪ই শ্রাবণ, ১৩০৩ সাল।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সংসার-চক্র।

প্রথম চক্র।

বিবাহ।

আমার নাম শ্রীব্রজেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার নাম শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস এই কলিকাতার কোন ধনাঢ্যপল্লীতে, পূর্ণ আঠার বৎসর বয়স। রাজার মত আহার বিহার ব্যতীত বৈষয়িক কার্য্য আমার কিছুই নাই। আমি প্রায় সর্ব্বক্ষণই বাড়ীতে থাকি। লোক জন চাকর দাসী দ্বারবান বেহারায় বাড়ী খানি পূর্ণ, আত্মীয়া কুটুম্বিনী প্রভৃতিতে অন্তঃপুর পূর্ণ, গোমস্তা নায়েব কারকুন মুহুরীতে কাছারীবাড়ী পূর্ণ,—খুব জাঁকজমক—খুব জাঁকাল রকমের সংসার।

আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র, সুতরাং খুবই আদরের। পিতা মাতা চক্ষে হারা'ন, পলকে প্রমাদ গণেন, আদর যত্নের কোন অংশেই ক্রটি নাই; চক্ষুর অন্তরাল ভয়ে পিতা মাতা অদ্যাপি কখন আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠা'ন নাই। যদি কখন বিদ্যালয়ের কথা উঠিত, আমার মাতা চক্ষু কপালে উঠাইয়া বলিতেন, "বাপ্‌রে! আমার ব্রজেন্‌কে এতটা সময় একলা ইস্কুলে

রাখ্‌তে পার্‌বো না। বাড়ীতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাষ্টার এসে পড়িয়ে যাক্, এতে ব্রজেনের যতদূর বিদ্যা হয় হোক্। চাকরী কোরে কে আর খেতে হবে না? মা দুর্গা বাঁচিয়ে রাখুন, ওর খাবার পর্‌বার ভাবনা কি?" কাজেই পিতা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। বেলা ১০ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ৩ জন মাষ্টার আসিয়া পড়াইয়া যান। এইরূপ আয়োজনে আমার যাহা কিছু বিদ্যা, তাহা আঠার বৎসরেই শেষ হইল।

রাজার হালেই আছি। সুখ অপরিসীম, কিছুরই অভাব নাই। আমি ত জানি (অবশ্য আঠার বৎসরের মধ্যে) কোনরূপ অভাব আমার জ্ঞানে আইসে নাই। এত সুখে এত স্বচ্ছন্দে রাখিয়াও আমার জননীর আর সাধ অভাব মিটিল না।

একটা কথা বলিয়া রাখি;—বৈকালে ৫টার পর আমার বৈকালিক ভ্রমণের বৈকালিক পরিচ্ছদটা অন্তঃপুরেই হইত;—অর্থাৎ মা নিজ হস্তেই আমাকে সাজাইয়া দিতেন। আমাকে সাজান'র পর* মা আমাকে অনেক্ষণ কি জানি কেন দেখিতেন। এ দৃষ্টিটি কিন্তু আমার এখনও এক একবার মনে হয়, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার যেন সাধ আর মিটিত না।

আমার শয়নের ঘর আমার পিতার শয়নের ঘরের ঠিক পার্শ্বদেশে। রাত্রে যতক্ষণ আমি নিদ্রিত না হই, ততক্ষণ আমার পিতা মাতার চক্ষে ঘুম নাই,—অহোরাত্রই কেবল চোখে চোখে রাখেন—শয়নেরও এইরূপ বিরাট বন্দোবস্ত। এইরূপ মহান্ স্বর্গসুখে ১৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়া আমার পূর্ণ ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইল।

একদিন রাত্রে প্রায় ১০টার সময় আমি শয়নঘরে শয়ন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে আমি এই বড় বড় আওয়াজ ক'টি শুনিতে পাইলাম। মা বাবাকে বলিতেছেন, "দেখ, আমার এই কথাটি রাখ, ব্রজেনের একটি বিয়ে দাও। আমার বড় সাধ, একটি খুব বড়মানুষের ঘরের টুকটুকে রাঙ্গা মেয়ে আনি।

* সব কথা খুলিয়া বলিতে লজ্জা করে, পাছে পাঠকগণের নিকট যশোদার 'নীলমণি' নামে না আখ্যাত হই।

আর ব্রজেনও আমার ষেঠের কোলে আঠার'য় পা দিয়েছে, আর দেখ্‌তে শুন্‌তে—(মর্‌! কি বল্‌ছি! ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস—বেঁচে থাকুক)—তা দেখ, একটি বেশ ভাল দেখে সম্বন্ধ দেখ। আমার এই কথাটি রাখ্‌তেই হবে।" বাবাও না-হুঁ না-হুঁ করিয়া সারিলেন।

এইরূপ প্রতিদিনই মাতার উত্তেজনা। আমিও চুপি চুপি (কথাগুলি ভাল লাগিত কিনা!) সব শুনিতাম; আর বুঝিতামও যে, বাবার ইহাতে খুব ইচ্ছা নাই। তাঁর এইরূপ আন্তরিক ইচ্ছা যে, আর কিছুদিন যাক্‌, বড় হোক্‌, দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিবেন। ফলে কিন্তু তাহা ঘটিল না, জননীর জিদ্‌ই বজায় রহিল। আঠার বৎসর বয়সেই এই সহরের মধ্যে কোন ধনবানের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের জাঁকজমক খুব, গহনার ঘটা ছটা খুব, বাড়ী সাজান'র ধুমধাম খুব, লোকজনের ভিড় খুব, নাচ তামাসার মজা খুব, বৌও বোধ হয় সুন্দরী খুব, এক কথা বলিতে কি, চারিদিকের খুবের আধিক্যটাও খুব। সবই খুব বটে, আমার প্রাণের আনন্দটা কিন্তু খুব হইল না,—মনের কবাটটি কিন্তু খুব খুলিল না। যাক্‌—সে পরের কথা পরে হবে,—এখন যাহা বলিতেছি, তাহাই বলি —

* * * * *

খুব ধূমধামে বিবাহ হইল বটে, খুব ধনবানের* ঘরে বিবাহ করিলামও বটে; কিন্তু আশ্চর্য্য! আমাদের বাটীতে যেমন ধূমধাম, যাহাদের বাটীতে বিবাহ করিলাম, তাহাদের ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না! তাহাদের বাড়ীটি খুব জাঁকাল বটে, কিন্তু বিবাহবাড়ী বলিয়া কোন ক্রমেই প্রমাণ পাই-লাম না। আরও আশ্চর্য্য! আবহমান কাল হইতে যাহা হিন্দু-সমাজে প্রচলিত, সেই শুভদৃষ্টিটি পর্য্যন্তও হইল না। বিবাহের সময় বরপক্ষীয়ের মধ্যে কেবল মাত্র পিতাই উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয়ের জন্য তিনি কিছুমাত্রও

* যেরূপ শুনিয়াছি।

আপত্তি করিলেন না, সুতরাং আমিও নীরব রহিলাম। বলা বাহুল্য, অতি নীরবেই কন্যা সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইল। বাসরেও তদ্রূপ, কন্যা নাই,—কিন্তু বাসরবাসিনীরও অভাব নাই। নীরব হাস্য পরিহাসে সেই নীরব রাত্রি অতি নীরবেই অতিবাহিত হইল। এ নীরবের তাৎপর্য্য কিন্তু কিছুই বুঝিলাম না।

তারপর বাটীতে বৌ-ভাত ; কিন্তু তাহাও অতি নীরবে সম্পাদিত হইল। আমি বাহির হইতে দেখিতেছি ; নিমন্ত্রণ নাই, নিমন্ত্রিত নাই—জনতাও নাই, কেবল শুনিলাম, বৌ-ভাত হইয়া গেল ! বৌ-ভাত হইল বটে, কিন্তু ফুলশয্যা এবং কুসুণ্ডিকা এই দুই কার্য্যই অবশিষ্ট রহিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, আমার পিতামহ হইতে এ দুইটি নিয়ম আমাদের বংশে এক-কালীন নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আমার জননীও ঐরূপ বুঝাইলেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে যে বর কন্যার উভয়ের চোখোচোখীটি হইবারও পৈত্রিক নিয়ম আছে কিনা, তাহা আর লজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তাই বলিতেছি, বিবাহ ব্যাপারের খুবের আধিক্যটা খুব হইল বটে ; আমার মনের আনন্দটা কিন্তু খুব হইল না। এ যেন কেমন লুকোচুরী—কেমন একটু গোপন ভাব ! অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম না।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই এক সপ্তাহ মধ্যে কোন ক্রমেই কিন্তু আমার নবপরিণীতা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। বাড়ীর কাহারও এ বিষয়ের জন্য যত্ন দেখিলাম না, আমিও কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

এক দিন আহারাদির পর আমার বৈঠকখানায় আমি বন্ধুগণ পরিবৃত হইয়া নানারূপ কৌতুকামোদে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার বেহারা আসিয়া কহিল, "কর্ত্তাবাবু আপ্‌কো বোলাতে হেঁ।" আমি তাহাকে বিদায় দিয়া পরক্ষণেই পিতার বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার পিতা একখানি কোচের উপর বসিয়া অন্যমনস্কভাবে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছেন, যেন একটু চিন্তাযুক্ত,—কারণ বুঝিতে পারিলাম

না। আমি যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহাও তিনি দেখিতে পান নাই। কাছে গিয়া বিনীতভাবে কহিলাম, "বাবা! আমাকে ডেকেছেন কি?" পিতা কহিলেন, "হাঁ, কেও ব্রজেন্দ্র? এস বাবা।" তৎপরে ইঙ্গিতে আমাকে সম্মুখবর্ত্তী একখানি কেদারায় বসিতে কহিলেন, আমি বসিলাম। তারপর ধীর নম্রস্বরে কহিলেন, "ব্রজেন্দ্র! তোমাকে আজ শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে। তাঁহাদের বংশপরম্পরায় এইরূপ নিয়ম আছে, বরকন্যাকে লইয়া উভয়পক্ষ একত্র হইয়া, তাঁহাদের উপাস্যদেবতার নিকট পূজা মানসিক দিতে হয়। অদ্য প্রভাতে বৈবাহিকমহাশয় নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। তুমি আমি এবং বধূমাতা আমাদের তিন জনকেই এইক্ষণে যাইতে হইবে, আমিও দুইখানি গাড়ী প্রস্তুত করিতে হুকুম দিয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে আমার গাড়ীতে যাইবে, বধূমাতাকে লইয়া মধুসিং আর তাঁহাদের বাড়ীর দাসী, অন্য গাড়ীতে যাইবেন। তোমার পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই আমার ড্রেসিংরুমে আছে—এখনি সজ্জিত হও; আর দেরী করিও না—সময় নাই।"

তৎক্ষণাৎ আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে গেলাম দেখিলাম পিতার সজ্জাগারে আমার এক সুট নূতন পরিচ্ছদ রহিয়াছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি বাড়ীতে সর্ব্বদা যে পোষাকে থাকি, তদপেক্ষাও সেই নূতন পরিচ্ছদটি সামান্য। একখানি মাত্র কালাপেড়ে কোঁচান কাপড়—একটি সার্ট—তাহাতে মাত্র এক সুট ঝিনুকের বোতাম পরান একখানি কোঁচান দেশী চাদর—একজোড়া ষ্টকিং এবং এক জোড়া সামান্য জুতা। দেখিয়া জানিলাম, সমস্তই নূতন। দেখিয়া শুনিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম,—এ সমস্তের কারণ কি? বিবাহ হইল, কিন্তু স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ নাই। এত জাঁকজমক করিয়া বিবাহ করিতে গেলাম, কিন্তু বিবাহবাটীতে তাহার কিছুই দেখিলাম না, শ্বশুর শাশুড়ীকে পর্য্যন্তও জানিতে পারিলাম না। স্ত্রী-আচার হইল, কিন্তু শুভদৃষ্টি হইল না; বাসর জাগিলাম, কিন্তু বাসরসঙ্গিনীকে দেখিলাম না; বাড়ীতে বৌ-ভাত হইয়া গেল, কিন্তু ফুলশয্যা হইল না; অধিক কি কুসুমণ্ডিকা যাহা

বিবাহের প্রধান কার্য্য, তাহাও হইল না। তবে ইহা কি? বিবাহ—না রহস্য? সাতদিন বিবাহ হইয়াছে, একবারও আমার স্ত্রীকে দেখিতে পাইলাম না, ইহার মধ্যে যে কি ঘোর রহস্য আছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আর এক কথা,—জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত দেখিতেছি, কি ভ্রমণে কি নিমন্ত্রণে যেখানেই যাইনা কেন, আমার জননীই আমাকে সাজাইয়া দেন, আমার জন্য তিনি কতরকম পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছেন। কিন্তু আজ একি! আমি প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছি, কত আনন্দের বিষয়, এই কি আমার শ্বশুরবাড়ী যাইবার পরিচ্ছদ? ভাল, এ সবই স্বীকার করি; বিবাহের পর বরকন্যা উভয়ে মিলিত হইয়া কন্যার বাটীতে গমন করিতে হয়, সামাজিক প্রথানু-সারে তাহাকে 'জোড়ে' যাওয়া কহে। কিন্তু এ জোড় কোথা? এ সবই যে বিজোড়!

যাহাই হউক, অতি সন্দিগ্ধমনে সেই নূতন সুট পরিলাম। বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলাম, পিতাও প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারও বেশ অতি সামান্য! কহিলাম, "একবার তবে বাড়ীর ভিতর যাই—মাকে প্রণাম করিয়া আসি?"—পিতা কহিলেন, "না বাবা! আর একটুও সময় নাই,—গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে,—আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস।"

সবে মাত্র বৈঠকখানা পার হইয়াছি, আমার হস্তের উপর পিতার দৃষ্টি পড়িল। অমনি শশব্যস্তে পিতা কহিলেন, "দাও, তোমার হীরার আংটীটি আমায় দাও, এখন আঙ্গুলে রাখিবার প্রয়োজন নাই।" বলা বাহুল্য, সর্ব্বদাই, এই আংটীটি আমার আঙ্গুলে থাকিত; আমিও অম্লানবদনে আংটীটি খুলিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম। তারপর নতশিরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময় পশ্চাৎদিকে দেখিলাম, আর একখানি গাড়ী খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু সে গাড়ী আমাদের বাড়ীর নহে, বোধ হয় দ্বিতীয়শ্রেণীর একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী। অনুভবে বুঝিলাম, এই বাড়ীর নূতন বউয়ের জন্য ঐ গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। যাহা হউক, আমোদে বিষাদে পিতা পুত্রে গাড়ীতে উঠিলাম। উঠিবা মাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, সেই গাড়ীখানিও আমাদের

সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। আর একটী কথা বলিয়া রাখি ;—সেদিন বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম দক্ষিণমুখে, আজ গাড়ী চলিল উত্তরমুখে।

দ্বিতীয় চক্র।

ভয়াবহ ষড়যন্ত্র—ঘোরতর ইন্দ্রজাল !!

যখন গাড়ীতে উঠি, তখন বেলা ঠিক্ পাঁচটা। গাড়ী বরাবরই উত্তরমুখে চলিল। ক্রমে সহর ছাড়াইয়া—শ্যামবাজারের পোল, টালা, সিঁথি প্রভৃতি ছাড়াইল। সূর্য্যদেব ক্রমে পশ্চিম অচলে শায়িত হইতেছেন, ক্রমেই সন্ধ্যা হইতেছে, আকাশ হইতে ধীরে ধীরে অন্ধকার নাবিতেছে। গাড়ী যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই নীরবতা বৃদ্ধি পাইতেছে। দুই পার্শ্বেই বন জঙ্গল, মাঝে মাঝে এক একখানি ক্ষুদ্র কুটীর; কুটীরের মধ্য হইতে ছোট ছোট আলো আসিয়া কুটীরের দ্বার পর্য্যন্তই বিলীন হইতেছে। জঙ্গল ছাড়িয়া মাঠ। মাঠের মাঝে মাঝে এক একটা ঝোপে রাশি রাশি জোনাকী-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, এবং গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাই না। এই এতটা রাস্তা আসিলাম, পিতার সহিত কোন কথাই হইল না। কথা কহিতে এক একবার চেষ্টা করি, পিতা ইঙ্গিতে তাহার উত্তর দেন। সহর ছাড়াইয়া পর্য্যন্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী গাড়ীখানি আর দেখিতে পাই নাই। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে, সুতরাং আর দেখিবার কোন সম্ভাবনাও নাই; তজ্জন্য আমার একটু উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল। পিতাকে সে

গাড়ীখানির কথা বলিতে বড়ই লজ্জা করে! কি করি, চুপ করিয়াই রহিলাম। আরও দেখিলাম, পিতাও বেশ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া আছেন। অধিকন্তু তাঁহাকে একবারও পশ্চাৎলক্ষ্য করিতে দেখিলাম না। তিনি স্থির—নিস্পন্দ—অথচ চিন্তাযুক্ত!

পূর্ব্বে সিঁতি পর্য্যন্ত আমি রাস্তা চিনিতাম। তাহার কারণ, আমার একটি বন্ধুর ঐ স্থানে সুন্দর বাগানবাটী আছে, কখন কখন আমি সেই বাগানে আসিতাম,—সুতরাং ঐ পর্য্যন্তই রাস্তা জানি;—এখন যে গাড়ী কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনে মনে একটু করিয়া ভয় ও সন্দেহ বৃদ্ধি পায়, তৎক্ষণাৎ পিতাকে দেখিয়াই তাহা নিবৃত্তি হয়। ভাবি, যেখানেই যাইনা কেন, পিতা আমার সঙ্গে আছেন। বিশেষতঃ তাঁহারি সঙ্গে তাঁহারি অভিপ্রেত স্থানে যাইতেছি:—তবে আর কোন ভয়ের কারণ নাই।

এখন যেন আমি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলাম। গাড়ীর ঝুনু ঝুনু শব্দে এবং মৃদুমন্দ আন্দোলনে আমি একটু বেশ তন্দ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। কতকক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম বলিতে পারি না, হটাৎ একটা ঝনঝ্যনাৎ শব্দে আমার তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভীষণ অন্ধকারময় বন প্রদেশ—নির্ব্বাক নিস্তব্ধ—! অনুমান করিলাম, রজনীও ঘোরা দ্বিপ্রহরা! কতদূর আসিলাম কোথায় আসিলাম কিছুই জানি না! পিতাও আমার স্থির ধীর নিস্কম্প! অতি গভীর প্রগাঢ় অন্ধকার মধ্যে নিশ্চেষ্ট—উপবিষ্ট! দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী খানি একটি ভাঙ্গা দ্বিতল বাটির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে বাড়ীখানি দেখিলেই কেমন আপনা হইতেই মনের ভিতর আতঙ্ক জন্মে। গাড়ী থামিবা মাত্রই পিতা আমাকে নামিতে কহিলেন, আমি নামিলাম;—কিন্তু সেই স্থলটি বড় অন্ধকারময়, তাই পিতা সহিসকে গাড়ী হইতে আলো খুলিতে কহিলেন। সহিস আলো লইয়া আগে আগে চলিল, মধ্যে পিতা, পশ্চাতে আমি। এই অবকাশে আলোর সাহায্যে যতদূর পারিলাম, বাড়ীখানির সম্মুখটি দেখিয়া

লইলাম। বাড়ীটি এক কালে বোধহয় প্রকাণ্ড ছিল, কালবশে এখন ভগ্নোন্মুখ। বাড়ী ঢুকিতেই দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ চাতাল, ধরণটি ঠিক পোলের মত; নিম্নে শুষ্ক নর্দ্দামা। সম্মুখেই প্রকাণ্ড দরজা, দরজা কিন্তু কলিকাতার মত নহে। দেখিতে খুব লম্বা চওড়া—দরজার গায়ে অনেকগুলি বড় বড় পেরেক মারা। দরজা বন্ধ ছিল। উপরের দিকে দৃষ্টি করিলাম, সারি সারি বড় বড় জানালা দরজা। সবগুলিই খোলা। বোধ হইল, কেবল চৌকাঠ আভ্যন্তরীক অস্তিত্ব তাহার কিছুই নাই। মাঝে মাঝে এক একখানি বড় বড় কড়ি রাস্তার উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দ্বিতলের উপরিভাগে ছাদ আছে কিনা, অন্ধকারে তাহা আর বড় দেখিতে পাইলাম না। চারিদিকেই জঙ্গল, বাড়ীর গায়ে গায়েও জঙ্গল।

অতঃপর পিতা অগ্রসর হইয়া, সেই পেরেকময় দরজায় একটু আস্তে ধাক্কা মারিলেন। দরজাটি বোধ হয়, সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। পিতা একটু স্বর উচ্চ করিয়া কহিলেন,—"বেয়াই ম'শায়! বেয়াই ম'শায়!" উত্তর নাই। পুনশ্চ, "রায় মশায়!" এই শব্দটি কিছুদূর অন্ধকারে গিয়া মিলাইয়া গেল। বাটীর অভ্যন্তর হইতে একটি প্রতিধ্বনি আসিল, "বেয়াই ম'শায় নাকি?—যাই!"

একটু পরে দেখিলাম, প্রকাণ্ড দরজাটি ঝন্ ঝন্ শব্দে উন্মুক্ত হইল। প্রদীপ হস্তে একটি দীর্ঘাকার লোক দেখা দিলেন। বাহিরের গাড়ীর আলোয় এবং অভ্যন্তরের প্রদীপের আলোয় বেশ দেখা গেল, লোকটি দেখিতে খুব লম্বা চওড়া, খোলা গা, তার উপরে একগাছি ধপ্‌ধপে পৈতা, পরণে থান, পদতলে ভট্‌চার্য্যি চটি, মুখখানি দাড়ী গোঁফে পূর্ণ। সেই ফুলো ফুলো মুখে একটি অট্টহাস্য করিয়া পিতাকে কহিলেন, "আস্তে আজ্ঞা হোক্, আস্তে আজ্ঞা হোক্! এত দেরি? আমি বলি বুঝি আজ আর এলেন না,—আসুন—আসুন।" মহা সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। পিতাও গাড়ী লইয়া যাইতে কোচম্যানকে আদেশ দিলেন, বজ্রধ্বনিতে গাড়ী চলিয়া গেল—এদিকে ঝন্ ঝনাৎ শব্দে দরজাটিও বন্ধ হইল।

বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, সম্মুখে প্রকাণ্ড উঠান। উঠানে ঝোপ ঝাপ খুব, জোনাকিরও প্রাদুর্ভাব খুব। বাড়ীটির দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি রক। আমরা দক্ষিণদিকের রকের উপর উঠিলাম, উঠিয়াই একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর নমস্কার প্রতি-নমস্কারের কুশল-অকুশলের, খুব ধূম পড়িয়া গেল। পিতা আমাকে কহিলেন, "ইনিই তোমার শ্বশুর, ইহাকে প্রণাম কর।" অমি প্রণাম করিলাম, তিনিও অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। ঘরের কোণে একটি টেবিল, তাহার উপর একটি সেজ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। আবর্জ্জনা ও ঝুল্ মাকড়্সার অভাব নাই। দুই তিনটি কুলুঙ্গিতে ছেঁড়া কাগজ পত্রও যথেষ্ট। গৃহের ঠিক্ মধ্য-স্থলের কড়ির নিম্ন হইতে একটি বহুকালের পুরাতন মাচা, তাহার উপর কতকগুলি লেপবালিস। ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু বড় অপরিস্কার, কেমন দুর্গন্ধ! দক্ষিণ কোণে মেজের উপর একটি বিছানা পাতা, সেই বিছানায় আমরা উপবিষ্ট হইলাম!

পিতা কহিলেন,—"ইনিই তোমার শ্বশুর।" আমার কেমন একটু সন্দেহ হইল। সেই বিবাহরাত্রে কর্ম্মকর্ত্তার মত একজনকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার বর্ণ গৌর, মুখের বাহার—অর্থাৎ এমন দাড়ী গোঁফের ছটা দেখি নাই,—"তবে তিনিও এইরূপ দীর্ঘকার বটেন!

আবার ভাবিলাম, হইতেও পারে। সেই কোলাহলের মধ্যে এক রাত্রির জন্য তাঁহাকে দেখা। তাঁহার কি অসুখ করিয়াছিল, তাই বৌ-ভাতেও আমাদের বাটীতে আইসেন নাই; তবে তিনিই বটেন,—আর পিতাও যখন বলিতেছেন, তা'তে আর সন্দেহ কি?

এইরূপ ভাবিতেছি, আর এক একবার ঘরের শোভাটি দেখিতেছি, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক তামাকু সাজা কলিকা সমেত রূপাবাঁধান হুঁকা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার শ্বশুরের হস্তে প্রদান করিল। শ্বশুর মহাশয় শিষ্টাচার দেখাইয়া হুঁকাটি পিতার হস্তে দিলেন। আমার পিতা একবার মাত্র টানিয়াই, হুঁকাটিতে জল বদলান হয় নাই বলিয়া, একটু মিষ্ট পরিহাস করিলেন। শ্বশুর মহাশয়ও একটু সলজ্জে হুঁকা এবং

গাড়ু লইয়া বাহিরে গেলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গেই কি জানি কেন পিতাও উঠিয়া গেলেন; এখন কেবল মাত্র আমিই একাকী সেই ঘরে বসিয়া রহিলাম।

স্রোতের ন্যায় সময় বহিতেছে, আমারও কেবল আবেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। চতুর্দ্দিকেই কেবল সন্দেহ! বিবাহে সন্দেহ—পত্নীতে সন্দেহ—স্থান, কাল, শ্বশুর, শ্বশুরবাড়ী সমস্তই সন্দেহ। অধিক কি বলিব, পাঠক মহাশয়! মার্জ্জনা করিবেন, পিতার প্রতিও কেমন সন্দেহ বোধ হইল! সে দিন বিবাহ করিলাম, সহরের মধ্যে কোন ধনবানের বাটীতে দক্ষিণ মুখে, আজ আসিলাম উত্তর মুখে। এ যে কোন্ স্থান তাহাও জানি না। কি জানি কেন মনে এত ব্যাকুলতা।

স্থির চিত্তে এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময়ে চুপি চুপি কতকগুলি অস্পষ্ট স্বর শুনিলাম। কথাগুলি কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না, উৎগ্রীব এবং উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। বুঝিলাম, পূর্ব্ব দিকের জানালা হইতে ধীরে ধীরে স্বর উত্থিত হইতেছে। ভয়ানক সন্দিগ্ধ হইয়া আস্তে আস্তে জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। কি সর্ব্বনাশ! দেখি, যমাকৃতি দুইজন ভোজপুরী-লাঠিয়ালের সঙ্গে আমার পিতা কথা কহিতেছেন। লাঠিয়ালের একজনের হাতে একটি ঝোলান আলো;—সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে করাল অন্ধকার-ময় পাপপুরুষদ্বয়ের ভয়ঙ্কর আকৃতি সেই ক্ষুদ্র আলোতে আরও ভয়ঙ্কর দেখা-ইতে লাগিল! আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া জানালার ফাটাল হইতে সমস্তই শুনিতেছি;—

পিতা। "তবে তোরা রাজী হ'লিনে?"

লাঠিয়াল। "নে হি বাবু! শোয়া রুপেয়াসে এৎনা বড়া কাম্ করে গা? হুজুর! কাম্‌কা মাফিক্ রুপেয়া দেও?"

পিতা। "জানি, তো ব্যাটাদের অল্পে পাবার যো নেই। আচ্ছা নে, তোরা দু বেটায় ১০০৲+১০০৲=২০০৲ নে। কেমন, রাজী ত?"

দ্বিতীয় লাঠিয়াল কহিল, "শুনিয়ে বাবু, হামারা জবান্ শুনিয়ে। আড়হা-ইস—আড়হাইস পাঁন্‌শো রুপেয়া দো আদ্‌মিকো দে দেও, একদম্‌সে সব

সাবাড়্ কর্ দেগা। লেকেন দেখিয়ে বাবু, কুছ জবরদস্তি না হোই—সব এক দম্‌সে মর্ যাগা।”

পিতা। “তোদের দেব ৫০্, রায় মশাইকে দেব ৫০০্, বাড়ীওয়ালাকে দেব ৫০০্, তবে আমার থাকবে কি ?” লাঠিয়াল দুই জন সমস্বরে কহিয়া উঠিল, “তব্ ক্যা হোগা—সেলাম বাবু !” এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যম করিল। আমার পিতা তখন তটস্থ। শশব্যস্তে পুনশ্চ তাহাদের ডাকিয়া কহিলেন, “ওরে—শোন্ শোন্ ! তোরা চটিস্ কেন ? আচ্ছা তাই হ'বে। কিন্তু দেখো বাবা, কোন রকম না গোলমাল হয়, না ফেরে পড়ি। এখন ৫০্+৫০্ ক'রে এই আগাম নে।” এই বলিয়া তাহাদের দুই জনকেই ৫০্+৫০্ দুইখানি নোট দিলেন। তাহারাও মহানন্দে পুলকিত হইল। তাহারা চলিয়া যায়, এমন সময়ে তিনি আবার তাহাদের ডাকিয়া কহিলেন,—“ওরে দ্যাখ্ ! আমি ঐ পশ্চিম দিকের ঝোপটায় থাকব। সঙ্কেত-কথা শোন্‌বা মাত্রই যেন তোদের পাই।” “যো হুকুম বাবু !” বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। পিতাও পাশ কাটাইলেন, আমিও ত্রস্তে পূর্ব্ববৎ বিছানায় আসিয়া বসিলাম। কিন্তু দারুণ সন্দেহে ও ভয়ে আমার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে লাগিল।

ভাবিলাম, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? ইনিই কি আমার সেই স্নেহময় পিতা ? উঃ একি নারকীয় ব্যাপার ! একি পরামর্শ ! ! এ কিসের ষড়যন্ত্র ! ! ! আমি এককালে হতবুদ্ধি ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম। চারিদিকে যেন অন্ধকার দেখিলাম—বুকের ভিতর ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল, বসিতে পারিলাম না, সেই শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। যদিও একবারে অচৈতন্য হই নাই, তত্রাচ বাহেন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়াই রহিল না।

কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলাম, জানি না। ধীরে ধীরে আমার চৈতন্য আসিল—যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত হইলাম। তখনও চক্ষু চাহি নাই, কর্ণে এই কথাগুলি প্রবেশ করিল। “আহা ছেলেমানুষ, ননীর পুতুল ! কখন ত ক্লেশ ভোগ করে নি ! এই এতটা রাস্তা গাড়ী ক'রে এসেছে, তার পর এই বিছানা পত্র, কাজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেয়াই মশাই, একবার ডাকুন

দেখি? অনেকক্ষণ হ'ল, খাবার দাবার যে জুড়িয়ে গেল!" এই স্বরটি সেই দীর্ঘাকার পুরুষের—অথবা আমার শ্বশুরের।

পিতা আমার সেই বাৎসল্যমাখা স্নেহস্বরে কহিলেন, "ব্রজেন্দ্র! ব্রজেন্দ্র! কোন অসুখ করে নাই ত বাবা? সন্ধ্যার সময় এত ঘুমাচ্ছ কেন বাবা? ওঠ—জল টল খাও, তোমার শ্বশুর তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে ডাকৃছেন,—কোন অসুখ হয় নি ত বাবা?" "আজ্ঞে না—" বলিয়া আমি ধীরে ধীরে উঠিলাম। তখন যে আমার মনের কি অবস্থা, তা ভগবানই জানেন! জল খাবার খাইব কি, তখন আমি ভয়ে আর সন্দেহে কণ্টকিত। একবার অলক্ষ্যে পিতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, কি বিভীষিকা-ময় ছবি! রক্তাভ-চক্ষু কুটীল, যেন কোন ভয়ানক কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন!

শ্বশুর কহিলেন, "এস বাবা, বাড়ীর ভিতর এস, মেয়েরা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছে। তুমি ঘুমাচ্ছ বোলে আর আমরা ডাকিনি। হাত পা মুখ ধোও—একটু ঠাণ্ডা হবে চল।" আমিও দ্বিরুক্তি করিলাম না, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলাম।

ক্রমে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম। সেটিও ঠিক বারবাড়ীর মত; তবে বড় অন্ধকার—সব দেখিতে পাইলাম না। একটি মাত্র আলো শ্বশুরের হস্তে ঝোলান; তাহাতে যতদূর পারিলাম গমনাগমনের পথ দেখিয়া লইলাম। উঠান হইতে সিঁড়ি পার হইয়া একটি প্রশস্ত দরদালানে উপস্থিত হইলাম। তাহারি কুলুঙ্গিতে টিম্ টিম্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিলাম দালানটি পতনোন্মুখ, চুণ বালী কিছুই নাই, ইটগুলি লোনা লাগিয়া এক একখানি করিয়া খসিতেছে। সেই কেমন এক রকম ভেপ্‌সা গন্ধ!

যাই হোক, দালান পার হইয়া বাম দিকের একটি কোণের ঘরে প্রবিষ্ট হইলাম। ঘরটি খুব ছোটও নয়, কিন্তু খুব বড়ও নয়। ঘরের ভিতর তিনটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন, একটি অৰ্দ্ধবয়স্কা অৰ্দ্ধঅবগুণ্ঠনবতী, আর দুইটি বৃদ্ধা! অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরটি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম! ঘরের বামদিকের কোণে স্তরে স্তরে অনেকগুলি থালা রেকাব গ্লাস প্রভৃতি সাজান,

একটি জল চৌকি, তার উপর ছোট একটি টিনের বাক্স, তার পরেই একটি আন্‌লা, আন্‌লার কতকগুলি পাছাপেড়ে মেয়েলী কাপড় কোঁচান, একটি বড় গাছ-সিন্দুক; দক্ষিণ দিকে মশারি ফেলা শুদ্ধ একটি খাট বিছানা, খাটের নিচেয় একটি ঢাকা। দেয়ালের চারিদিকে কতকগুলি কালী-ঘাটের পট আঁটা, কড়ি কাঠ হইতে একটি শিকা ঝুলান, তাহার মধ্যে একটি রং চং করা হাঁড়ী, ঘরের মধ্যস্থলে একখানি রেকাবে কতকগুলি খাবার সাজান, সম্মুখে একটি মাজা ঘসা প্রদীপ, একখানি কারপেটের আসন পাতা। আমার শ্বশুর মহাশয় একেবারে সেই আসনের উপর গিয়া আমাকে দাঁড় করাইলেন। আমার হাতে ৪টি টাকা দিয়া কহিলেন, "যাও বাবা, আমার মায়ের পেছনে ঐ যিনি বোসে আছেন, উনি তোমার শাশুড়ী, ওঁকে এই টাকা দিয়া প্রণাম কর গে।"

আমি হতভম্ব! যা বলিতেছেন, আমি তাই করিতেছি। আমি শাশুড়ীর পদতলে ৪টি টাকা দিয়া প্রণাম করিলাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী কি অস্পষ্ট স্বরে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বৃদ্ধাদ্বয়ের চরণগুলিতেও প্রণত হইলাম। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে যৎপরোনাস্তি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তন্মধ্যে সত্বর-পুত্র-কামনাটাই আশীর্ব্বাদের কিছু বেশী মর্ম্ম। আমার শ্বশুর কহিলেন, "দেখ দেখি মা, কেমন জামাই হয়েছে? রূপেও যেমন কার্ত্তিক"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, আর অমনি একজন বৃদ্ধা তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন,—"আর গুণেও তেমনি গণেশ!" এই কথাটির পর যে একটা উৎকট হাস্যধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা আমার কর্ণে এখনও লিপ্ত রহিয়াছে।

শ্বশুর কহিলেন, "তবে মা, তোমাদের নাত্‌-জামাইকে নিয়ে খাওয়াও দাওয়াও, আমি বেয়াই মশায়ের জলযোগের উদ্যোগ করিগে।" তারপর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "খাও বাবা! বেশ পেট পূরে খাও, কোন লজ্জা ক'রনা, এ তোমারি বাড়ী—তোমারই ঘর। তোমার শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীরা রইলেন, কোন ভয় ক'রনা বাবা!" এই বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন।

এখন পর্য্যন্ত আমি জলখাবারে হাত দিই নাই, চুপ করিয়াই বসিয়া আছি। আমার শ্বশুরও বহির্ব্বাটিতে গমন করিলেন, আর আমার শাশুড়ী অমনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "খাও বাবা খাও, লজ্জা কা'কে ক'চ্চ বাবা? আমরা কি তোমার পর? আমার মৃণোর বর তুমি। তুমি যে আমার কত আদরের, তা তুমি কি বুঝ্‌বে বাবা? আহা বড় ক্লেশ হয়েছে। হাঁ বাবা, ঐ বাইরের খারাপ বিছানায় বাইরের লোকের মতন কি ঘুমিয়ে পড়্‌তে হয়? তোমার জন্যে এই খাট বিছানা সাজান রয়েছে; খাও বাবা, খাও,—খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়। আহা, এই এত খানি গাড়ীতে এসে বাছা যেন নেতিয়ে প'ড়েছে;—খাও বাবা খাও।"

মহা পীড়াপীড়ি! যত এঁরা বলেন খাও, ততই আমার ভয় বাড়ে। আমি চুপটি করিয়া বসিয়া আছি, আকাশ পাতাল ভাবি, আর ইহাদের আদরের ঘটা দেখি।—যেন কি ভুল হইয়াছে, যেন কি ইন্দ্রপাত হইয়াছে—আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ওমা একি গো! গয়লানী মাগী এখনও ক্ষীর দিয়ে গেল না? মা, জামাইকে বেশ করে খাওয়াও, আমি একবার কর্ত্তাকে ডেকে বলি যে এখনও ক্ষীর দিয়ে গেল না।" এই বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

আমার দিদিশাশুড়ী কহিলেন, "মাইরি মাইরি! বরের আর আমার চক্ষু লজ্জা ঘোচেনা! বলি হাঁরে শালা! তুমি বোবা কালা দুইই? হাতটি বার কর, ক্রমিক যে পেটের ভেতর লুকোয়! নে ভাই, খা, আর জ্বালাস্ নে!"

কি করি, খাইতেও প্রবৃত্তি হয়না, বাক্যযন্ত্রণাও সহ্য হয় না! অনেক পীড়াপীড়ির পর সকাতরে কহিলাম, "আমার ক্ষুধা নাই।"

তা কি শোনেন? তাঁরা আরও যো পাইয়া বসিলেন। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর রফা হইল, যদি "মৃণো" এখানে আসিয়া বসেন, তাহা হইলে খাইতে পারি।

পাঠক মহাশয়! মৃণো নাম আর কখন শুনেছেন কি? ইহাদের বাক্য মত

বুঝিতেছি যে, মৃণো আমার সহধর্ম্মিনী, আর তাঁহার নাম মৃণো। তবে তিনি মৃণ্ময়ী কি মৃণালিনী, তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। যাহা হউক, এই উপলক্ষে আমার একটা সুবিধা হইল। আজ সাত দিন ধরিয়া যাঁহাকে খুঁজিতেছি, যাঁহার জন্য এতটা সহিতেছি, আমার মুখ-চোরা-গুণেই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। কিন্তু হইলে কি হয়, এখনো পর্য্যন্ত আমার সেই ভাব—সেই চুপ—সেই চোরা-মুখ।

বৃদ্ধা অথবা আমার দিদিশাশুড়ী কহিলেন, "ওলো হীরের মা! যা মৃণোকে নিয়ে আয়, তান্‌লে যে নাত্‌-জামাই না খেয়ে মারা যায়।" "যাই—ডেকে আনি" বলিয়া হীরের মা প্রস্থান করিল। এতক্ষণ হীরের মা চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া ছিল, সুতরাং এত লক্ষ্য করি নাই। উঠিয়া যাইবার সময় প্রদীপের আলোয় তাহার মুখখানি দেখিলাম, দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। এ সেই! যে বাইরের ঘরে আমার শ্বশুরের হাতে হুঁকা দিয়া আসিয়াছিল। রহস্য মন্দ নয়, অভিনয়ও মন্দ নয়! সময়ে দাসীও হন, আবার সময়ে প্রতিবেশিনীও হন;—দেখি কত দূর কি ঘটে! বৃদ্ধা কহিলেন, "ছি ভাই! তুমি বড় বেহায়া! এই সাতদিনের মধ্যেই এত ভাব? মৃণো না কাছে বস্‌লে খাওয়া হবে না? তা বেশ বেশ, এইত চাই। মৃণোকে সোণার চক্ষে দেখ—মৃণোকে রাজরাণী কর!"

এমন সময়ে বাহিরে রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু সুমধুর ধ্বনি শোনা গেল। বৃদ্ধা অমনি গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন। বাহির হইতেই এই বড় বড় আওয়াজ ক'টি পাইলাম;—

"যা ভাই নাত্‌নি! যা, তোকে না দেখ্‌লে নাত্‌ জামাই কিছু খাবে না। আহা যা যা!" স্বর ক্রমেই খাট, ক্রমেই অস্পষ্ট, ক্রমেই চুপি চুপি, অবশেষে ফুস্‌ ফুস্‌!

আমি একমনে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, একটি নবীনা রমণী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দরজায় খিল দিলেন। তারপর—তারপর—অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আমি অবাক! এই কি আমার নব পরিণীতা সাতদিনের স্ত্রী?

হরি ! হরি ! একি ব্যাপার ! অদ্ভুত লুকোচুরি !! ভয়ানক কারখানা !!! আমি নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম; সুন্দরী বটে। বর্ণ গৌরোজ্জ্বল, এলাইত বেণী, সুটানা সুন্দর চক্ষু, রামধনুর ন্যায় ভ্রুযুগ, ক্ষুদ্র কপাল, নাসিকাটি তিল ফুল, অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্ব, দন্ত মুক্তা বীথি, অঙ্গসৌষ্টব ষোলকলায় পূর্ণ, রমণী ষোড়শী যুবতী—সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ! অতি অপূর্ব্ব !! অতি আশ্চর্য্য !!!

আমি ভয়চকিতবিস্ময়কুতূহলে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছি, দেখিলাম, সুন্দরীর অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে ; ক্রমে বিকাশ, ক্রমে বিলোলকটাক্ষ সহিত মৃদু হাস্য ;—ক্রমে একটি কথা ফুটিল,—বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বর একটি ধ্বনিত হইল,—"আমায় কি দেখ্‌চ ?" আমি আরও অবাক্ ! আবার বীণার ঝঙ্কার—"আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন ?" আমি সবিস্ময়ে কহিলাম, "তোমাকে আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, তুমি কে ?" নবীনা কহিলেন, "আমাকে চিন্তে পাচ্ছনা ? ওমা, কোথা যাব গো ! আমি যে তোমার ইস্তিরী !" আমি কহিলাম, "দেখ, ছলনা ত্যাগ কর। বল, সত্য ক'রে বল তুমি কে ? তোমরা দয়ার জাতি, দয়া ক'রে বল আমি কোথায় এসেছি ? আমি যেন কোন রহস্যের জালে জড়িত হয়েছি। একি স্বপ্ন—কি কুহক—কি সত্য কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা !" নবীনা কহিলেন, "ন্যাকামি রাখ, আর বক্তিমে কোত্তে হবেনা। তুমি খাবে কিনা বল ! ওমা, কেমন পুরুষ গো—আপনার ইস্তিরীকে চিন্‌তে পারেনা ?" এই বলিয়াই সুন্দরী একটি গান ধরিলেন ঃ—

গীত। *

ও যে—জেনে শুনে মনে ভুলে থাকে—
তা'কে প্রণয়ী বলিব কেমনে ?
ছি ছি! এত ছলা জান বঁধুরে!
খেলা রাখ মনে গোপনে ?
এত কথা দিয়ে এত আশা দিয়ে
যদি পূরণ করিতে নারিলে,
তবে—আঁখি-কোণে কেন ফাঁদ পাতিয়ে
সরলা হরিণী বধিলে ?
প্রাণ জর জর—প্রাণ থর থর,
প্রাণে প্রেম-ভার আর সহে না,
প্রাণে প্রাণে মিলন-ডোর—
বাঁধনা ও প্রাণ! বাঁধনা!

কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুমিষ্ট সঙ্গীত! জীবনে আমি এমন আর কখন শুনি নাই। সুন্দরী আমার হাতখানি ধরিয়া, কত ভাবে কত ছাঁদে, কত সোহাগ জানাইয়া এই গানটি গাহিলেন। আমি চকিত—ভীত—মন্ত্রমুগ্ধ! সুন্দরী ক্রমে ক্রমে এক একখানি করিয়া খাবার আমার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। আমি নিষেধ করিতে পারিলাম না, স্থির নিশ্চল হইয়া রেকাব খানিকে প্রায় উদরস্থ করিলাম। সুন্দরী যেন মহা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "দেখ দেখি আমায় কেমন খুসি কোল্লে? এই ত চাই। তামাক খাও কি? তামাক সেজে এনে দেব?" আমি বলিলাম, "না—আমি তামাক খাইনা।" "তবে এখন কি করবে বল?" রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন।

---

* বেহাগ——একতালা।

আমি কহিলাম, "আমার একটি কথা রাখ; তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব, বল, অনুগ্রহ ক'রে তার উত্তর দেবে?" রমণী কহিলেন, "সে কি! তুমি আমার সোয়ামি, আমি তোমার পরিবার, তুমি জিজ্ঞাসা কল্লে আমি তার উত্তর দেব না?" আমি কহিলাম, "তবে তুমি কে? একি! আমার শরীর এমন কচ্ছে কেন? মাথা ঘূরে আস্‌চে, এমন ঝাপ্‌সা দেখ্‌চি কেন? ওগো! বল বল, তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে কি খাওয়ালে—বল বল তুমি কে?" রমণী অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ আমি—আমি কে? আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছনা? আমি—তোমার সর্ব্বস্ব; আমি তোমার সংসারসাগরের ধ্রুবতারা! ক্রমে মিল্‌বে—পরে মিল্‌বে! যখন বুঝ্‌বে—তখন চিন্‌বে! আমি তোমার অতি আপনার—আপনার হ'তে আপনার!—" আর শুনিতে পাই না, চক্ষে দেখিতে পাই না—কি হইতে কি হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!—

ক্রমেই আমার শরীর গুরুভারে পাষাণবৎ হইতেছে, অন্তিম সাহসে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "বাবা গো! তুমি কোথায়!" তারপর আর কিছুই মনে রহিল না, আমি নিঃসাড় মড়ার মতন সেই ভূমিতলে পতিত হইলাম।

তৃতীয় চক্র।

১০নং গারদ।

কতক্ষণ আমি এই অবস্থায় ছিলাম বলিতে পারি না। একটু যখন চৈতন্য হইল, বুঝিলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় ভারী, মস্তক তুলিতে পারিনা, অত্যন্ত দুর্ব্বল। ক্রমে যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, আমার গায়ে জামা

নাই, পায়ে ষ্টকিং নাই, কেবল মাত্র একখানি ছোট কাপড় আমার কোমরে জড়ান। আরও দেখিলাম, আমার বিছানা নাই, খুব পাৎলা করিয়া বিচালী বিছান—তাহার উপরে শুইয়া আছি, মস্তকেও একটী বালিশের মতন বিচালীর আঁটি। চক্ষু চাহিয়া দেখি, ঘোর অন্ধকার! প্রাণে ভয়ঙ্কর ভয় জন্মিল! এ কোথায় আসিলাম? কে আমাকে এখানে লইয়া আসিল? নিদারুণ হতাশ্বাসে নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় প্রাণ বড়ই কাঁদিয়া উঠিল, চক্ষুর জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। মনে কেবলি ভাবিতে লাগিলাম, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ করিল? উঃ পিতঃ পিতঃ! আপনি কি যথার্থই আমার জন্মদাতা পিতা? আপনার কি এই কাজ? হা! পিতা হইয়া এমন কাজ করিলেন? উঃ মাগো! তুমি কোথায়? মা—মা! আমি এত বড় হইলাম—কখন ত চক্ষের আড় কর নাই, আজ দেখ, তোমার ব্রজেন্দ্র কালঅন্ধকূপে মৃতপ্রায় পতিত আছে! একি হইল, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না? এত দিন কি মহাভ্রমে পড়িয়াছিলাম? মোহান্ধচক্ষু এত দিন পরে কি প্রস্ফুটিত হইল? এতদিন পরে কি আমার সংসারের জীবনের ঘোর রহস্য উন্মোচিত হইল? হা সংসার! তোমার মায়া বুঝে কার সাধ্য? হাঁ—ঠিক্, নিশ্চয়ই তাই! ধন, ঐশ্বর্য্য, সংসার, আত্মীয়, কুটুম্ব, বিবাহ, পত্নী, পিতা, মাতা সমস্তই জাল! আজ জানিলাম, এ জগতে আমার কেহই নাই। এখন আমার সমস্তই স্মরণ হইতেছে;—সেই পাপপুরীতে আমার পিতামাতার গোপন-পরামর্শ, সেই গোপন-পরামর্শের ফল বিবাহের বাহাড়ম্বর, চিন্তাকুল পিতার সহিত একত্র সমাবেশ, পিতা পুত্রে নীরবে এই নরককুণ্ডে আগমন, পিতার ষড়যন্ত্র, এ বাটীর ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড, সেই মায়াবিনীর ভৌতিক অভিনয়, পুনশ্চ এ অন্ধকূপে মৃতপ্রায় হইয়া পতন, এ সমস্ত দেখিয়া আমার বেশ বোধ হইতেছে আমার বিনাশ সাধনই এদের উদ্দেশ্য; কিন্তু আমি কি অপরাধ করিয়াছি? হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ ভগবন্! তোমার কাছে ত অজানিত কিছুই নাই? আমায় বলিয়া দাও, কিপাপে আমার এ দুর্দ্দশা—আমার প্রাণ যায়, উদ্ধারিন্! আমায় উদ্ধার কর।

মনেমনে এই সমস্ত ভাবি, আর অজস্র ধারে কাঁদি, এমন সময়ে দেখি-

লাম, কড়িকাষ্ঠের নিম্নদেশ হইতে ধীরে ধীরে আলোক আসিতেছে। অনুভবে বোধ হইল, কড়ির নিম্নে নিম্নে ঘুলঘুলি আছে, তাহার ভিতর হইতেই তরুণ সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, কড়ির নিম্নদেশের চারিদিকেই ছোট ছোট ঘুলঘুলি। ক্রমে রৌদ্রের আভাও আসিতে লাগিল; এক্ষণে ঘরটির নিম্ন ভাগ বেশ দেখিতে পাইলাম। ঘরটি প্রায় ৫ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া। একটি মাত্রও জানালা নাই, কেবল কড়ি প্রমাণ একটা প্রকাণ্ড লৌহদরজা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। গাঁথনী খুব মজবুত, নূতন বলিয়াই বোধ হয়, এমন কি একটু চুন পর্য্যন্তও খসে নাই। একটি মাত্র লোক থাকিতে পারে, এমন ভাবে ঘরটি প্রস্তুত। বিচালীর বিছানা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ঘরটির চারিদিক বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন রূপ পলায়নের পথ দেখিতে পাইলাম না; তখন হতাশ্বাস হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

একবার প্রাণপণে চীৎকার করিলাম, "কে আছ—আমায় উদ্ধার কর!" সে কাতরোক্তি গৃহমধ্যেই প্রতিধ্বনিত হইল। কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। একবার ভাবিলাম, কোনরূপে দেয়াল বহিয়া উঠিয়া ঘুলঘুলি দিয়া দেখি, কাহাকেও দেখিতে পাই কি না! অনেক বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। সে দেয়াল তৈলবৎ, কোন ক্রমেই উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল, দাঁড়াইতে পারিলাম না, সটান পড়িয়া গেলাম। পড়িবার সময় মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল, সহ্য করিতে পারিলাম না—অচেতন হইলাম।

চতুর্থ চক্র।

উত্তরমুখে।

এইরূপ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানিনা, কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট ঝন্‌-ঝনান্‌ শব্দে আমার মোহ ভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখি, একটা অতি অসভ্য হিন্দুস্থানী বেহারার মতন লোক অন্নব্যঞ্জন সমেত একখানি থালা হস্তে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। দ্রুতবেগে উঠিয়াই তাহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। নিদারুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে তাহাকে কহিলাম, "তুমি যেই হও, তুমি আমার ভগবান—আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। বিপন্নকে দয়া কর, দয়া করে আমায় প্রাণদান দাও; তোমার ভাল হবে, আমার যথা-সর্ব্বস্ব তোমাকে দান কর্‌ব।" কিন্তু কে বা শোনে! সে এমনি ভাবভঙ্গী দেখাইল যে, সে কালা—সে শুনিতে পায়না, আর আমাকেও তার উপকার করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। সে আমার সম্মুখে এক গ্লাস জল ও থালা খানি রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষুৎপিপাসায় তখন আমার প্রাণ যায়, যা পারিলাম খাইয়া কিছু সুস্থ হইলাম। পরে সে থালা প্রভৃতি লইয়া লৌহকবাট লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। দারুণ সঙ্কটে নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় চক্ষের জলে সে দিনটি কাটিয়া গেল।

আমার সময়-পরিমাণ যন্ত্র সেই ঘুলঘুলি গুলি। সর্ব্বদাই সেই দিকে চাহিয়া আছি; দেখিলাম, দিনের আলো ক্রমে অপসৃত হইল, ঘুলঘুলি হইতে অন্ধকার আসিয়া ক্ষুদ্র গৃহটিকে আচ্ছন্ন করিল। আমি অন্ধকারে রোরুদ্যমান—নিঃসহায়—একাকী। প্রাণপণে জগদীশ্বরকে ডাকিতেছি, মুহুর্মুহুঃ চক্ষুজল মুছিতেছি। এমন সময়ে ঝন্‌ঝনাৎ শব্দে পুনরায় সেই লৌহ দরজা উন্মুক্ত হইল।

দেখিলাম, সেই বিকট আকার লোকটা আহারীয় হস্তে আমার সম্মুখে

দণ্ডায়মান। তাহার পা জড়াইয়া আমি কত কথা কহিলাম, কত রোদন করিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। সে কালা এবং বোবা, সে শুনিতেও পায়না বলিতেও পারেনা। যাহা হউক, অন্ধকারময় কালপুরীতে সেই জঘন্য অন্যব্যঞ্জন যতদূর পারিলাম, উদরস্থ করিলাম। আহারাদি শেষ হইলে, থালা প্রভৃতি লইয়া লৌহ দরজা বন্ধ করিয়া সে লোকটা প্রস্থান করিল।

রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এখন ঘুলঘুলির পথ হইতে রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া ক্ষুদ্র ঘরটিকে আচ্ছন্ন করিল। বাহিরে যত অন্ধকার, তদপেক্ষাও অন্ধকার আমার প্রাণের ভিতর। কতদিন যে এই কালঅন্ধকূপে থাকিতে হইবে, তাহা জানি না। নিশ্চয় আমাকে এইরূপ দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরিতে হইবে। কিন্তু কারণ যে কি, কেন যে আমার বক্ষে এমন বজ্রাঘাত হইল, কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া সে রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে অতিবাহিত হইল। ক্রমে ঘুলঘুলির মুখে অস্পষ্ট আলো দেখা দিল, ক্রমেই ধীর কোলাহল আসিতে লাগিল, ভাবিলাম প্রভাত হইয়াছে। বিচালীর শয্যা হইতে উঠিলাম, উঠিয়াই আবার চারিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পলায়নের চেষ্টা ব্যতিত আর আমার কোন কার্য্যই নাই। হঠাৎ একটি কথা আমার মনে পড়িল। এইরূপ গুপ্তগৃহের কথা পুস্তকেও পড়িয়াছি, গল্পেও শুনিয়াছি। গৃহের তলভাগে কোন কোন গুপ্তগৃহের সুড়ঙ্গ থাকে। তখনি বিচালীগুলি সরাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম, খুব দৃঢ়রূপে পাথর বিছানু, সুড়ঙ্গের কোন চিহ্নই পাইলাম না।

উঠিলাম, দেয়ালের চারিদিক বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তিন চারিবার পরিক্রমণের পর পশ্চিমদিকের দেয়ালের উপর হঠাৎ আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, দেয়ালে কতকগুলি হিজিবিজি কাটা। যেন কে কি লিখিয়া পুনশ্চ অনেক গুলি দাগ দিয়া কাটিয়া দিয়াছে। মনে একটু কৌতূহল হইল। লেখাটি কি, দেখিবার জন্য মনে বড়ই ব্যগ্রতা জন্মিল। বিশেষ মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিলাম, পড়িতে পারিলাম না। শেষে অনেকক্ষণের পর অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, চারিটি অক্ষর। লেখা বাজালা, বড়

অস্পষ্ট, বড়ই আঁকা বাঁকা। যাহা হউক, অনেক কষ্টে লেখাটি পড়িতে পারিলাম, অসংলগ্নভাবে লেখাটি এইরূপ—"**শশীবালা**"।

স্ত্রীলোকের নাম দেখিয়া চমকিত হইলাম! কি আশ্চর্য্য! এ হেন অন্ধকূপে স্ত্রীলোকের নাম লেখা কেন? ভাবিলাম, এই কি পাপিষ্ঠদের বধ্যভূমি? অনাথ অনাথাদিগকে ভুলাইয়া আনিয়া কি এইরূপে প্রাণে বিনষ্ট করে? হায় হায়, না জানি কোন্ অসহায়া কামিনী এইরূপে হত্যা হইয়াছে! মৃত্যুপথের পথিককে সাবধান করিবার জন্য আপনার নাম অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু শশীবালা কে? আহা নামটি বড়ই মধুর! ওরে, কোন্ হতভাগিনী কুলের কামিনী এই নরককুণ্ডে বন্দিনী হইয়াছিলেন, শেষে হয় ত সতীত্ব রক্ষার ভয়ে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। শশীবালা নামটি শুনিলেই কেমন প্রাণে একটি দূর হইতেই সরলতামাখা সুন্দরী অব্যক্তময়ী ছায়া আইসে পড়ে।

এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বেলাও বাড়িতে লাগিল। বিকটশব্দে সেই লৌহ দরজাও উন্মুক্ত হইল। যে লোকটা আসিয়া আমাকে আহার্য্য প্রদান করে, আজ কিন্তু সে লোক নহে;—একটি পরম সুন্দর কমনীয়কান্তি রমণীয় বালক। বালকের পরিচ্ছদটি বেশ ধপ্ ধপে, গাঁয়ে জামাজোড়াও যথেষ্ট, হিন্দুস্থানী ধরণের কাপড় পরা, পায়ে জুতা নাই, মস্তকে একটি হিন্দুস্থানী টুপী। মুখখানি অতি সুন্দর—নিস্কলঙ্ক—বর্ণ গৌর। গোঁফের রেখাটি পর্য্যন্তও নাই! বয়স অনুমান ১৩ কি ১৪ বৎসর। বালকটি আমার সম্মুখে সেই কদর্য্য অন্নব্যঞ্জন সমেত থালাখানি এবং গ্লাসটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আহার করিব কি, সুকুমার বালকটিকে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ভাবিলাম, এ পাপপুরীতে এই নরককুণ্ডে এমন প্রতিভাময় বালকটি কে? বুঝি করুণানিদান ভগবান আমার উদ্ধারের জন্য বালকটিকে প্রেরণ করিয়াছেন। বড় আশায় আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে বিনীতভাবে কহিলাম,—"ভাই! যদি তুমি ঈশ্বরের জীব হও, যদি তোমাতে একটুও পুরুষত্ব থাকে, তবে আমায় কৃপা কর—আমাকে বাঁচাও। আজ দুইদিন এ অবস্থায় এ কালসঙ্কটে পড়ে আছি; দেখ, বিপন্নকে দয়া করা—পতিতকে

উদ্ধার করা, মনুষ্যের একটি প্রধান ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্ম পালন কর। আজীবন তোমার কেনা হ'য়ে থা'ক্‌ব, আমার প্রাণ যায়—আমাকে বাঁচাও।"

বালক ইঙ্গিতে কহিল, "চুপ!"

বাহিরে পদধ্বনি শোনা গেল, আর একজন লোক আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। এর চেহারা বড়ই ভয়ানক! দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! এ সেই ভোজপুরী লাঠিয়াল! ভয়ে আত্মপ্রাণ শুকাইয়া গেল! ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াই আমাকে ধমক্ দিয়া কহিল, "আরে লেড়্‌কা! এন্‌কা সাৎ ক্যা বাৎ হোতা হ্যায় রে? আপ্ কাহে খাড়া হ্যায় জী?"

বালকটি অম্লানবদনে কহিল, "হাম্ দেখ্‌নে আঁয়া রামসিং! দেখো ত ভেইয়া! ইস্কো আঁখ্‌সে পানী নিক্‌লাতা হায়! কেয়্যা জানে—কাহে হামারা ছাতিমে এত্‌না দরদ্ লাগ্‌তা। শুন শুন, কেয়া বোলে—'হামকো লে চল, তোম্‌কো রাজা কর দেগা!' ভালা রামসিং! হাম্ তো রাজা হোগা, রাণী হোগা কোন্? উও বি?" উভয়ে একটা বিকট হাস্যধ্বনি করিল!

উভয়ের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, বালকের একটি বিলোলকটাক্ষ সেই ভোজপুরীর উপর পড়িয়াছে। চোখেচোখে কি একটা ইঙ্গিত খেলিল।

রোষকষায়িত-চক্ষে ভোজপুরীটা আমায় কহিল, "আরে! তোম্‌কো ওয়াস্তে হাম্ খাড়া রহেগা? খা গা কি নেই খা গা বোলতো? হাম্ জল্‌দী আওয়ে গা। খা লেও—খা লেও—নেই ত দাণ্ডামে শির তোড় দেগা।" এই বলিয়া লৌহ কবাট বন্ধ করিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল।

সেই অন্ধকারময় কালঅন্ধকূপে আবার আমি একাকী। সম্মুখে অন্ন-ব্যঞ্জন, শরীর অবসন্ন—কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই, আহারে প্রবৃত্তিও নাই। এক মনে বালকটিকে ভাবিতেছি, বালকের কার্য্যকলাপ—সুমধুর স্বরগুলি, কমনীয় মুখখানি এক মনে ভাবিতেছি। হটাৎ ঘুল্‌ঘুলি হইতে কতকগুলি ছোট ছোট ইট পড়িল। আমি চমকিত হইলাম, দক্ষিণ পার্শ্বে দেওয়ালের দিকে সরিয়া যাইলাম, মনে একটু ভয় হইল। ঘুল্‌ঘুলির দিকে চাহিয়া আছি, দেখিলাম, একটি বড় চাবি পড়িল। চাবিটি লৌহের, প্রায় ৩ ইঞ্চি চওড়া! তার পর উঃ কি বিভীষণ! একটা রক্তাক্ত-নরমুণ্ড ও একখানি শাণিত রক্তমাখা খড়্গ পড়িল! ভয়ানক ভয়ে ও বিস্ময়ে মুণ্ডটি চিনিতে পারিলাম;—যে এই

মাত্র যমাকারে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল, এ মুণ্ডটি সেই ভোজপুরী লাঠিয়ালের! ভয়ঙ্কর ত্রাস জন্মিল! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—ঘুলঘুলি হইতে একটি কাগজের মোড়ক পড়িল। সন্দেহে ও কৌতূহলে মোড়কটি খুলিলাম, দেখি একখানি পত্র। সবিস্ময়ে পত্রখানি পড়িলাম। পত্রটি এইরূপ ;—

বন্দী—

যদি প্রাণের আশা থাকে, তবে এই কাজ গুলি যত শীঘ্র পার শেষ কর। প্রথমতঃ চাবিটি নাও, পশ্চিমদিকের দেওয়ালে যেখানে কতকগুলি অস্পষ্ট লেখা আছে, সেই দিকে মনোযোগ দাও। লেখাটির ঠিক মধ্যস্থলে—অর্থাৎ প্রথম শ'য়ের মুখে একটি ছিদ্র আছে, সেটি চুন দিয়া বেমালুম লেপা আছে। চুনটি ভাঙ্গিয়া দেখিবে, সেটি একটি ঠিক্ বাক্সের কলের মতন। চাবিটি দিয়া সেই কলটি খুলিলে একটি মানুষ সহজে প্রবেশ করিতে পারে, এমন একটি গর্ত্ত আবিষ্কার হইবে। তুমি এই কাটামুণ্ড কবাটের পার্শ্বে রাখিবে। খড়্গটি সাবধানে ও গোপনে লইয়া গর্ত্তের ভিতর দিয়া পলায়ন কর। পার হইয়া দেখিবে, অনেক-গুলি এই রকম ছোট ছোট অন্ধকারময় ঘর। ভীত হইওনা! গৃহগুলির সমস্ত দরজা খোলা আছে। দরজার উত্তর মুখ দিয়া চলিয়া আসিবে। অবশেষে এই রূপ আর একটি ঘর দেখিবে, সেই ঘরে একজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। তুমি চুপি চুপি নিঃসাড়ে গিয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতে এই খড়্গ দিয়া তাহার মস্তকটি একেবারে দ্বিখণ্ড করিবে। কিন্তু সাবধান! যেন কোন ক্রমে সে জানিতে না পারে, অমনি তাহার পরিচ্ছদ পরিবে। সেই ঘরের পূর্ব্বকোণে একটি গুপ্ত-সুড়ঙ্গ আছে, তাহার উপরে একটা পাথর চাপান। সবলে পাথর উঠাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। অতি সাবধানে সুড়ঙ্গ পার হইয়া বরাবর সদর দরজার পার্শ্বে আসিয়া দেখিবে, একটি লোক তোমার জন্য ভদ্রজনোচিত এক সুট পরিচ্ছদ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, সেই পরিচ্ছদ পরিবে। নিরবে তাহার হস্তে খড়্গখানি এবং প্রহরীর পরিচ্ছদটি দিয়া সদর রাস্তায় পড়িয়া বরাবর উত্তরমুখে পলায়ন করিবে। ভ্রমেও পিত্রালয়ের দিকে আসিওনা—আবার ধরা পড়িবে। আর একটি কথা ;—পত্রখানি অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিও—আমার পরিচয় জানিবার আবশ্যক নাই। পালাও পালাও—আর বিলম্ব করিও না—ইতি।

পত্রটি পাঠ করিয়া আমার প্রাণের ভিতর কি এক যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইল, তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মনে মনে জগদীশ্বরকে অগণিত ধন্যবাদ দিলাম, কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইয়া লেখকের উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিলাম। তৎক্ষণাৎ

সেই ছিন্নমুণ্ড কবাটের পার্শ্বে রাখিয়া উঠিলাম। মনে যেন কেমন একটা অভূতপূর্ব্ব বল আসিল। সেই হিজি বিজি কাটা দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ প্রথম 'শ'য়ের মুখ চাবি দ্বারা আঘাত করিলাম, চুন খসিয়া পড়িল, বাক্সের কলের মত একটি কল বাহির হইল। চাবিটি ঘুরাইবা মাত্র অতি সহজেই একটি গর্ত্ত আবিষ্কার হইল। তাহার মধ্যে মস্তকটি গলাইয়া দেখিলাম, সেটিও একটি ঘর। সম্মুখে দুইটি লৌহের হাতল। সেই হাতলের উপর দুই হাতের ভর করিয়া সহজেই গর্ত্তমধ্য হইতে বাহির হইলাম। খড়্গ এবং চিঠিখানি সাবধানে লইয়া অন্তিম সাহসের সহিত ঘরগুলি অতিক্রম করিতে করিতে চলিলাম। অবশেষে শেষের ঘরে আসিয়া দেখিলাম, যথার্থই একজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে সে লোকটাও ঠিক্ আমার বিপরীত দিকে ছিল, আমার আগমন বুঝিতে পারিল না। আমিও প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাৎদিক হইতে তাহার মস্তকটি দ্বিখণ্ড করিয়া তাহার পোষাক পরিলাম। গৃহটি শোণিতে ভাসিয়া গেল। গৃহটির পূর্ব্বকোণে আসিয়া দেখিলাম, একখানি পাথর চাপান রহিয়াছে। সবলে পাথর উঠাইয়া তন্মধ্যস্থিত একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। সুড়ঙ্গ পার হইয়া বরাবর সদর দরজায় আসিয়া দেখিলাম, একটি লোক একসুট ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে প্রণাম করিয়া কহিল, "দেরী কর্ব্বেন না, যত শীঘ্র পারেন এই কাপড় চোপড় প'রে বরাবর এই উত্তরমুখের বড় রাস্তা দিয়ে পালান, এ দেশ ছেড়ে পালান;—নইলে আপনার রক্ষা নাই।" তখনি সেই পরিচ্ছদ পরিয়া, প্রহরীর পোষাক ও খড়্গখানি তাহার হস্তে দিলাম। পত্রখানি তখনকার মত কিন্তু গোপনে রাখিলাম। যাইবার সময় তাহাকে কহিলাম, "যাঁর অপার করুণায় আজ আমি প্রাণ পেলেম, তাঁর পরিচয় কি জান্‌তে পার্ব্বনা?" সেই লোকটি কহিল, "সে সব কথায় আপনার দরকার নাই, আপনি এখনি পালান। চারিদিকে গুপ্তচর বেড়াচ্ছে, ঘূণাক্ষরে জান্‌তে পাল্লে, অনেকগুলি প্রাণ এক সঙ্গে বিনষ্ট হবে।" আমি আর কোন কথাই কহিতে পারিলাম না, তখনি বড় রাস্তায় পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে উত্তরমুখে ছুটিলাম।

পঞ্চম চক্র।

আমি বনলতা।

আমার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই—পশ্চাতে দৃষ্টি নাই—প্রাণের ভয়ে ক্রমাগত ছুটিতেছি। রাস্তাটি খুব প্রশস্ত, দুই পার্শ্বে নিবিড় বন, মধ্যে মধ্যে এক একটি কুটীর। লোকের গমনাগমন নাই বলিলেই হয়; কিন্তু আমার কোন দিকেই দৃষ্টি নাই—বিরাম নাই, ক্রমাগতই উত্তরমুখে ছুটিতেছি। অনুমান এইরূপ অর্দ্ধ ঘণ্টা ছুটিয়া আসিয়া, একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষতলায় দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ফেলিলাম। একবার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিলাম, কেহই নাই। কিন্তু এখনও আমি দারুণ ভয়ে শশঙ্কিত!

একে বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহর, তাহাতে অনাহারে এতটা রাস্তা দৌড়াইয়া আসা, সুতরাং আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, সেই বৃক্ষতলে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ এইরূপ অবস্থায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটা বিকট উচ্চস্বর আমার কাণে আসিল;—"ওরে মেধো! তুই বিলের বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দলবল নিয়ে লুকো,—এই রাস্তার উপর তোর খবরদারী রইল, আমি ঐ মোড়ের মাথায় আছি;—পালাবে কোথা,—যমের হাত থেকে পালাবে কোথা?" এ স্বরটি আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, তখন কিন্তু স্থির করিতে পারিলাম না। তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সেই অশ্বত্থবৃক্ষের উপর উঠিলাম।

আমি বৃক্ষের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া দেখিলাম, কতকগুলি লোক পূর্ব্বদিকের ধান্য ক্ষেত্র হইতে বড় রাস্তায় আসিতেছে; কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারিলাম না। তবে চেহারা গুলি বড়ই ভয়ানক! প্রথম ব্যক্তিকে, অর্থাৎ তাহাদের দলপতিকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। আমি যে বৃক্ষের উপর বসিয়া

আছি, তাহারা ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষতলায় আসিয়া উপবেশন করিল। আমি ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমিই তাহাদের শীকার, আমারই সন্ধানে আসিয়াছে। তাহাদের দলপতি কহিল,—"

কি সর্ব্বনাশ! এ স্বর যে আমার শ্বশুরের! কি ভয়ানক! কি পরিবর্ত্তন! সেদিন রাত্রিতে দেখিলাম তাঁহার একমুখ দাড়ী গোঁফ, ধপ্‌ধপে পৈতা, আজ সে সব কোথায় গেল?

তাহাদের দলপতি কহিল,—স্বর উগ্র ভীতিব্যঞ্জক—রৌদ্র-রসপূর্ণ!! "আজ সব ব্যাটাদের থোড়কুঁচি করে কাট্‌ব! কে তার সন্ধান দেখিয়ে দিলে? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? ওরে শালারা! যার খাবি, তারই সর্ব্বনাশ কর্‌বি? এঁ্যা—একি! চোরের উপর বাটপাড়ী?" অপর একজন কহিল, "আর মিছে চেঁচিয়ে কি হবে? ভাল ক'রে সন্ধান করি এস—ধরা পড়্‌বেই পড়্‌বে। এই পাঁচ শ' লোকের হাজার চোখে ধূলো দিয়ে কোথায় পালাবে? এইখানেই কোথা ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে আছে, সন্ধান কর—সন্ধান কর।"

দূরে একটি কোমলকণ্ঠনিঃসৃত মধুময় সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। গানটি বেশ, এখনও মনে আছে। এইরূপ;—

গীত। *

নীল আকাশে পাখী—সুখ ধীর বাতাসে ভাসি,
তুলিছে তান লহরী মরি ধীর সুহাস হাসি।
ধূ ধূ ধূ ধূ রঞ্জিত নব নীরদ কোলে বসি,
সুষমা রাশি অঙ্গে মাখি হিল্লোল মৃদু পরশি'।
এমন স্বাধীন উদার-চেতা পাখীটি ধরিলি কে রে!
স্বর্ণ-পিঞ্জরে—মন্ কি রে সরে? দে রে উড়িয়ে দে রে।"

---

* ইমনকল্যাণ——একতালা।

মরি মরি সেই বালকটি! পূর্ব্বদিকস্থ ক্ষেত্রমধ্য হইতে আসিতেছে! কি ধীর মৃদু পদক্ষেপণ—কি অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি! মনে হইল, যেন একটি স্ফুটন্ত স্থলপদ্ম ক্ষেত্রপথে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। ধীরে ধীরে সেই বালকটি আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিল।

ক্ষণিক চিন্তা করিয়া তাহাদের দলপতি কহিল;—"তাইত, আমাকে তাজ্জব লাগিয়ে দিলে! কি আশ্চর্য্য! গারদখানার চাবী আমার হাতে, গুপ্তদেয়ালের চাবীও আমার কাছে, তলোয়ার পেলে কোথা? দুটো লোক কাটা পড়্‌ল, অত গুল গারদখানার দরজা খোলা রইল, গুপ্ত-সুড়ঙ্গের পাথর খোলা পেলে, আর এই দিনে দুপুরে এত লোকের মাঝখান থেকে সে সটান সরে গেল? যে কাজ আমরা পারি না, এমন কি পৃথিবীর মধ্যেও কেউ পারে না, সে আঠার বছরের ছেলে হয়ে এমন অদ্ভুত কাজটা শেষ কল্লে? ধিক্ আমাদের! ওঠ ভাই সকল! "জয় মা ভবানি!" বোলে আর একবার বেরুই! তান্‌লে প্রাণ যাবে—মান যাবে—ধন ঐশ্বর্য্য সমস্তই যাবে, ইংরেজের হাজতে—কিম্বা দ্বীপান্তরে পচে পচে মর্‌তে হবে। বল ভাই! জয় মা ভবানী!"

ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় "জয় মা ভবানী!" শব্দে বনদেশটি কম্পিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কে কোথায় মিলাইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে স্থানটি নির্জ্জন হইল, আমারও ভয়ভার কথঞ্চিৎ লাঘব হইল। সেই প্রশস্ত চত্তর মধ্যে বৃক্ষারোহণে আমি মাত্র একাকী। কি করিব, স্থির করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে কত কল্পনা উদয় হয়, আবার আপনা আপনি বিলীন হয়। চারিদিকে দস্যু,—চারিদিকেই বিপদ। অনন্ত বিপদ-সমুদ্র মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষরূপ দ্বীপের উপর বসিয়া অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি করিব—কোথায় আশ্রয় পাইব—কোথায় যাইয়া প্রাণ বাঁচাইব, এই ভাবিয়া প্রাণ বড় অস্থির হইল। শ্রান্ত ক্লিষ্ট প্রাণভয়ে ভীত দীনাপেক্ষা দীন উপবাসীর উপর দিয়া বৈশাখীর প্রচণ্ড রৌদ্র রাজত্ব করিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ন আসিল। মনে মনে স্থির করিলাম, সন্ধ্যা আসিলেই যে দিকে প্রাণ যাইবে—সেই দিকেই পলায়ন করিব। কিন্তু কোথায় যাইব? স্থান কোথায়? আমি রাজপুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্যের

অধিপতি—এ প্রাণ কোথায় রাখিয়া সুস্থির হইব ? উঃ জগদীশ্বর ! আমার প্রাণ যে যায়, শান্তিদাতা ! দীনতারণ ! আমায় শান্তি দাও—আমাকে ত্রাণ কর। অশ্রুর দর দর ধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। জীবনের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সে দিনটি প্রায় অতিবাহিত হইল।

আবার সেই কোকিলকণ্ঠনিঃসৃতা প্রাণমনোহারিণী সুমধুর সংগীত ধ্বনি বনভাগটি প্লাবিত করিল। কর্ণে অমৃতধারা বর্ষিত হইল। একমনে গানটি শুনিতে লাগিলাম।

গীত। *

কত—দেশে দেশে আমি ঢুঁরিব—
প্রাণ বঁধুয়া রে !
কত—মনে মনে আমি কাঁদিব,
নির্দ্দয়-হিয়া রে !
এই—চোখে চোঁখে কথা নিয়ত,
কত ধ্যান-ধারণা সদত,
কত—ভাবাবেশে প্রাণ ভাসিত,
হ'ত প্লাবিত অমিয়া রে !
কেন—অতীতের স্মৃতি ভাবনা,
উঠিছে জাগিয়া রে,
শেষ—দেখা হলে তার চরণে,
নিব মরণ মাগিয়া রে !

স্বর্গীয় তানতরঙ্গটি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল। আমি স্থির নিশ্চল হইয়া দেখিলাম, সেই সুরসুন্দর বালকটি সুরতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আমারি

* গৌরী—একতালা।

দিকে আসিতেছে। আজ পূর্ণিমা, পূর্ব্বভাগ আলো করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইতেছেন, স্নিগ্ধ কিরণ ছটায় বনভাগটি আলোকিত হইয়াছে। তাহারি মধ্যে চন্দ্রকিরণ-স্নাত অনুপম বালকটি স্বর্গীয় তানে বিভোর হইয়া আসিতেছে। এই সুন্দর মনোরম দৃশ্যটি দেখিয়া আমার এমন যে যমযন্ত্রণাগ্রস্ত ক্ষীণ প্রাণ, সেও ক্ষণেকের তরে স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতে লাগিল। জানি বালকটি দস্যুপালিত, আমার প্রাণের শত্রু, কিন্তু কেন জানিনা, বালকটিকে দেখিলেই আমি সব ভুলিয়া যাই। পরম মিত্রভাবে উহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে।

দেখিতে দেখিতে বালকটি সেই বৃক্ষতলায় আসিয়া পড়িল। আমি স্থির নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম। হটাৎ আমার দিকে তাহার নজর পড়িল,—আমি উন্মনা হইলাম। বালক কহিল, "আমি তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি, তুমি আমাদের আসামী, তুমি আমাদের গারদ থেকে পালিয়েছ, দুটো খুন করেছ, এখন আমাদের ভয়ে গাছের উপর লুকিয়ে আছ। বল দেখি, আমি যদি তোমাকে আবার দলপতির কাছে ধরিয়ে দি, তা হ'লে তুমি আমাকে কি পুরস্কার দাও ?"

আহা কি মিষ্ট স্বর গুলি !

আমি অকুতোভয়ে কহিলাম, "এতেই আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুমি আমার পরম মিত্র। তুমি এত কষ্ট স্বীকার ক'রে যদি আমাকে এত অনুগ্রহ কর,—তা হ'লে আমি আর তোমাকে কি দেব ? আমার এই ছেঁড়া ভাঙ্গা ছোট প্রাণটি আছে, এইটি পুরস্কার দেব।"

"আচ্ছা এ বেশ কথা।" বালক কহিল, "আমার কথার মতন কথাই বটে। তা এস, নেমে এস। ভয় কি ? যদি এতই তোমার কৃতজ্ঞতা, তা হ'লে তোমার ঐ ছেঁড়া প্রাণটি নিয়ে আমি কি কর্‌ব ? প্রাণটি বেশ করে আগে তালি দিয়ে জুড়ি, মানুষের মতন করি, তার পর সোণার পিঁজ্‌রায় রেখে দেব। এখন এস—নেমে এস। সন্ধ্যা হয়েছে, আর ভয় কি ? তুমি আজ বড্ড বেঁচে গেছ। যখন এমন এমন দস্যুগুলর মাথায় তুমি এতক্ষণ চড়েছিলে, দস্যুগুল বুঝ্‌তে পারে নি, তখন তোমার আর ভয় নেই। নেমে এসে এখন পথ দেখ।"

এখনও আমি বৃক্ষের উপরে অটল হইয়াই বসিয়া আছি। কহিলাম, "তোমার কথায় কতকটা বিশ্বাস কত্তে পারি বটে, কিন্তু তোমাকে ত বিশ্বাস কত্তে পারি না? তুমিও ত একজন দস্যুর চর?"

বালক কহিল, "যা বল্লে, তা সত্য বটে; কিন্তু এটি জাননা যে, দস্যুর কাছে গাছতলা আর গাছের উপর দুইই সমান? যখন দস্যুর নজরে পড়েছ, তখন ত লুকিয়ে থাক্‌বার জায়গা আর পাবে না? ভয় নাই, তুমি নেমে এস, কতকটা তোমাকে সাহায্য কত্তে পারি।"

আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না, অদৃষ্টে যাই থাক, বালকের সরলতা মাখা কথার উপর নির্ভর করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিলাম। আমার কেমন একটু আনন্দ বোধ হইল, এত যে কষ্ট, তাহাও যেন দূর হইল।

বালক কহিল, "তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমার কেমন বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু তুমি যেন তার শোধ দিওনা? এখন এক কাজ কর, কিছু খাবে কি? তোমার মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে, আমার বড় মায়া হচ্ছে। তুমি সমস্ত দিন কিছু খাওনি, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।" খাবার নাম শুনিয়া সেই যমালয় সদৃশ শ্বশুরালয়ের কথা আমার মনে পড়িল। সেই আঁহার— যে আহারে মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছি। কহিলাম, "যদি তুমি এতই অনুগ্রহ কর, তবে আমার আহারে আঁবশ্যক নাই, আমাকে নিরাপদ স্থান দেখিয়ে দাও, সেই খানে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করি। তোমার মধুমাখা কথাতে আমার সমস্ত কষ্ট দূর হয়েছে; আমাকে বাঁচাও—এই ভয়ঙ্কর যমপুরী থেকে উদ্ধার কর।"

বালক কহিল, "দেখ, তুমি দস্যুর হাতে পড়েছ, তুমি কয়েদী; তোমার স্বাধীন ইচ্ছা কিছুই নাই তা জান? আমি যা কর্ব্বো যা বল্‌বো, তোমাকে তা কত্তেই হবে—শুন্‌তেই হবে। তোমার মরণকাটী জীবনকাটী আমার হাতে। কোন কথার উত্তর ক'র না, এইখানে বসো।"

বালকের কথায় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না, সেই বৃক্ষতলে বসিলাম। একটু অন্যমনস্ক হইয়াছি, দেখিলাম, বালকটি পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপ হইতে ২।৩টি বড় বড় পুঁটুলি বাহির করিল। প্রথম পুঁটুলিটী খুলিল, তাহাতে

একটি জল শুদ্ধ লোটা। বালক কহিল, "এই এক লোটা জলের আধ লোটা মাত্র জলে হাত মুখ ধোও; দেরী ক'রনা, আর কোন কথার জিজ্ঞাসা ক'রনা।" আমি ঠিক্ আধ লোটা জলে হাত মুখ ধুইলাম, একটু পায়েও দিলাম।

বালক আর একটি পুঁটুলী খুলিল, সেটিতে কতকগুলি পোড়া পোড়া রুটি আর কতকটা আলুর তরকারী।

বালক। "যা পার, এই গুলি শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে ফেল।"

আমি ইতস্ততঃ করিলাম। ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কি শূদ্রের রান্না খাইয়া জাতি হারাইব? কহিলাম, "তোমার নাম জানিনা, তোমার জাতি জানিনা, ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে কেমন ক'রে তোমার হাতে খাব? আমার খাবার দরকার নাই, আমায় পথ দেখিয়ে দাও!" বালক চক্ষুদুটি ঈষৎ রক্তিম করিয়া একটু উচ্চস্বরে কহিল, "আবার তুমি আমার কথার উপর জবাব কচ্ছ? দেখ্‌ছি তোমার নিতান্ত অদৃষ্ট খারাপ। তুমি কয়েদী, তোমার আবার জাত বিচার কি? এ শ্বশুরবাড়ী নয়—এ জেলখানা। মনে আছে কি?"

এত দুঃখেও আমার হাসি আসিল। কহিলাম, "আমি ত ভাই তাই জান্‌তেম; কিন্তু এদেশের শ্বশুরবাড়ী যে হরিণবাড়ী, তা জান্‌তেম না। ভাই, তোমার দয়া আমি কখন ভুল্‌বনা,—দাও—যা এনেছ দাও, আমি পবিত্রমনে অমৃত ভেবে খাই।"

সেই জ্যোৎস্নালোকময় প্রান্তর মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে বসিয়া বালকের সম্মুখে রুটিগুলি সমস্ত খাইলাম। প্রাণে বড় আনন্দ বোধ হইল, পরম তৃপ্ত হইলাম।

বালক কহিল, "এই আধ লোটা জলের সিকিভাগ খাও—আর বাকী টুকু আচাবার জন্যে নাও।" আমি তাহাই করিলাম।

অতঃপর বালক আর একটি পুঁটুলি খুলিল। দেখিলাম, একসুট স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ। কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বালকের মুখের দিকে চাহিয়া আছি, বালকটি হাসিয়া কহিল, "এইবার তোমাকে মেয়েমানুষ সাজ্‌তে হবে। এক কাজ কর, তোমার কাপড়

খানিকে বেশ টাইট্ করে মালকোঁচা বেঁধে পর, তারপর এই পাছাপেড়ে কাপড় খানি ভাল করে মেয়েমানুষের মতন পর।"

আমি তাহাই করিলাম। আমার পরণের কাপড় খানিকে মালকোঁচা বাঁধিয়া পরিলাম। কিন্তু বালকপ্রদত্ত পাছাপেড়ে কাপড় খানিকে স্ত্রীলোকের ন্যায় পরিতে কিছুতেই পারিলাম না। দুই তিন বার অকৃতকার্য্য হইলাম।

বালক কহিল, "ছি! তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ! মেয়েমানুষের কাপড় পরা কখন দেখনি? তুমি পার্‌লেনা দেখ্‌ছি। দাও, আমায় দাও। আমি তোমাকে কাপড় পরিয়ে দি।"

আমার শরীর কণ্টকিত হইল। ভয়ে নয়, বিস্ময়ে নয়, আনন্দে নয়, কেমন অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! যম-যন্ত্রণা ভুলিলাম, জগৎব্রহ্মাণ্ড ভুলিলাম, আত্মহারা হইলাম। আমি স্থিরনিশ্চলকার্ষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বালকটি একমনে আমাকে স্ত্রীলোকের কাপড় পরাইয়া দিল।

হরি হরি একি! পরিস্কার সুগন্ধীতৈলনিষিক্ত স্ত্রীলোকের পরচুল আমার মস্তকে শোভিত হইল। বালক কর্ত্তৃক আমার মুখ খানি পরিস্কৃত হইল। নাসিকায় মুক্তাফল ফলিল। সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত মখমলের কুচকুম্ভযুক্ত স্ত্রীলোকের জামা আমার অঙ্গে শোভিল। শরীরের যথা যোগ্য স্থানে স্বর্ণরৌপ্যখচিত অলঙ্কার ঝলকিল। অধরোষ্ঠ রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইল। হস্তপদতলে জবাপুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, দেখিতে দেখিতে আমি সালঙ্কারা যুবতী সাজিলাম। এখনো পর্য্যন্ত আমার গোঁফ উঠে নাই, সুতরাং কামাইবার আবশ্যক হইল না। নিকটে দর্পণ ছিল না, আপনাকে আপনি দেখিতে পাইলাম না,—নচেৎ পাঠকগণের নিকট আমার রূপ-কবিতা উৎসর্গ করিতাম। তবে বোধ হয়, আমি কৃষ্ণযাত্রার কঠোরা বৃন্দাদূতী সাজি নাই, রমণী বেশে হয়ত আমাকে বেশ মানাইয়াছিল।

আমাকে আপাদমস্তক দেখিয়া একটু চিন্তার পর বালক কহিল, "বস্, আমার কাজ প্রায় শেষ হ'ল। এখন আমি যা বলি, তা একেবারে সব শুনে নাও। দু'বার বল্‌বার আর অবসর নেই। শোন; এই রাস্তার ওপারে

পশ্চিমদিকে ঐ যে নিবিড় বন দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওরি মধ্য দিয়ে খুব সাহসে ভর ক'রে বরাবর সমান চ'লে যাও। কতক দূর যেতে যেতে বনের মধ্যে একটা খাল দেখ্‌তে পাবে। সে খালটার নাম "দেঁতর" খাল। যেখানে খালটা উত্তর মুখে বেঁকে গেছে, তারি পূর্ব্বদিকের কোণে পাঁচটী তালগাছ দেখ্‌তে পাবে। লোকে তাকে "পঞ্চপাণ্ডব" বলে। সে স্থানটি ঘনজঙ্গলে আচ্ছন্ন। তারি ভিতর প্রবেশ ক'রে দেখ্‌বে, একটি ভাঙ্গা চোরা মস্ত বাড়ী। সেই বাড়ীর ভিতর "মঙ্গলাবুড়ী" নামে একজন বৃদ্ধা বাস করে। তাকে 'আয়ী—মা' বোলে ডেকো—আর এই বোলে পরিচয় দিও, 'আমার নাম বনলতা, আমি তরুলতার ছোট ভগ্নী।' কিন্তু সাবধান! সেই বুড়ীই আমাদের দলপতির মা। এই বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে, আমিই আবার সেই বিপদে তোমাকে ফেল্‌ছি। কিন্তু কি ক'র্‌ব, এ ভিন্ন আর উপায় নাই। তোমার চারিদিকেই দস্যু, চারিদিকেই বিপদ! বরঞ্চ এ উপায়ে তোমার রক্ষা আছে, কিন্তু অন্য উপায়ে তোমার মরণ নিশ্চয়। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও, আমার কথায় বিশ্বাস কর। যাও যাও—পালাও, ভগবানে আত্ম সমর্পণ কর, অবশ্যই তুমি প্রাণ পাবে। আর এই কথাটি বেশ ক'রে মনে রাখ। আজকের সঙ্কেত কথা, "পি—সেন!"

বালকের এই মহদুপকারময় বাক্যগুলি এক মনে শুনিতে শুনিতে একবার মাত্র ঐ পশ্চিম অরণ্যের দিকে বিপদের ছায়া কল্পনা করিতেছি, সহসা বালক-মুখবিনিঃসৃত মৃদুস্বর নীরব হইল। পার্শ্বে চাহিয়া দেখি বালক নাই। বালকটি যেন তাহারি ঝঙ্কারের সহিত পবনে মিশাইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! একি অদ্ভুত অমানুষিক অভিনয়! এই যে বালকটি আমার সম্মুখে ছিল, এই যে এতক্ষণ তাহার সুধামাখা বাক্যতরঙ্গে আমার প্রাণ ভাসিতে ছিল, কোথায় গেল—কোন্ দিক দিয়া গেল? সবই আশ্চর্য্য! সবই অলৌকিক! সবই অপূর্ব্ব!

আহা, বালকটির কি অনুপম রূপমাধুরী—কি সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব! মরি মরি! এমন রূপকান্তি ত কখনও দেখি নাই? কে এ বালকটি! এমন নারকীয় স্থানে কে এ স্বর্গের ছায়াটি? কেন তাহাকে দেখিলে এ দগ্ধ প্রাণে মমতার



সঞ্চার হয়? প্রাণে কেন স্বর্গের ছায়া আসিয়া পড়ে? আ মরি মরি—কি সুন্দর বালকটিরে! কিন্তু বালকটি কে? কোন্ জাতি? কি নাম? কিছুই জানিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসাও ত করিতে পারিলাম না? ভাল, সে দস্যু-সন্তান হইয়া আমার প্রতি এত দয়ালু কেন? আমার উদ্ধারের জন্য সহস্রাধিক মূল্যের অলঙ্কারে আমাকে সাজাইয়া দিল—আমাকে উদ্ধার করিয়া যেন সে আনন্দ বোধ করিল। কিন্তু আর একটী কথা, ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও কি ইহাকে দেখিয়াছি? কোথায়? কোন সূত্রে? সেই ছলনাময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীলোকটি কে? 'আমি তাহার সর্ব্বস্ব'—এই কথাই বা সে বলিয়াছিল কেন? আমি যদি তার সর্ব্বস্ব, তবে হাতে করিয়া আমাকে বিষ খাওয়াইল কেন? হা! কি জটীল অমানুষিক কাণ্ড! কি গভীর রহস্য! আচ্ছা ভাল,—অদ্য দ্বিপ্রহরে সেই ভয়ানক গারদখানায় একবার মাত্র বালকটীকে দেখিলাম, সেই কি যমাকার লাঠিয়ালকে হত্যা করিয়া আমার উদ্ধারের পথ পরিস্কার করিয়া দিল? পত্র-সঙ্কেতে ঐ কি আমাকে প্রাণদান দিল? পত্রে লেখা ছিল, "পত্রখানি অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিও।" কিন্তু আমি কি এ পত্র ভস্ম করিতে পারি? আজীবন অন্তরে অন্তরে লুকাইয়া রাখিব,—আজীবন লেখকের উদ্দেশ করিব।

এইরূপ চিন্তায় আমি কিছুক্ষণ আত্মবিস্মৃত ছিলাম, এখন আপনাকে মনে পড়িল। আমি যে সালঙ্কারা যুবতী—আমি যে বনলতা!

ষষ্ঠ চক্র।

মঙ্গলাবুড়ী।

দেখিতে দেখিতে ঘোর ঘনঘটায় আকাশ করাল মূর্ত্তি ধারণ করিল। দীপ্তিমান পূর্ণচন্দ্র অন্ধকারময় মেঘসমুদ্রে ডুবিয়া গেল, বায়ু চলাচল বন্ধ হইল, গম্ভীর নিথর ভাবে প্রকৃতি স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা। তাহার প্রকাণ্ড ভগ্ন দরজার সম্মুখে আমি একটি রমণী সাজে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি। দারুণ আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই বিপদেই স্বেচ্ছাক্রমে পতিত হইতেছি। কি করিব, বালকের আদেশ—আমার জীবন-দাতা দেবরূপী বালকের আদেশ। যখন ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই, তখন কি করিব, বালকের বাক্যই আমার শিরোধার্য্য। দেখো দেখো ভগবন্! আমাকে রক্ষা কর, একবার দুস্তর বিপদ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছ, সেই সমুদ্র-গর্ভে পুনরায় ঝম্প দিতেছি, অকূলের কাণ্ডারী দীননাথ! আমাকে কূল দাও—মুখ তুলিয়া চাও দয়াময়! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একান্তঃকরণে পরমেশ্বরকে ডাকিতেছি। বালকের কথা মনে পড়িল, হৃদয়ে সাহস আসিল, ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একবার যতদূর সম্ভব কোমলকণ্ঠে ডাকিলাম, "আয়িমা—আয়িমা!" কোন উত্তর পাইলাম না।

আবার ডাকিলাম, "আয়িমা! আয়িমা! বাড়ীর মধ্যে কে আছ গো—আমাকে উদ্ধার কর।"

ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্কশ স্বরে একটা বিকট আওয়াজ আসিল, "এত রাত্তিরে কে রে?" আমি উত্তর করিলাম, "আমাকে চিন্‌তে পার্ব্বে না—আমি তোমার নাৎনী, পথ বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি—আমাকে নিয়ে যাও!" সেই কঠোর স্বরে

প্রত্যুত্তর আসিল, "আমার নাৎনী ফাৎনী নেই, তোর নাম কি বল্ !" আমি কহিলাম, "আমি বনলতা !"

"দূর তোর বনলতা ! বনলতা ফনলতা আমি জানিনি। আজকের নাম কি বল্। বল্‌তে পারিস ঢুক্‌তে পাবি, তান্‌লে ফিরে যা।" অতি বিরক্তির স্বরে এই কথা শুনিলাম।

একটু গলা চাপিয়া স্বরটি মাধুর্য্যে মাখাইয়া কহিলাম, "আয়িমা ! আজকের আমার নাম "পি—সেন," আর কষ্ট দিওনা আয়িমা, অন্ধকারে আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনি !"

"আয় আয়—এই আলো ধর্‌ছি।"

খড়াৎ খড়াৎ শব্দে সেই ভাঙ্গা বাটীর ভিতর দিকের ভাঙ্গা দরজা উন্মুক্ত করিয়া একটি বৃদ্ধা প্রদীপ হস্তে দেখা দিল। সে যে কি চেহারা, সে যে কি বিভীষিকা ! তাহা ভাষায় প্রকাশ হয়না—লেখনীতে বর্ণনা হয় না। সেই অনুপম চেহারার আর কি উপমা দিব ? আমাদের বাটীর (হায়, আমি কি অজ্ঞান ! এখনও বলি আমাদের বাটী) বৈঠকখানায় দশমহাবিদ্যার ছবির মধ্যে কাকধ্বজারূঢ়া সূর্পহস্তা বিভীষণা ধূমাবতীর চিত্র-মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আমার ঠিক বোধ হইল, যেন সেই মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া প্রদীপহস্তে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ! একে সেই অগম্য অন্ধকার, তাহাতে অন্ধকারময় সেই করালীমূর্ত্তি ক্ষুদ্র একটি প্রদীপের আলোতে যে কি ভয়ঙ্করী—কি প্রাণহারিণী ! তাহা আর কি বলিব, এখনও সেই ছায়া স্মরণে আসিলে তখনকার সেই ভাবেই কণ্টকিত হইয়া পড়ি।

কর্কশকণ্ঠে কর্কশা কহিল, "আয়—আমার সঙ্গে সঙ্গে আয় !"

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। একবার ভাবিলাম, এই প্রেতমূর্ত্তির নিকট হইতে পালাই, তখনি বালকের উপদেশ কথা মনে পড়িল। কি করি, যখন চারিদিকেই বিপদ, তখন বালকের উপদেশ পালনই আমার কর্ত্তব্য। সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ক্রমে অন্ধকারময় সোপান, ঘর, উঠান প্রভৃতি পার হইয়া দোতলায় উঠিলাম। অজানা অশ্রুতপূর্ব্ব স্থান, পায়ে কতই হোঁচট লাগিল, কতবার পড়িতে পড়িতে

বাঁচিয়া গেলাম। দোতলার উপরের ঘরটি প্রকাণ্ড হলের ন্যায়। সেই অন্ধকারে একটি মাত্র প্রদীপের টিম্‌টিম্ আলো, তাহাতে আর কতদূর দেখিবার সম্ভাবনা? তবু কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা নিতান্তই ঘৃণাব্যঞ্জক!

উপরের ঘরে উঠিয়াই, সেই বৃদ্ধা পশ্চাতে ফিরিয়া ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে ঘাড় বাঁকাইয়া—ভ্রূ উঠাইয়া তাহার কটমটেময় চক্ষুর্দ্বয় প্রদীপের আলোকের সহিত আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ওমা দিব্বিটিতো! তুই তরুর বোন? তুই এত বড় হয়েছিস্! তা বেশ বেশ, এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলি বল্ দিকি?"

এ কথার আর কি উত্তর দিব? জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া যাহা হয় একটা বলিয়া ফেলিলাম, "তোমার কি অসুখ হয়েছে শুনে দিদি নিজেই আস্‌ছিলেন; তা আবার কি মনে হ'ল, আমাকে ব'লে দিলেন, 'আমার হয়ে তুই যা, অনেক দিন আয়িমাকে দেখিস্‌নি, দেখে আয়!' আস্‌তে আস্‌তে পথে রাত হয়ে গেল। বড় কষ্ট হয়েছে আয়িমা, আমাকে শোবার একটা জায়গা দেখিয়ে দাও।"—

"তা হবে বৈ কি বাছা, কষ্ট হবে না? তোরা ত কখন বাড়ীর বার হ'স্ না, পা'র উপর পা দিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে ঘরে মরিস্, একটু হাঁট্‌তে হ'লে কষ্ট হবে বৈ কি বাছা? আর আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়!"

নীরবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধার সহিত তাহার ঘরে প্রবিষ্ট হইলাম। বৃদ্ধা কহিল, "যা—ওই আমার তক্তাপোষে গিয়ে ব'স্, পাখা খানা কুড়িয়ে নিয়ে বাতাস খা! কতক কতক গয়না খুলে বিছানায় রাখ্! যে গিন্নীম্মি! শুধুই কাপড় থাকে না। কি খাবি? খেয়ে দেয়ে এসেচিস্?"

"এক্ রকম খেয়ে দেয়ে এইচি! আজ রাতটা বৈত নয়, কিছু জল টল খেয়েই কাটিয়ে দিতে পার্ব্বো!"

"না না, সে কি হয় রে ভাই! কুটুমের মেয়ে এইচিস্, না খেলে দেলে যে নিন্দে হবে! আমার রুটি টুটি সব গড়া আছে। আমার শরীলটে বড় অসোয়াস্থি, আমিও আজ খাব না মনে কচ্ছি। তুই সব খাসি, কেমন লো নাতিন?"

আমি "হুঁ" বলিয়া, সায় দিয়াই একেবারে সেই বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বুড়ী তাহার ঘরের আসবাব পত্র সমস্ত বুঝাইয়া মন্থরগমনে চলিয়া গেল। যেমন গৃহটি নির্জ্জন হইল, অমনি প্রাণের চিন্তা, রহস্যের চিন্তা এবং উপস্থিত সময়ের চিন্তা, এই ত্রিবিধ চিন্তা আমাকে আকুল করিয়া তুলিল।

একে বৈশাখ মাসের গুমট্ গ্রীষ্ম, তাহাতে এই ত্রিবিধ চিন্তার সমাবেশ, পুনশ্চ আপাদমস্তক গহনার বিষম ভার, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম; তাহার উপর এই যন্ত্রণা, এই অপরিসীম প্রাণের যন্ত্রণা। জেনে শুনে এই যমালয়ে স্বেচ্ছায় আগমন, স্থির হইতে পারিলাম না। হয় ত ইহাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইতে হইবে! কি যে হইবে, অদৃষ্টে আরও যে কত আছে, ভবিষ্যৎ যে কি অন্ধকারময়, বুঝিতে পারিলাম না। উঃ ভাবিলে এখনও হৃদ্‌কম্প হয়! সেই পতিতোন্মুখ প্রকাণ্ড সম্পূর্ণ অপরিচিত জনশূন্য বাটীতে একাকী রমণী-সাজে প্রাণের ভয়ে লুক্কায়িত রহিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় এই বৃদ্ধা দস্যুজননীর সহিত এখনও ত কথার অমিল হয় নাই, উত্তর প্রত্যুত্তর ঠিকই হইতেছে; এরূপ ভাবে কেবল মাত্র বৃদ্ধার সহিত বোধ হয় কোনমতে অদ্যকার রাত্রিটিই কাটিতে পারে। কিন্তু কাল প্রাতঃকালে? কাল প্রাতঃকালে কিরূপে রক্ষা পাইব? আমি দস্যুশিকার ভ্রষ্ট, তাহাদেরই জালে আমি স্বইচ্ছায় ধরা দিয়াছি; কাহার না কাহার চক্ষে কল্য প্রাতঃকালে আমাকে পড়িতেই হইবে। তখন কি হইবে? কে আমাকে রক্ষা করিবে? কোন না কোন উপায়ে অদ্য রাত্রে পলায়নই যুক্তিযুক্ত। তাই বা কেমন করিয়া? আমার জীবনদাতা বালকের বিশেষ বারণ। হায়, হায়, চারিদিকেই গুপ্তচর বেড়াইতেছে, যেথান দিয়া যাই না কেন, ধরা পড়িতেই হইবে। তবে কি করিব? আমার যে কোন দিকেই উপায় নাই,—হা! কি প্রাণঘাতিনী যাতনা রে!

কিন্তু যাহাই হউক, এই বৃদ্ধাকেও বিশ্বাস নাই! মুখ চক্ষু স্বর এবং দেহাকৃতিই মনুষ্য মনের পরিচায়ক। এই বৃদ্ধার মুখ চক্ষু এবং আকৃতি হইতে ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতেই ইহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে। অবশ্যই উহার মনে কোন দুষ্টাভিসন্ধি

আছে। আজ আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই, তবে কখনই তাহার প্রদত্ত অন্ন জল স্পর্শ করিব না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, কিন্তু এখনও বৃদ্ধার কোনই সংবাদ নাই। মন চঞ্চল হইল, মল চারি গাছি খুলিয়া আঁচলের কোণে বাঁধিয়া উঠিলাম। ধীরে ধীরে সেই দরদালানে আসিয়া চারিদিক স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলাম। জন প্রাণী নাই—চারিদিক নিস্তব্ধ। ক্রমেই সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। কেবলই বোধ হইতে লাগিল, যেন বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। করাল অন্ধকার যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। চুপি চুপি দালান পার হইয়া সিঁড়ির দরজার নিকট আসিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে দূরপ্রক্ষেপণ ক্ষুদ্র গোল আলো আমার মুখে পড়িল, চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল! তৎসঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ত্রাস জন্মিল! এখন আর সন্দেহ রহিল না। হায়, হায়, দস্যুচক্ষে তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য বুঝি পূর্ণ লক্ষিত হইল। দৌড়িয়া বৃদ্ধার ঘরের ভিতর আসিয়াই খিল দিলাম। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি, নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, হায়—হায়! বালকের সমস্ত কৌশল বুঝি ব্যর্থ হইল!

এমন সময়ে বাড়ীটার চতুর্দ্দিকেই দুম দাম করিয়া শব্দ উঠিল, বোধ হইল যেন কতকগুলা লোক সবেগে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই এড়ান এড়ান স্বরে একটা বিকট ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। "হারামজাদি! তোমার এই কাজ? বল্ বেটী, তোর কোন্ বাবার জন্যে রাত্তিরে মেয়েমানুষ পুষে রাখিস্!" বৃদ্ধার এই প্রত্যুত্তর হইল, "ওমা সে কি বলিস্ রে তোরা? ভৈরব গাঙ্গুলীর ছোট মেয়ে তরুর ছোট বোন আজ রাত্তিরে আমার কাছে এসেছে, তার জন্যে এই খাবার দাবার নিয়ে যাচ্ছি,—আর বলিস্ কি না—মেয়েমানুষ পুষে রাখি?"

"চ'তো চ'তো দেখি আসি, কেমন তরুর ছোট বোন! যদি না হয়, বেটী, তোমাকে আজ শাণে আছড়ে মারব্।"

দুপ্ দাপ্ শব্দে সিঁড়ি কাঁপাইয়া সেই লোকগুলা যেন উপরে উঠিয়া আসিল। আমি খিলবদ্ধ দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থর্ থর্ কাঁপিতে

লাগিলাম! এই যেন তাহারা আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল, এই যেন তাহারা আসিয়া সঠিক পরিচয় পাইয়া আমাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল! উঃ কি হইবে! দারুণ ভয়েই যেন প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল! পরক্ষণেই একি শুনিলাম! বাহিরের দরজার সম্মুখে একি মধুর ধ্বনি ঝঙ্কারিত হইল! "ওগো! কে গো তোমরা?" উত্তর হইল, "তুই কোত্থেকে এইচিস, কে তুই? ঠিক করে বল!"

"বড় মামা যেন পাগল! আমি বনলতা, আজ কি তোমাকে নতুন ক'রে পরিচয় দিতে হবে নাকি? চিনতে পাচ্ছোনা বড় মামা?"

"কেও বুনি? তুই এত রাত্রে এখানে কেন?

"আয়িমার অসুখ শুনে মেজদিদি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, পথে আস্তে আস্তে রাত হ'য়ে গেল।"

এমন সময়ে নিচেয় একটা গোল উঠিল, বুড়ীকে কে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, বুড়ী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"কি হ'লরে!" কি হ'লরে!" শব্দে বাড়ীখানা কম্পিত করিয়া সকলে নিচে নামিয়া গেল; অনুভবে বুঝিলাম, বুড়ীর বড়ই আঘাত লাগিয়াছে, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

জগদীশ্বরকে অগণিত ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া গেল। আজ কি আশ্চর্য্য ঘটনাতেই উপস্থিত বিপদে জীবন রক্ষা হইল। আর একটু হইলেই ত, আমি ধরা পড়িতাম; কিন্তু বিধাতার কি অলৌকিক ঘটনা বৈচিত্র! আবদ্ধ দরজার সম্মুখে সেই মূহুর্ত্তে সত্যকার বনলতা আসিয়া আবির্ভাব হইল। ভগবানের ইচ্ছায় প্রকৃত ঘটনাই বজায় রহিল। একটু যেন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম, কয়েক মূহুর্ত্তের জন্য যেন আবার প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

যখন দেখিলাম, উপরের কোঠা একেবারেই নির্জ্জন ও নীরব হইল, তখন বুড়ীর অবস্থা দেখিবার জন্য প্রাণে বড় বাসনা জন্মিল। ধীরে ধীরে ঘরের খিলটা খুলিলাম, কবাট টানিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না, বাহির হইতে দরজা বন্ধ হইয়াছে। বড়ই ধাঁধাঁ ঠেকিল; একবার, দুইবার, তিনবার চেষ্টা

করিলাম, সত্য সত্যই দরজা একেবারেই শিকলি সংবদ্ধ। আশ্চর্য্য হইলাম, এ কি প্রহেলিকা ? কে আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল ? তবে কি সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়াছে ? দস্যুরা অজ্ঞাতে আমাকে বন্দী করিয়া গেল ? কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না। যেমন প্রকৃত বনলতার আবির্ভাব, তন্মূহুর্ত্তেই নিচেয় বৃদ্ধার গুরুতর আঘাত, এই দুটি কার্য্য ঠিক এক সময়েই সংঘটিত হইল। হয়ত মূর্ত্তিমান পরোপকাররূপী সেই বালকের কৌশলরূপ ব্রহ্মাস্ত্র ; তাহা যদি হয়, তবে এ ক্ষেত্রে আমার উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী।

কতকটা সুস্থির হইয়া, বৃদ্ধার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনুমানে রাত্র ২টা উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আর থাকিতে পারিলাম না, চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল, অল্প ক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সপ্তম চক্র।

একি স্বপ্ন ? না কুহক ?

খিট্ খিট্ খুট্ খুট্ শব্দ। যেন তালা খুলিয়া গেল, ধীর ঈষদুচ্চ ঝনাৎ শব্দে শিকলিটি খুলিল, নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ প্রদীপটি সহসা নির্ব্বাপিত হইল। থস্ থস্ অতি মৃদু পদসঞ্চালন শব্দ, যে কে আসিয়া আমার বিছানায় উপবিষ্ট হইল। নাতি উষ্ণ, নাতি শীতল একখানি কোমল হস্ত আমার মস্তকে পতিত হইল, ধীর মৃদুমন্দে শরীরটি নাড়িয়া দিল। আমি জাগ্রত, নিদ্রিত কি স্বপ্নাতুর, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মাথাটি ধরিয়া কে যেন পুনরায় সর্ব্বাঙ্গ নাড়িয়া দিল। ভয়ে ভয়ে চক্ষু চাহিলাম, ঘোর অন্ধকার!

একি প্রেতলীলা ? সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "কে তুমি ?" উত্তর নাই।

আবার ডাকিলাম, "অন্ধকার ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় কে তুমি ?" উত্তর নাই।

এখনও আমার মস্তকে সেই হস্ত নিপতিত, ধরিয়া ফেলিলাম। "বল, কে তুমি ?"

কি আশ্চর্য্য ! নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত কোনই শব্দ নাই। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম, সেই প্রশ্ন, "তুমি পুরুষ কি নারী, শত্রু কি মিত্র, বল শীঘ্র বল, কে তুমি ?" তথাপি নীরব। একটু ঈষৎ বল সহকারে সেই আঁধারাবৃত হস্তখানি আমার হস্ত তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইবার ইঙ্গিত করিল। আমার হৃদয়ের মধ্যে সাহসও যেমন, ভয়ও ততোধিক। ইঙ্গিত-মাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইলাম, ভয়চকিতহৃদয়ে আমি নিস্পন্দ, ডাকিলে সাড়া পাই না, একি চরিত্রের জীব ? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সেই হস্ত খানি নীরবে ধীরে ধীরে আমাকে দরজা পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া চলিল। আমি যন্ত্র-পুতুলের মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ক্রমে আমাকে সেই অন্ধকারে ধীরে ধীরে সাবধানে সাবধানে উপর হইতে নিচে নামাইয়া আনিল। নিচে কেহই নাই, কেবল ঘুট্ ঘুট্ ঘুমন্ত অন্ধকার ঘনাবৃত রহিয়াছে। যাইতে যাইতে তাহাকে চুপিচুপি কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, একটীরও উত্তর পাইলাম না। কেবল এঘর ওঘর সে ঘর করিয়া দালান, উঠান প্রভৃতি পার হইয়া আমাকে একটা খোলা জায়গায় আনিয়া উপস্থিত করিল। সে জায়গাটী জঙ্গলময়। রাত্রি সাঁ সাঁ করিতেছে, সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে একজন অজ্ঞাতের সহিত (পুরুষ কি নারী জানিনা) টিপিটিপি চলিয়া যেন একটা খালের ধারে আসিলাম। হঠাৎ আমার পার্শ্ববর্ত্তী সেই অন্ধকাররূপী লোকটীর মুখ হইতে একটী বাঁশীর আওয়াজ ধ্বনিত হইল, অমনি খালের মধ্য হইতে বাঁশীর স্বরে আর একটী উত্তর আসিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, নৌকার বাহিরে অন্ধকার আবরণে একটী মনুষ্য।

বস্, আর নাই, সেই অন্ধকার ছায়ামূর্ত্তি আর নাই ! পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, যে অন্ধকার—সেই অন্ধকার ! ! ! কেহই নাই ! আমি দারুণ

বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শত্রু কি মিত্র, বিপদে পড়িতেছি কি বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতেছি, কেমন করিয়া বুঝিব? কে এই অস্ফুট রহস্য ভেদ করিয়া দিবে? এ নৌকা বোধ হয় আমারি নিমিত্ত, আমারি পলায়নের নিমিত্ত অভাবনীয় সুযোগ! যদি তাই হয়, হে অজ্ঞাতকুলশীল ছদ্মবেশী দেবতা! পৃথিবীতে আসিয়া মহান্ কার্য্য সাধিলে, পরোপকারিতার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিলে। একজন অনাথ আতুর অসহায়ের জীবন রক্ষা করিয়া তাহার পক্ষে আজীবনকাল ঈশ্বরবৎ মহান্ পূজ্য হইয়া রহিলে!

আর কোন দিক বিচার না করিয়া একেবারে সেই নৌকায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম। বসিবা মাত্র নৌকা ছাড়িয়া দিল। এখনও যেন তন্দ্রার ঘোর রহিয়াছে। একি স্বপ্ন? না কুহক?

অষ্টম চক্র।

কে তুমি মহোদয়?

মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, বজ্রের ব্রহ্মাণ্ডভেদী কড়কড় ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত। আমি নৌকার ছতরীর মধ্যে একমনে নিদারুণ প্রকৃতি বিপ্লব দেখিতেছি। আমার সঙ্গীর মধ্যে সেই একমাত্র মাঝি নীরবে মহাশক্তিতে লগী বাহিয়া চলিতেছে। কোথায় গিয়া যে নৌকা থামিবে তাহার কিছুই জানিনা, জানিবারও ত কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ, এ সব সংবাদ জানিবার জন্য কয়েকবার তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সে আমাকে ইঙ্গিতে চুপ করিয়া থাকিতে কহে।

কি হইতে কি হইল জানি না, হঠাৎ একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিয়া নৌকা গোঁভরে একপেশে হইয়া ছুটিল। একটা পরিত্রাহি চীৎকার শব্দ উঠিল। "সামাল—সামাল! দরিয়ায় পাঁচপীর বদর বদর!" আমার চতুর্দ্দিক ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, ঝপাং করিয়া একটা গভীর শব্দ হইল, আমার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন নৌকা ডুবিয়া গেল।

কি জানি কোথায় কিরূপ অবস্থায় ছিলাম, যখন জ্ঞান হইল, চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তখন চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হইল, দেখিলাম প্রভাতালোকে উজ্জলীকৃত একটী অরণ্য। আমি আর্দ্র পত্রশয্যায় শায়িত, একটা আর্দ্র মৃত্তিকা স্তূপ উপাধান স্বরূপ আমার মস্তক তলে স্থাপিত, অলঙ্কারাদি কিছুই আমার শরীরে নাই; কেবলমাত্র একখানি পরিষ্কার শুষ্ক কাপড় আমার সর্ব্বাঙ্গ আবরিত, অল্প অল্প পত্রাগ্নিতে আমার আর্দ্র শীতলদেহ উষ্ণতায় উত্তেজিত, শিরদেশে একটী ভদ্রবেশধারী বৃদ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্র ব্যক্তি দণ্ডায়মান। তখনও আমার অবস্থা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না, তাঁহাকে দেখিয়া একবার মাত্র উঠিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি কহিলেন, "উঠ না—উঠ না—তোমার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, উঠিলে এখনি মূর্চ্ছিত হইবার সম্ভাবনা।" কথাও প্রকৃত তাই। দেহ ঈষৎ উন্নত করিবামাত্র মস্তক এমনি ঘুরিয়া উঠিল, যে অগত্যা বাধ্য হইয়া তথায় শুইয়া পড়িতে হইল। অতঃপর সেই ভদ্রব্যক্তি পত্রাগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া আমাকে গোদুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। ক্রমে যেন আমার শরীরে বল আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমাকে উঠাইয়া বসাইয়া কহিলেন, "ভগবৎ প্রসাদে তোমার আর কোন ভয় নাই। তুমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছ, তাঁহার কৃপায় তুমি আজ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইলে। দেখিতেছি তুমি বালক; নিঃসহায় একাকী। এখন জানিতে ইচ্ছা করি, বল তুমি কি কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলে? এই ভয়ানক দস্যুশঙ্কুল স্থানে আগমনের কারণ কি? বোধ হয় আমাকে বলিবার তোমার কোন আপত্তি নাই।"

তাঁহার এই ধীর প্রশান্ত স্বর শুনিয়া আমার যেন সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইল।

সজল-নয়নে গদগদ স্বরে একটী একটী করিয়া আমার জীবনের আদ্যন্ত সমস্ত রহস্য তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম, তিনিও নীরবে আমার সমস্ত কাহিনী শুনিলেন। একটী কৌতূহল ছিল, আমি যে যুবতী সাজে নৌকারোহণ করিয়াছিলাম, আমার অঙ্গে যে সহস্রাধিক মূল্যের অলঙ্কারাদি ছিল, সে সমস্ত কিছুই না দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সবিনয়ে এই বিষয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, "ঘটনাক্রমে অদ্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি এই স্থান দিয়া পাল্কী করিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ মেঘ ঝড় হওয়াতে আমাকে এই বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে হইল। আমি পাল্কীর ভিতরে বসিয়া আছি, বেহারা চারিজন আশ্রয়ার্থ অন্যান্য বৃক্ষতল অন্বেষণ করিতেছে, এমন সময়ে আমার একজন বেহারা আসিয়া জানাইল যে, খালের ধারে কর্দ্দমাক্ত একটা মড়ার মত কি পতিত রহিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তখন বৃষ্টির বেগও কমিয়া আসিতেছিল, দ্রুতপদে খালের ধারে যাইয়া দেখিলাম, মস্তক হইতে কোমর পর্য্যন্ত স্থলে ও অবশিষ্টাঙ্গ জলে ডুবিয়া সত্যই মড়ার মত কি পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ বেহারাদিগের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া পাল্কীর নিকট লইয়া আসিলাম, বিশেষরূপে দেখিলাম, নাসিকায় নিঃশ্বাস নাই, হৃদ্‌পিণ্ডেরও কার্য্য নাই, কেবল ব্রহ্মতালু বেশ গরম রহিয়াছে। বোধ হয় অধিক জল খাওয়াতে উদর অত্যন্ত স্ফীত দেখিলাম। তৎক্ষণাৎ অগ্নি করিয়া তোমাকে তাপ দিতে আরম্ভ করিলাম। অনন্তর মুখে ফুঁ দিতে, অনবরত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তুমি জল বমন করিতে লাগিলে। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, তোমার নাসিকায় নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল, হৃদ্‌পিণ্ডেরও কার্য্য দেখা দিল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে দুগ্ধ আনাইলাম, অল্প অল্প গরম দুগ্ধ খাওয়াতে পুনরায় তোমার জীবনী শক্তি আরম্ভ হইল। ভগবানের ইচ্ছায় তুমি বাঁচিয়া গেলে। তোমার পরিধান কিছুই ছিল না, সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শবাকারে পতিত ছিলে। তোমার বস্ত্রালঙ্কারাদি সমুদায়ই বোধ হয় সেই মাঝীটা আত্মসাৎ করিয়াছে।"

আহা, কে ইনি! এমন করুণা এমন স্নেহ ত কোথাও দেখি নাই! আমি ত মরিয়াছিলাম, এ হেন দেবতা পুরুষের চক্ষে যদি না পড়িতাম, তবেত

আমি মরিয়াই ছিলাম! জীবনে কখন প্রকৃত পুত্রস্নেহ পাই নাই, আজ অপত্যস্নেহ ও পিতৃভক্তিস্রোতঃ যেন মূর্ত্তিমতি হইয়া একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছে, যেন প্রকৃত পিতৃভক্তি হৃদয়ের মধ্যে আবির্ভাব হইয়াছে। বিনীত স্বরে কহিলাম, "আপনা হইতেই আজ আমি প্রাণ পাইলাম, আপনার অসীম দয়া কখনও ভুলিতে পারিব না। আপনি প্রাণদাতা, কিন্তু জন্মদাতা অপেক্ষাও মহান্ ভক্তিভাজন, আপনার শ্রীচরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি। আমি অনাথ, আতুর, অসহায়; পৃথিবীতে আমার বলিতে কেহই নাই। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; কিন্তু এমনি ভাগ্যহীন, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অনুপরিমিত স্থলেও আমার আশ্রয় নাই। একেবারেই ত সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাপিত হইতেছিল, এই অনন্ত যন্ত্রণা ত একেবারেই ঘুচিতেছিল; আপনি যখন কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে প্রাণ দিলেন, তখন এই প্রাণের ভার আর কে লইবেন মহাশয়? আপনার প্রদত্ত প্রাণ আপনারি শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম, একটি অনাথবালকের পিতৃস্থানীয় হইয়া তাহাকে লালন পালন করুন।" তিনি কহিলেন, "বৎস, আর বলিবার আবশ্যক নাই, চল, আমার আলয়ে চল, আমি তোমাকে পুত্রবৎ পালন করিব।"

আমাকে পাল্কীর ভিতর শোয়াইলেন। তিনি হাঁটিয়া যাইবেন, আর আমি পাল্কীর ভিতর যাইব, আমি অনেক আপত্তি করিলাম, তিনি শুনিলেন না; অগত্যা আমাকে পাল্কী করিয়াই যাইতে হইল। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, কে তুমি মহোদয়?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

সংসার চক্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

নবম চক্র।

শ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম, তথায় শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার বাস করেন। তাঁহার জমীদারির আয় বাৎসরিক লক্ষ টাকা। সেই মতই তাঁহার চাল চলন; প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাস দাসী লোক জনে পরিপূর্ণ, বেশ জম-জমাট সংসার। প্রকাণ্ড পাঁচ ফুকুরে পূজার দালানে হিন্দুর কর্ম্ম কাণ্ড কোনটিই বাদ যায় না, বারমাসে তের পার্ব্বণ, একটি প্রকৃত হিন্দুরাজসংসার বলিয়াই বোধ হয়। এত যে লোকজন, কিন্তু ইহার মধ্যে অধিকাংশই কর্ত্তার স্বসম্পর্কীয় প্রায় কেহ নাই, সকলেই বেতন ভোগী।

বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা আছেন, তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত একটি ব্রাহ্মণ সপরিবারে নিযুক্ত, তাঁহারি একটি সংসার। রামসদয় চক্রবর্ত্তী, তিনি বাজার-সরকার, তাঁহার একটি সংসার। রামমোহন ভট্টাচার্য্য, তিনি গোমস্তা, তাঁহার একটি সংসার। রামচরণ মুখোপাধ্যায়, তিনি খাজাঞ্চি, তাঁহার একটি সংসার। এইরূপ পূজারি ব্রাহ্মণ হইতে ইস্তক রঘুবীর দ্বারবান পর্য্যন্ত যিনি যে পদে পদস্থ, সকলেই স্ব স্ব পরিবার লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রাজসংসারে মনের সুখে অধিষ্ঠিত। কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তামহাশয়ের সংসার এত অল্প যে, সেই সুবৃহৎ অট্টালিকার ছুটি মাত্র ঘরেই তাঁহাদিগের সঙ্কুলান হইতে পারে। পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্ক স্বয়ং কর্ত্তা মহাশয়, তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয়া পরমাসুন্দরী তৃতীয়পক্ষীয়া পত্নী, বিংশতি বর্ষ বয়স্ক তাঁহার একমাত্র প্রথমপক্ষীয় পুত্ররত্ন নির্ম্মলচরিত্র নির্ম্মলকুমার, আর এই দীন হীন অজ্ঞাত-কুলশীল অনাথবালক ব্রজেন্দ্রভূষণ!

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি যখন নৌকাডুবি হইয়া খালের ধারে মৃতপ্রায় পতিত ছিলাম, তখন ঐ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার প্রাণ রক্ষা করেন। আমাকে পাল্কীতে শোয়াইয়া প্রথমে তাঁহার শ্যাম-পুরের উদ্যানবাটীতে লইয়া যান। তথায় একপক্ষ কাল আমার চিকিৎসায় অতিবাহিত হয়। আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলে ঘোড়ার ডাক বসাইয়া দুইদিনের মধ্যে দেবগ্রামে তাঁহার বসতবাটীতে লইয়া যান। তাহার পর আজি দুইমাস হইল, তাঁহার প্রতিপাল্যরূপে অবস্থান করিতেছি। কোন ক্লেশ নাই অভাব নাই—মহা সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছেন, পিতার খেদ মিটাইয়াছেন! নির্ম্মলকুমার তাঁহার যেমন পুত্র, তাঁর পক্ষে আমিও যেন তেমনি। নির্ম্মলকুমারের যেমন জুতা, যেমন কাপড়, যেমন জামা, যেমন অন্যান্য আসবাবপত্র, আমারও তেমনি জুতা, তেমনি কাপড়, তেমনি জামা, তেমনি আসবাব! নির্ম্মলকুমারের সহিত শয়ন, ভ্রমণ, ভোজন, নির্ম্মল-কুমারের সহিত পাঠাভ্যাস, নির্ম্মলকুমারের সহিত অহোরাত্রই সম্মিলন। নির্ম্মলকুমার যেন আমার অগ্রজ, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ, বাহির হইতে দেখিলে এইরূপই দেখা যায়। নির্ম্মলকুমার আমা হইতে ২ বৎসরের

বড়, দেখিতেও বেশ লম্বা চওড়া, গায়ের রংটী বেশ মাট মাট শ্যামে উজ্জ্বল, বুকখানি বেশ প্রশস্ত, অল্প অল্প রোম, একটু ভুঁড়ী, খালি গায়ে থাকিলে তাঁহাকে বেশ দেখায়। মুখখানি বড়ই সুন্দর, দেহের বর্ণ অপেক্ষা তাঁহার মুখের বর্ণ কিছু বেশী ফর্সা। নাকটী টিকোল, তাহাতে আরও মানান আরও সুন্দর। সর্ব্বাপেক্ষা চক্ষু দুটী বড় চমৎকার! মুখের মানান মত হরিণের ন্যায় টানা টানা চক্ষু, ঘোরাল কৃষ্ণবর্ণ তারা! হাসিলে যে এই চক্ষু দু'টি কি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, তাহা না দেখিলে লেখনী ও কল্পনায় কথনই বর্ণনা হয় না। হাঁ-টি মানান মত বেশ ছোট, দাঁতগুলিও তেমনি ঘেঁসাঘেসি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। ভ্রুযুগলও সেইমত, তবে রামধনুর মত নয়। সর্ব্বাপেক্ষা চুলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না; খুব ঘন, কাল কাল চমৎকার কোঁকড়ান, তাহার মধ্যস্থলে সোজাসিঁতি। গঠনটিও বেশ পুরুষোচিত; এক কথায় বলিতে কি, তাঁহার সবই বেশ—সবই সুন্দর। তবে নিন্দুকের পক্ষে কি বলিতে পারি না, পরের চক্ষে কি বলিতে পারি না। আমি তাঁর মূর্ত্তিখানি কেমন করুণামাখা সরলতাময় দেখি, তিনিও সেইরূপ আমাকে স্নেহচক্ষে দেখেন, সেইরূপ ভালবাসেন। উভয়ে যখন একত্রে থাকি, কর্ত্তা মহাশয় কখন কখন বলেন, "তোমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে আমি বড়ই সুন্দর দেখি। ভগবান করুন, যেন এই সৌন্দর্য্য আমি আমরণকাল উপভোগ করিতে পাই।" উভয়ে এক্ষণে বহির্গত হইলে, পাড়ার লোকে কাণাকাণি করে, "ব্রজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে নির্ম্মলের ভাই ছিল, তাই এজন্মে দু'টিকে এত সুন্দর দেখায়।"

জ্যেষ্ঠ সোদরোপম নির্ম্মলকুমারের সহিত এমনিই সমাদরে রাজার হালে আছি। পিতার খেদ ভ্রাতার খেদ সংসারের খেদ যেন আর নাই, এই দুইমাসের মধ্যেই আমার এতদূর সুখময় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নির্ম্মল-কুমারকে আমি দাদাবাবু বলিয়া ডাকিতাম, কিন্তু কর্ত্তা মহাশয়ের তাহা অভিপ্রেত নয়। বাটীর অন্যান্য সকলে তাঁহাকে দাদাবাবু বলিয়া ডাকে, পাছে আমি অপরের ন্যায় গণ্য হইয়া পড়ি, এই জন্য নির্ম্মলকুমারকে

কেবল দাদা বলিতেই আদেশ দিয়াছেন। এখন আমি নির্ম্মলকুমারকে দাদা বলিয়া ডাকি।

অতঃপর স্বয়ং শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর মত অমায়িক স্থির-বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি আর দেখি নাই। ইহাঁর প্রসন্ন বদনে সর্ব্বদাই প্রফুল্লতা বিরাজমান। কখনও ইহাঁকে অসন্তুষ্ট দেখি নাই,—তিরস্কার কি উচ্চস্বরে কাহাকেও আহ্বান করিতে কখনও শুনি নাই। যাবতীয় কর্ম্মই এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তিনি যেমনি দেবভক্তিমান, তেমনি নিষ্ঠাবান। ইহাঁর আকার সুদীর্ঘ, বেশ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। কোন কর্ম্মেই পরপ্রত্যাশী নন; এত লোকজন থাকিলেও, নিজ কর্ম্ম নিজ হস্তে সম্পাদন করেন। এমন গোছাল এমন হিসাবী যে, অনেক সময়ে আমরা আশ্চর্য্য হই। ইহাঁর কাছারি বাড়ীতে নিজ দপ্তরে একটী উডেন পেন্‌সিল আজ কতকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নির্ম্মলকুমার বলেন, "আমি জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত ঐ পেন্‌সিল ঐ আকারেই দেখিতেছি; অথচ ঐটি নিত্য ব্যবহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয়।" এমনি সাবধানি—এমনি গোছাল!

ইহাঁর বর্ণ শ্যাম, বেশ স্থূলকায় পুরুষ, ইহাঁর মুখশ্রী অবলম্বনেই নির্ম্মলকুমারের মুখশ্রী গঠিত;—তবে বয়সের পরিপক্কতা অনুসারেই যাহা বিভিন্নতা। মস্তকে একটী টাক, দাড়ী কামান, আধ পাকা আধ কাঁচা গোঁপ। ফল কথা এই, যে যে উপাদান থাকিলে দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়, সেই সেই উপাদানে ইহাঁর মূর্ত্তি নির্ম্মিত।

কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, বারমাসই ইনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে প্রাতঃভ্রমণ করেন, এক্ষণে আমাকেও সহকারী করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত প্রাতঃভ্রমণ এক্ষণে আমারও নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বৈঠকখানা বাড়ীতে তৈল মাখিতে বসেন। এক ছটাক খাঁটি সরিষার তৈল দুই জন চাকর একঘণ্টা কাল তাঁহার অঙ্গে মর্দ্দন করিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার কথা বার্ত্তা হইয়া থাকে। আমিও নির্ম্মলকুমারের পাঠাগার

যাইয়া উভয়ে নানা গ্রন্থ পাঠ করি। নির্ম্মলকুমার কখনও বিদ্যালয়ে যান না। কর্ত্তা মহাশয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতভাষার নানা রকম পুস্তক কিনিয়া দিয়াছেন। যে কোন গ্রন্থ ভাল লাগে, আমরা তাহাই পাঠ করি, তর্ক বিতর্ক করি, উভয়েই উভয়ের শিক্ষক হই, উভয়েই উভয়ের ছাত্র হই।

কর্ত্তা মহাশয় যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন, কখনও আমরা তাঁহার নিকট হইতে ছাড়াছাড়ি হই না; কিন্তু এই সময় আমাদিগকে পৃথক থাকিতে হয়। স্বচ্ছ আরসা-নিভ পরিস্কার পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়াই তিনি একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। গৃহিণীঠাকুরাণী স্বয়ং তাঁহাকে আহার করান, সে সময়ে আমরা তাঁহার নিকটে থাকিতে পাই না, কখন যাইও না, এই রূপই গৃহস্থের নিয়ম। নির্ম্মলকুমারকে এ বিষয়ের জন্য কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু সঠিক উত্তর পাই নাই। আরও একটি কথা, বিশেষ কোন ঘটনা পড়িলেও, নির্ম্মলকুমার কখনই অন্তঃপুরে যান্ না। তাঁহার শয়ন ভোজন প্রভৃতি পাঠাগারসংলগ্ন নিজ মহলে; সুতরাং আমারও অন্দরমহলে যাওয়া কখনই ঘটে না। এমন পবিত্রময় সংসারে এ গুহ্যভাব যে কি, তাহা বুঝিতে পারি না। যখন নির্ম্মলকুমারকে এ বিষয়ের তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই, তখন চুপচাপ করিয়াই থাকি, এ তথ্যানুসন্ধানে আমার আর আবশ্যক কি?

বেলা ১০টার মধ্যেই কর্ত্তা মহাশয় আহারাদি শেষ করেন। মাথায় পাগড়ী, গায়ে বেনিয়ান, পরণে থান, পায়ে সামান্য জুতা পরিয়া তিনি কাছারী বাড়ী যান, তাঁহার প্রিয়ভৃত্য শঙ্কর ছাতি ধরিয়া লইয়া যায়। কাছারী বাড়ী তাঁহার বাসবাটী হইতে একটু তফাতে। বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত কাছারী বাড়ীর বিষয় কর্ম্ম হয়। তিনি প্রতি দিনই ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত থাকিয়া নিজ চক্ষে বিষয় কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রতি রবিবার ও হিন্দুপার্ব্বণোপলক্ষে কাছারী-বাড়ী বন্ধ থাকে। কর্ত্তা মহাশয় কাছারীবাড়ী যাইবার সময় আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া যান, "আমার অনুপস্থিতে তোমরাই এ বাটীর অভি-

ভাবক, তাই এই সংসারের সমস্ত দিনের ভার তোমাদের উপর রাখিয়া গেলাম।” একজন দ্বারবান তাঁহার গমন ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রগামী হয়।

তারপর আমরা দু'টিতে নানা কৌতুকামোদে থাকি ; কোন কোন দিন নির্ম্মলকুমারের বন্ধু বান্ধব আসেন, তাস পাশা চলে, কাহারও কাহারও গুন্ গুন্ স্বরে গান ও ঠক্ ঠক্ টেবিল বাজনাও হয়। গান বাজনা কিন্তু বড়ই গোপনে। কর্ত্তা মহাশয় গান বাজনায় বড়ই বিরক্ত। তাঁহার বিশ্বাস, “গান বাজনা ধরিলেই ছেলে ছোকরারা বিগড়াইয়া যায়।” তাই গান বাজনা সম্বন্ধীয় কোন ঘটনা একেবারে আমাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। নির্ম্মলকুমারও গান বাজনা কিছুই বুঝেন না,—নির্ম্মল আনন্দেই আমাদিগের দিন কাটিয়া যায়।

কাছারী করিয়া ৫টার পর কর্ত্তা মহাশয় বাড়ী ফিরিয়া আসেন। প্রথমে আমাদিগের সংবাদ নেন,—সমস্ত দিনের হিসাব লইয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রস্থান করেন।

অপরাহ্নে জলযোগ করিয়া আমরা উভয়ে একই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া নির্ম্মলকুমারের সরকারের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হই, প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই উভয়ে বাটীতে ফিরি। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সব ঘরে আলো দেওয়া হইয়াছে, ঘর দ্বার বিছানা পত্র প্রভৃতি সমস্তই পরিস্কৃত হইয়াছে। নির্ম্মলকুমারের সজ্জাগারে আমারও কাপড় জুতা প্রভৃতি থাকে। একজন বেহারা আমাদের আটপৌরে সুট দিয়া ভ্রমণের পরিচ্ছদাদি লইয়া যায়, আমরা পাঠাগারেই আমাদিগের সান্ধ্যভোজন সমাপন হয়। এত বড় বাড়ী, এত লোকজন, রাত্র ১০টার মধ্যেই কিন্তু সকলে নিদ্রিত হয়।

প্রিয় পাঠক ! এখন আমি কি অবস্থায় কি ভাবে থাকি, তাহা সমস্তই একরূপ জানিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার সম্বন্ধীয় সমস্ত কাহিনীই সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু একটি কথা—একটি বিষয় বলিতে সমস্তই বাকী রহিল। তাহাও কিন্তু আমি উপস্থিত পরিস্কার রূপে পরিস্ফুট

করিতে পারিব না। যাহা ভালরূপে দেখি নাই বুঝি নাই, যাহা শুনিয়া বুঝিবারও নয়, তাহা কি বলিয়া বলি বলুন! তবে যে একেবারেই দেখি নাই তাহা নয়, দেখিয়াছি;—কিন্তু তাহা দূর হইতে, একেবারে যে ভাবি নাই, তাহাও নয়, ভাবিয়াছি;—কিন্তু সে ভাবনা মস্তিষ্কজাত নয়; বহিশ্চক্ষে দেখিলে যে একটা মোটামুটি বুঝিবার ক্রিয়া হয়, সেই শক্তিতে। তিনি আমাদের পূজ্যপাদ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়পক্ষীয়া পত্নী, আর এই ধনাঢ্য সংসারের গৃহিণী। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তাঁহার নাম শ্রীমতি জয়কালী দেবী।

জয়কালী এই গ্রামের সন্নিকটস্থ ভোলা গ্রামের শ্রীযুক্ত হরদয়াল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র আদরের কন্যা। উক্ত গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী৺ জয়কালীর মানস করিয়া একটু বেশী বয়সে তাঁহার এই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ৺দেবীর নামেই তাঁহার জয়কালী নামকরণ হয়। জয়কালী শৈশবে অতি সুশ্রী ছিলেন। একে বৃদ্ধ বয়সের কন্যা, তাহাতে শ্রীমতী বিবাহের উপযুক্তা হইলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাটিকে যাহাতে ধনবানের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিধাতার লিপি চাতুর্য্যে, অশেষগুণসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী পাত্রও পাইলেন। সেই পাত্রই আমার প্রতিপালক শ্রীলশ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

দশম চক্র।

শ্রীমতি জয়কালী দেবী।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন সংসার। প্রথম সংসার অর্থাৎ নির্ম্মলকুমারের গর্ভধারিণী. পঞ্চম বর্ষীয় শিশুমাত্র নির্ম্মলকুমারকে মাতৃহীন করিয়া সমস্ত সংসার কাঁদাইয়া পরলোক গমন করেন। সেই শোকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় উন্মাদ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই উন্মাদকর দুর্ব্বিষহ শোক এক বৎসরও রহিল না। একে পুরুষ, তাহাতে কুলীন, এক বৎসর মধ্যেই এই গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরমাসুন্দরী কন্যাকে গৃহে আনিলেন। কিন্তু বিধাতার কি ভয়ঙ্করী বিধি! পাঁচ বৎসর না যাইতে যাইতে বিসূচিকা রাক্ষসী অকালে তাঁহাকে গ্রাস করিল! প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আর বিবাহ করিব না,—ক্রমে বয়স বাড়িতে চলিল, আর কেন ভোগলিপ্সা? অবশিষ্ট জীবন ভগবানের ধ্যান ধারণায় কাটাইয়া দিব। আমার নির্ম্মলকুমার বাঁচিয়া থাকুক, আর ফাঁদে পা দিব না।" তাহা বলিয়া সমাজ শুনে কৈ? আত্মপক্ষীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বর্ষীয়ানগণই বা শুনেন কৈ? নানাবিধ প্রবোধ প্ররোচনায় তিনি প্রায় সম্মত হইলেন। এমন সময়ে ঘটনাক্রমে ভোলা গ্রাম হইতে এই সম্বন্ধ আসিল। তিনি নিজে কন্যা দেখিয়া একেবারে দিন স্থির করিয়া আসিলেন। সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে ভোলাগ্রামের হরদয়াল চট্টোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলেন। এ বিবাহে তিনি সুখী কি দুঃখী তাহা জানি না, আর জানিবার উপায়ই বা কৈ? তবে সকলেই কাণাকাণি করে, এবার এত আঁটা আঁটি কেন? তবে বোধ হয় দুই দুইবার ঠকিয়াছেন, এবার আর পলাইতে দিবেন না। তাই এইরূপ অবায়ুস্পর্শ্যা ও অসূর্য্যম্পশ্যা রূপিণী করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দুই মাসের মধ্যে আমি একদিন মাত্র অন্তঃপুরে গিয়াছিলাম। প্রথম দিন যখন ইহাঁর আশ্রমে আসি, কর্ত্তা মহাশয় গৃহিণীকে প্রণাম করাইবার নিমিত্ত আমাকে একবার লইয়া যান, তখন তিনি অবগুণ্ঠণাবৃতা ছিলেন, সুতরাং ভালরূপ দেখিতে পাই নাই। তিনি অন্তঃপুরবদ্ধা কুলবধূ; যদি বলেন, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত এত তাড়াতাড়ি কি? এত প্রয়োজন কি? হিন্দু-সমাজের নিয়মলঙ্ঘনরূপ পাপভার লইবারই বা তাৎপর্য্য কি? তাহার একটি কথা আছে। যখন আমি আমার জীবনের প্রতি দিনের প্রতি ঘটনার গুপ্ত রহস্য অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে বসিয়াছি, যাঁহার সহিত যে সূত্রে আমার একবার মাত্রও আলাপ হইয়াছে, তাঁহারি আকৃতি পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিতে বসিয়াছি, তখন গৃহিণীর মূর্ত্তি চরিত্র প্রভৃতি চিত্র করিতেই বা ক্ষান্ত থাকিব কেন? কর্ত্তা মহাশয় আমার পালয়িতা পিতা, তাঁহার গৃহিণী আমার পালয়িত্রী জননী, আমি পুত্র হইয়া আমার জননীকেই বা না দেখিব কেন?

আষাঢ় মাস; কয় দিন হইতে আকাশে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে চতুর্দ্দিক উত্তপ্ত, দ্বিপ্রহরে আজি আমি একাকী পাঠাগারে। আহারাদির পর হইতে নির্ম্মলকুমারকে দেখি নাই, কোথায় গিয়াছেন তাহাও জানি না। এমন সময়ে উভয়েই কখন ছাড়াছাড়ি থাকি না। তিনি যেখানেই যান না কেন, আমাকে সঙ্গী করেন অথবা বলিয়া যান। অদ্য হঠাৎ এইরূপ বিভিন্নতায় কিছু উন্মনা হইলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রামচরণ তাঁহার প্রিয় ভৃত্য, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেও কিছুই বলিতে পারিল না। একে গ্রীষ্মের উত্তাপ, তাহাতে নির্ম্মলকুমারের অনুপস্থিতি, আমার কিছুই ভাল লাগিল না। কতকগুলি পুস্তক পাড়িয়া এক এক খানি করিয়া খুলিলাম, মনঃসংযম হইল না। কাতরভাবে শুইয়া পড়িয়া বাতাস খাইতে লাগিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম,—একটু তন্দ্রাও আসিল। একটা গম্ভীর হিন্দুস্থানী আওয়াজে আমার তন্দ্রাভঙ্গ হইল,—সম্মুখে রঘুবীর দ্বারবান।

দ্বারবান্ কহিল; "আপ্‌কো চিঠি হৈঁয়—লিজিয়ে।" চিঠি দিয়া, সে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

চিঠি? আমার চিঠি? এ সংসারে কে আমার আপনার আছেন, যিনি পত্র দ্বারা আমার উদ্দেশ লন? নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া পত্রখানি খুলিলাম। একবার দুইবার তিনবার পড়িলাম, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিয়া গেল! এ যে নির্ম্মলকুমারের স্বহস্ত লিখিত—লোমহর্ষণ সাংঘাতিক পত্র!

"সোদরপ্রতিম প্রিয়তম ব্রজেন্দ্র!

এ পৃথিবীতে তুমিই সুখী, তোমার জীবনই অতি সুখকর; কারণ তোমার কেহই নাই। আমার সব আছে; প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে, দেবতার মত পিতা আছেন, আর যদি মা বলিতে হয়, তিনিও আছেন। কিন্তু আমি অতি দুঃখী, এ সংসারে আমার মত মর্ম্ম-পীড়িত কেহই নাই। যদি আমাকে শেষ দেখা দেখিতে চাও, ব্রজেন্দ্র! সুহৃৎশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্র! যদি একবার শেষবার দাদা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা কর, তবে বড় বাগানের পশ্চিম প্রান্তে বটবৃক্ষ তলে তোমার উদাসী, গৃহত্যাগী, প্রাণপীড়িত নির্ম্মল দাদাকে শেষ দেখা দেখিয়া যাও। ইতি—

তোমার

নির্ম্মল দাদা।

শত শত বজ্র যেন এককালীন আমার মস্তকে পতিত হইল। এ কি ভয়ঙ্কর! এ কি অচিন্ত্যনীয় ঘটনা! এ কি নির্ম্মলকুমারের পত্র? হাঁ, সেই লেখা—এ লেখা যে আজি দুই মাস ধরিয়া প্রতিদিন দেখিতেছি। তবে এ কি ব্যাপার! তবে কেন সদানন্দময় নির্ম্মলকুমারের প্রাণবিদারক এই স্বহস্তলিখিত লিপি! মহাপ্রতাপশালী দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র আজ উদাসীন গৃহত্যাগী! এ কি স্বপ্ন! না ঐন্দ্রজালিক ঘটনা! হৃদয়ের মধ্যে যেন প্লাবনের তুফান উঠিল। ছুটিলাম, উন্মত্তবৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া বড়বাগানের দিকে ছুটিলাম। মনের তখন এত দূর একাগ্রতা, সম্মুখে যদি পর্ব্বত পড়িত—বোধ হয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, আমার গতি বাধা মানিত না।

হায় হায়! একি নিদারুণ দৃশ্য দেখিলাম! আমার অকপট মিত্র প্রতিপালক-পুত্র রোরুদ্যমান নির্ম্মলকুমার, নিম্নমুখে অজস্র বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন। দৌড়িয়া তাঁহার পদতলে পড়িলাম।

শিহরিয়া নির্ম্মলকুমার কহিলেন, "ব্রজেন্দ্র! ভাই আমার এসেছ? এস ভাই, একবার শেষ কোলাকুলি করি, জন্মের মতন একবার দু'জনে কেঁদে নিই।"

রোদনস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলাম, "দাদা! চুপ করুন। কি হ'য়েছে দাদা? কেন এমন ভয়ঙ্কর পত্র লিখ্‌লেন? আমাকে ছেড়ে, আপনার পিতা মাতা রাজ সংসার ছেড়ে কোথায় যাবেন দাদা?"

নির্ম্মলকুমার কহিলেন, "ভাই, চল্লেম, যেখানে লোকালয় নাই, যেখানে কোলাহল নাই, যেখানে পাপ সংসার নাই, এমন নিভৃত স্থানে চল্লেম। উঃ ব্রজেন্দ্র! সংসার কি ভয়ঙ্কর।

এ কি সর্ব্বনাশ! নির্ম্মলকুমারের মুখে এ কি সর্ব্বনাশের কথা! নির্ম্মল-কুমার কি উন্মত্ত হইয়াছেন? আবার কহিলাম, "দাদা, দাদা, স্থির হউন, কেন এমন পাগলের মতন হয়েছেন? কি হয়েছে সব খুলে বলুন। সংসার ছেড়ে যাবার কথা আপনার মুখে কেন দাদা? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ভাবাবেন না, আমি বড়ই ভীত হয়েছি।"

যেন প্রবুদ্ধ হইয়া নির্ম্মলকুমার বলিলেন, "বল্‌ব, তোমাকে সব কথাই বল্‌ব; তা না হ'লে তোমাকে পত্র দ্বারাই বা ডাক্‌লেম কেন? সব কথা শোনবার আগে কতকগুলি বিষয় তোমাকে বুঝ্‌তে হবে। আমি পিতার একমাত্র পুত্র হ'য়ে বাটীর ভিতর যাবার আমার অধিকার নাই কেন? তার কারণ কি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ? হা ভগবন! সে কথাও আবার আমাকে মুখ ফুটে প্রকাশ কত্তে হ'ল?" দরদরিত অশ্রুধারে তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। আমি স্পন্দহীন, মুখে বাক্য নাই, যেন বজ্রাহত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে নির্ম্মলকুমার কহিতে লাগিলেন, "আমার মা নাই, আজ যদি আমার মা জীবিত থাকৃতেন, তা হ'লে কি ব্রজেন্দ্র! আমি পথের ভিখারী হতে যাই? আমার মা বলা সাধ ফুরায়েছে, সংসারের সাধও

সেই সঙ্গে চিরদিনের মত চলে গেছে! সব বল্‌ব, সব শুন্‌বে, একটি কথাও বাদ দিব না, শোন ঃ—আমি পাঁচ বছরের বালক, কিছুই জানি না ; মা আমার স্বর্গে গেলেন। বাবা আবার বিবাহ কল্লেন, ডাক নামে আমি আবার মা পেলেম, মায়ের মতন যত্নও পেলেম। যদিও তখন আমি বালক, মাতৃহীনতাজনিত যা কষ্ট, যদিও তখন আমি ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পাত্তেম না, তত্রাচ আমার যেন সব ভাণ ব'লে বোধ হ'ত। তাঁকে আমি মা বল্‌তেম, মা ব'লে কোলে উঠ্‌তেম—হায়, আমি কি হতভাগ্য! মা বলা আমার সইল না, সে মাও আমায় একলা ধূলির উপর ফেলে পালিয়ে গেলেন! তারপর আবার এক মা এলেন। কি বল্‌ব ব্রজেন্দ্র! ঘৃণা হয়, এ দুর্ব্বহ জীবন রাখ্‌তে আমার ঘৃণা হয়! কার কথা তোমাকে বল্‌ছি,—একি সেই মা? যে মায়ের কথা ব'লে এলেম, এ কি সেই মা? রাক্ষসী, পিশাচী, নরকেও বোধ হয় এমন ভয়ঙ্কর পাপ কীট নাই! সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল, আমায় পথের কাঙ্গাল কল্লে! আমার প্রাণ যায় ভাই, আমার প্রাণ যায়!"

আমি সোৎকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম, "দাদা, চুপ করুন, বাড়ী চলুন, আমি আর শুন্‌তে পারি না —আমি আর শুন্‌তে চাই না,—বাড়ী চলুন।"

নির্ম্মলকুমার। "বাড়ী যাব? আবার সেই নরকে ফিরে যাব? না ভাই আর না, এ জন্মে না! শোন তার পর বলি ;—এমন বুদ্ধিমান, এমন বিজ্ঞ হয়ে বাবা আমার এই কালসাপিনীকে ঘরে নিয়ে এলেন। সর্পিনী—সর্পিনী! যথার্থই সুরূপাচ্ছাদনীর মধ্যে ভয়ঙ্করী ভুজঙ্গিনী! বাবা বুঝ্‌তে পাল্লেন না, তার রূপ-যৌবনের আগুণে পুড়ে মলেন! সাপিনী প্রথম প্রথম কি জানি কি ভাবে আমাকে দেখ্‌ত, তখন আমি বুঝ্‌তে পাত্তেম না। তার চুম্বন, তার আলিঙ্গন বুঝ্‌তে পাত্তেম না, তার দৃষ্টি স্নেহময় ব'লে বোধ হ'ত ; প্রথম প্রথম কতই যত্ন, কতই ভালবাসা, আমার কিন্তু ভাই সে সব ভাল লাগ্‌ত না। তারপর একদিন, উঃ ব্রজেন্দ্র রে! তারপর একদিন কি ভয়ঙ্কর কি সাংঘাতিক কথাই বল্লে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ছুটে বাহিরে চলে এলেম। বাপের সঙ্গে দেখা কল্লেম না, পড়্‌বার ঘরে কেঁদে কেঁদে

একদিন এক রাত্রি কাটালেম। কত লোক ডাকাডাকি কল্লে, বাবাও দু'তিনবার এলেন, দরজা খুল্লেম্ না, নানান্ ওজর ক'রে কাটিয়ে দিলেম্, প্রাণের আবেগ যখন কমে এল, তখন বাইরে বেরোলেম। সকলেই কারণ জিজ্ঞাসা করে, বাবাও অনেকবার জেদ কল্লেন, বল্‌ব বল্‌ব করেও এ পাপ কথা তাঁর কাছে প্রকাশ কত্তে পাল্লেম না! মিথ্যা কথা কয়ে তাঁকে ভুলিয়ে রাখ্‌লেম। শোকে দুঃখে এইরূপে কিছুদিন কাটে। বাড়ীর ভিতর যাওয়া এককালীন বন্ধ কল্লেম। স্নান, আহার, শয়ন প্রভৃতি বাইরেই আরম্ভ হ'ল। যাতে সেই পিশাচীর চক্ষে আর না পড়্‌তে হয়, বিধিমতে তাই চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেম।"

আমি কহিলাম, "দাদা! একটী কথা জিজ্ঞাসা কত্তে আমার বড় ইচ্ছা হচ্চে। আপনি এরূপে বাইরে বসবাস কত্তে আরম্ভ কল্লেন, আপনার পিতা এতে সম্মত হলেন কি?"

নির্ম্মলকুমার কহিলেন, "ঠিক বলেছ ভাই, এটা অধিকতর আশ্চর্য্য! তিনি কিছুমাত্র আপত্তি কল্লেন না, কোন কথাতেই থাক্‌লেন না, দিন দিন আরও যেন আমার উপর গম্ভীর হ'তে লাগ্‌লেন। আমি জানি না, তিনি এ সমস্ত জ্ঞাত আছেন কি না। পিতা যে সর্ব্বদা আমাকে চ'খে চ'খে রাখেন, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। এই অবস্থায় আমার দিন কাটে, এমন সময় তুমি এলে। তার পর আমি আজ যা দেখ্‌লেম, ব্রজেন্দ্র! তা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্ব্বো না, এই দেখাই আমাকে গৃহত্যাগ করালে।"

আবার নীরব, মুখে কথা নাই, অশ্রুজলে তাঁহার মুখ চক্ষু ভাসিয়া গেল, উভয়েই উভয়ের দিকে অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিলাম।

নির্ম্মলকুমার। "আমি দেখ্‌লেম, স্বচক্ষে দেখ্‌লেম! এই দিবালোকে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখলেম, আমার পাপিনী বিমাতা পুরাতন ভৃত্য শঙ্করের সহিত এক শয্যায় শায়িত। কোন কথার উত্তর ক'র না, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা পেয়ো না, যা বলি শুনে যাও। হরদেবপুরে আমার গর্ভধারিণীর এক দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা আছেন, তাঁর কাছেই চল্লেম। কোথাও আমার শান্তি নাই, তাঁর কাছে গেলেই আমি শান্ত হব। তোমার নিকট আমার এই মিনতি,

ব্রজেন্দ্র ! ভাই ! এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না হয়। আমি নিশ্চয় জানি, সেখানে তাঁর কোলে আমি লুকিয়ে থাকৃতে পার্ব্বো। বাবা যত কেন কাতর হ'ন না, আমার বিহনে সংসারে যতই কেন অনিষ্টপাত হ'ক না, তুমি কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হয়োনা। তোমার উপর অনেক পীড়ন হবে জানি, কিন্তু ভাই, হাতে ধরে বল্‌ছি, বালকের মত যেন কোন কথাই প্রকাশ ক'রে ফেলো না। সংসারে কি কি ঘটনা ঘটে, কৃপা করে আমার নামে গুরুদেবপুরে শ্রীযুক্ত নীলরতন হালদারের বাটীতে ডাকযোগে পত্র পাঠিও; একটি কথাও ভুলো না, সব ঠিক ঠিক কাজ ক'রো। কিন্তু তুমি খুব সাবধান।"

আমি নির্ব্বাক নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া আছি,—একি ! নির্ম্মলের কম্পিতস্বর আর শুনিতে পাই না কেন? হায় হায় ! ঐ নির্ম্মলকুমার হাওয়ার মতন উড়িয়া গেলেন! কি হইবে! হায় হায়, এমন সর্ব্বনাশ কেন ঘটিল রে! ঐশ্বর্য্যবান ভাগ্যধর দেবনারায়ণের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র নির্ম্মলকুমার সংসার জ্বালায় আজ গৃহপলাতক হইলেন। হা সংসার! এ কি তোমার নিদারুণ চক্র! আমি সংসারহীন, সংসারতাড়িত, তোমার চক্রে আমাকেই পেষণ করিতে পার কর, ক্ষতি নাই; কিন্তু ঐ নির্ম্মলচরিত্র নির্ম্মলকুমারের প্রতি তোমার এই অমোঘ কুটিল দৃষ্টি কেন? এই দেবনারায়ণের সংসার, স্বর্গের সংসার বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল, কিন্তু এখানে কি ঘৃণিত নারকীয় ঘটনা! উঃ কি বীভৎস স্রোত! ভগবন! আরো কত কষ্ট সহ্য করিব বল? তোমার মনে আর কত আছে! এমন জাজ্জ্বল্যমান সংসারে আনিলে, পিতার প্রতি ভ্রাতার প্রতি যেমন ভক্তি করিতে হয়, তেমনি ভক্তি আমার হৃদয়ে পূর্ণ করিয়া দিলে, তবে এ খেলা তোমার কেন? দয়াময়! রক্ষা কর, দীন হীন অভাগা সন্তানকে স্থান দাও—আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।

দেখিতে দেখিতে বেলা টুকু কাটিয়া গেল। চলিলাম, একান্ত ভগ্নমনে কম্পিতচরণে চলিলাম। কিছু দূর আসিয়াছি, নিকটবর্ত্তী একটি ঝোপের মধ্য হইতে কতকগুলি অস্ফুট স্বর শুনিতে পাইলাম। চমকিত হইয়া স্থির-কর্ণে তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম। যেন দুই জনে চুপি চুপি কি কথা বলাবলি করিতেছে। প্রথম স্বর একটু কোমল, দ্বিতীয় স্বর গম্ভীর, ভাবে বোধ হইল

একটি স্ত্রীলোক, অপর পুরুষের সহিত গোপনে কি কথা বার্ত্তা কহিতেছে। এও এক প্রহেলিকা! নিতান্ত শূন্যপ্রাণে যাইতেছিলাম, সন্দিগ্ধভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম।

স্ত্রীলোক। "তবে তাই কর, আজই জবাব নাও।"

পুরুষ। "হঠাৎ এখন কি ব'লে জবাব নিই?

স্ত্রীলোক। "এই কথা? এ'ত সহজেই প'ড়ে রয়েছ। শিগ্‌গির কথা গুল বলে ফেলি এস; কর্ত্তা কোথায় বেরিয়েচেন, ফিরে আস্‌বারও বোধহয় দেরি নাই। দেখ, আমি এইবার রাগ ক'রে দোরে খিল দে শুয়ে থাকি গে। খুব কেঁদে কেটে তাকে ঘর থেকে বিদেয় কর্‌ব, তুমিও অমনি হাতে পায়ে ধরে কেঁদে ককিয়ে জবাব নেবে।"

পুরুষ। "তা ত নেব, কিন্তু কি বোলে নি? সেইটে বুঝিয়ে দাও।"

স্ত্রীলোক। "তুমি পুরুষ না আমি পুরুষ? সব কথা গিলিয়ে না দিলে বুঝি আর বোঝ্‌বার ক্ষমতা নেই? খুব মন্দ কিন্তু যা হোক্। এই শোন,— সাক্ষীকে সাক্ষী হবে—অথচ সব দিক বজায় থাক্‌বে।"

এ কার কথা? এ স্বর চিনিতে পারিতেছি না, কিন্তু এ পুরুষকে চিনি, এ সেই নরপিশাচ ভৃত্য শঙ্কর। এই শঙ্কর হইতেই ইহার মনিব-পুত্র নির্ম্মল-কুমার গৃহত্যাগ করিলেন। তবে ঐ স্ত্রীলোক কি নির্ম্মলের বিমাতা? এই বাটীর গৃহিণী? ভাবে বোধহয় তাই। উঃ কলঙ্কিনী নিজ পাপকলঙ্ক ঢাকিবার জন্য উপনায়কের সঙ্গে না জানি কি ভয়ঙ্কর পরামর্শ করিতেছে! গোপনে গোপনে সমস্তই শ্রবণ করি, দেখি যদি এ সংসারের কোন উপকার করিতে পারি। স্থির অবিচলিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গৃহিণী। "সব বুঝ্‌তে পাল্লে—যা যা আমি বল্লেম? প্রথমটা খুব কাঁদ্‌বে কাট্‌বে, তারপর এই বোলে জবাব নেবে। 'গিন্নি-মা'র কান্না শুনে উপরে দৌড়ে গিয়ে দেখ্‌লেম যে, দাদাবাবু তাঁর মাথার চুল ধরে টানাটানি কচ্চেন, আর কতই আকথা কুকথা বল্‌ছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে ধর্ত্তে গেলেম, দাদাবাবু আমায় মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলেন। এত মার ধর আমি কেন খাব বাবু? আমার মাহিনা পত্র সব চুকিয়ে দিন, আমি দেশে চলে যাই'।



বুঝ্‌তে পাল্লে? তারপর গ্রামের ভিতর লুকিয়ে থাক্‌বে, লুকিয়ে লুকিয়ে দিনে দুপুরে যেমন আস্‌ছ, তেমনি আস্‌বে। এখন এই কিছু খরচ নাও, যা বল্লেম, যেন ভুলো না। চল, আর দেরী না হয়।"

এই অবধি শুনিতে পাইলাম, তারপর উভয়েই যেন অন্ধকারে অন্ধকারে চুপি চুপি সরিয়া গেল।

আর দাঁড়ান নিষ্ফল দেখিয়া আমিও ধীরে ধীরে সদর দরজার নিকট আসিলাম। কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই ঘটিয়া গেল। ধন্য স্ত্রীজাতি তোমার কুহক! —ধন্য তুমি শ্রীমতি জয়কালী দেবী!

একাদশ চক্র

ভুজঙ্গিনী।

সমস্তই চুপচাপ, সাড়াশব্দ নাই। এত বড়। ঘটিয়া গেল. নির্ম্মলকুমার যে নিরুদ্দিষ্ট হইলেন, তাহার জন্য কোনই কষ্ট নাই, সকলে বেশ স্থির ধীর শান্ত। যেমন সুশৃঙ্খলে সংসার চলে, তেমনি চলিতেছে। সময় কাহারও হাত ধরা নয়, স্রোতের ন্যায় সমভাবে বহিতেছে। কর্ত্তা মহাশয়ের সুনিয়মের একটিরও ত্রুটি হইতেছে না। শৃঙ্খলা বন্দোবস্ত সবই ঠিক আছে, নাই শুধু নির্ম্মলকুমার! আর একটি দেখিবার আছে, তাহা কি? উদারচেতাঃ গম্ভীরপ্রকৃতি দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ধীরোজ্জ্বল প্রশান্ত বদন! তিনি আগে যত কথা কহিতেন, এখন আর তত নয়। আগে আমাকে যত আদর করিতেন, এখন আর তত নয়; অথচ অযত্নও করেন না। এখন কোন বিষয় দুই তিনবার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া না দিলেও যেন বুঝিতে পারেন না। আগে যত শীঘ্র শীঘ্র চোকের পলক

পড়িত, এখন যেন আর তত শীঘ্র পড়ে না। কেমন ছাড়া ছাড়া, কেমন উদাস উদাস ভাব। দিন দিন আমিও যেন মাটীর সহিত মিশাইয়া যাইতেছি। সেই নির্ম্মলকুমারের পাঠাগারে আমি একলা থাকি। আহার নিদ্রা ব্যতীত আর আমার কি কার্য্য আছে? আমি একলা নীরবেই তাহা সম্পাদন করি। মনে কতবার ইচ্ছা হয়, বাড়ী ত্যাগ করিয়া, আর কোথাও সরিয়া পড়ি; কিন্তু পারি না, নির্ম্মলকুমারের শেষ কথা আমি ভুলিতে পারি না। আর আমার স্থানই বা কোথায়? যাই কোথায়?

আর দুইটি ব্যক্তিকে এ বাড়ীতে দেখিতে পাই না। প্রথমটি নির্ম্মলকুমারের প্রিয় ভৃত্য রামচরণ, সে কাঁদিয়া কাটিয়া প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে, আর দ্বিতীয়টি সেই পাপিষ্ঠ শঙ্কর। শঙ্কর বোধ হয় তাহার প্রভু-পত্নীর পরামর্শ মতই কার্য্য করিতেছে, কিন্তু কখন্ কোন্ সময় তাহার জবাব হইল, তাহা জানিতে পারি নাই, প্রভু-পত্নীর সহিত প্রভুর কিরূপ ব্যবহার, তাহাও জানি না। আমি বাহিরের লোক, বাহিরে থাকি; বাহিরে বসিয়াই কর্ত্তা মহাশয়ের নীরব গতি বিধি দেখি। কি আশ্চর্য্য! এমন সর্ব্বগুণাকর একমাত্র পুত্র নির্ম্মলকুমার নিরুদ্দেশ হইলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রপ্রাণ হইয়া কিরূপে এখন নীরব আছেন—কে জানে!

বেলা দ্বিপ্রহর, সংসার নিস্তব্ধ; আমিও আহারাদি শেষ করিয়া সেই পরিত্যক্ত পাঠাগারে একাকী বিশ্রাম করিতেছি। একটির পর একটি করিয়া কত দুশ্চিন্তাই আমার হৃদয়কে আকুল করিতেছে! থেকে থেকে নির্ম্মলকুমারকে মনে পড়ে, আর আত্মহারা হই, নয়নজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যায়। আহা রাজপুত্র হইয়া আমার নির্ম্মলকুমার নিরুদ্দিষ্ট! কোথায় তিনি এই বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজসংসারে কর্তৃত্ব করিবেন, না আজ পথের ভিখারী হইয়া দুরপণেয় দুঃখে উদাসীন প্রায় গৃহত্যাগ করিলেন! ছি ছি,—ধিক্! স্ত্রীজাতি! বিধাতা যে তোমাদের কোন্ উপকরণে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আ মরি মরি! শুভ্রকিরণবিধৌত সরলতার ছবি খানি মল্লিকাফুলটিকে হা পিশাচি! নির্দ্দয়রূপে পদদলিত করিয়া তোর কি ফল লাভ হইল? সপত্নীপুত্র আর গর্ভজাতপুত্রে প্রভেদ কি? সেই সুকুমার

শিশু নির্ম্মলচরিত্র নির্ম্মলকুমারের উপর—তুই জননীপদবাচ্যা হইয়া তোর এই দারুণ অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয় পাপ অভিলাষ! কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্ম কি একেবারেই নাই? হা নরক! না জানি এই মহাপাপিনীর জন্য তোমাতে কোন্ দুর্দ্দমনীয় কুণ্ড সৃষ্টি হইতেছে!

সহসা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একটা কি গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ হইল। আমার গভীর চিন্তা ভাঙ্গিয়া গেল, স্থির হইয়া শুইয়া রহিলাম। হায়, হায়, আবার সেই সতর্ক কথোপকথনের গুণ গুণ শব্দ! আবার না জানি কিসের পরামর্শ,—আবার না জানি কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই সংঘটিত হইবে। আমি প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শয়িত রহিলাম; কিন্তু শুনিতে পাইলাম না। দূর হউক, আর শুনিব না, যত বড়ই গুপ্ত কথা হউক না কেন, আর শুনিব না; আর আপনাপনি এতাধিক কষ্ট সহিতে পারি না,—যাহার মনে যাহাই থাকুক সে তাহাই সম্পাদন করুক। কিন্তু ওরে! নির্ম্মলকুমারের শেষ কথা যে ভুলিতে পারি না,—সে যে বিদায়ের সময় দুটি হাতে ধরিয়া বলিয়া গিয়াছে, "দেখো ভাই, সংসারে যাহা যাহা ঘটনা ঘটে, তৎসমস্তই যেন আমার মাতুলাশ্রমে পত্রযোগে জানাইও, যেন সমস্তই আমি জানিতে পাই।" সে কথা আমি কি করিয়া ভুলিয়া যাই? তবে দেখি, ওই রহস্যময় সংসারমেঘে কি বিপদবজ্রের সমষ্টি বাঁধিতেছে! তবে দেখি, এই স্থির বাসন্তীপবনে কোন্ আপদপ্রভঞ্জনের সৃষ্টি হইতেছে!

উঠিলাম; নিতান্তই বিরক্ত সহকারে উঠিলাম। স্থির নিষ্পন্দ প্রায় দেয়ালে কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম।

"আরে না না, তুমি বোঝনা,—আজ সন্ধ্যে থেকেই কাজ সুরু করে দাও। এখন বেলা প্রায় দুটো, আর তিনিও চারটের মধ্যে আসচে, মালও হাতে তৈরি, তবে আর দেরির দরকারটা কি?"

"কি জান, গিন্নি ভাই বড্ড ভয়তরাসে। এখন ত খুব বুক বেঁধেছে বোল্লে জানাচ্ছে; কিন্তু কাজের সময় যদি এলিয়ে পড়ে? আমার তাই খালি ভয় হচ্ছে! কি জান, কর্ত্তা বড় ধড়ীবাজ, তাকে ভুলিয়ে কাজ করা বড় সোজা কথা নয়,—আমি বলি তার চেয়ে অন্য কোন কৌশল কর।"

"উঃ বুদ্ধির বাচষ্পতি আর কি ! গিন্নী ছাড়া এমন কাজে কে হাত দেবে রে পাগল ? কর্ত্তার কাছে দাঁড়ায় কে ?"

"আমার কিন্তু ভাল বোলে বোধ হচ্ছে না, এ পরামর্শই আমাদের ঠিক্ হচ্ছে না। এখনও ত আমাদের ঢের সময় আছে ; আর এমন তাড়াতাড়িই বা কি ? আজকের দিনটা যাক না। একটা কাজ কত্তে গেলে অনেক বিষয় ভেবে চিন্তে কত্তে হয়। যদি ধরা পড়ি, তা হ'লে কি সর্ব্বনাশই হবে বল দেখি ? আমার বুদ্ধি শোন, আজকের এ মৎলব ছেড়ে দাও। যা তোমাকে বলেছিলুম সেই উপায়ই কর—সাপও মর্‌বে—লাঠিও ভাঙ্‌বে না।"

"তুমি বল্‌চ বটে, আর এ কথাও বটে। আচ্ছা তবে তোমার কথা মতই কাজ হোক।"

আবার চারিদিক নিস্তব্ধ। যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহাদের গমনের শব্দও শুনিতে পাইলাম না, যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

আবার একি সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র! এরা কারা ? আর কিসেরই বা পরামর্শ ? হা ভাগ্য! আবার না জানি কি একটা বিপদ্‌পাতের সূত্রপাত হইল! এ নিশ্চয় কর্ত্তা সম্পর্কীয় কোন গুপ্ত পরামর্শ! এই বাটীর গৃহিণী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইবার নয়। কি কার্য্য ? আর গৃহিণীও কেন তাহার জন্য বুক বাঁধিয়াছেন ? "মাল হাতেই তৈরি" এই বা কি কথা ? এই যে তুইজন এতক্ষণ পরামর্শ করিতেছিল, ইহারাই বা কাহারা ? জগদীশ্বর সন্দেহভঞ্জন হরি! আমার এই দারুণ সন্দেহ ভঞ্জন কর! আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এই পরামর্শের মূল কারণ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয়কম্পন আরম্ভ হইল! বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, কোন কারণই মনে আসিল না। এই ষড়যন্ত্রকারী কাহারা, গলার স্বরেও তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। তাহাদের কথা অনুসারে বুঝিলাম, তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি অদ্য সিদ্ধ হইবে না, অন্য কোন দিন হইবে। কিন্তু এখন হইতে আমার সতর্ক থাকা নিতান্ত

কর্ত্তব্য; কর্ত্তা মহাশয়কে ত চখে চখে রাখিতে হইবে, এখন হইতে তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে হইবে।

দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ আসিল, কর্ত্তা মহাশয়ও কাছারী বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। বাড়ীতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সমস্ত চাকর দাসী হাঁক ডাক করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল, যেন ঘুমন্ত অট্টালিকাখানির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কর্ত্তা মহাশয় অন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমি বৈকালিক কার্য্য এক প্রকার সারিয়া লইলাম। ওহো, নির্ম্মল-কুমার! দাদা! কোথায় তুমি? তোমার পিতা কাছারী বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেখ অপরাহ্ণ আসিয়াছে, আমাকে সঙ্গী কর ভাই, এস দাদা, আমরা সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হই!

আমি সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া বহির্ব্বাটীর সম্মুখস্থ পথে নিতান্ত উন্মন-ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় হরদয়াল নামে একজন ভৃত্য (এই হরদয়াল সেই পাপিষ্ঠ শঙ্করের স্থানে নূতন নিযুক্ত হইয়াছে) আমাকে আসিয়া কহিল, "আপনাকে কর্ত্তা মহাশয় ডাক্‌চেন, তিনি শয়ন ঘরে; কি একটা বিশেষ কাজ আছে।" হরদয়াল প্রস্থান করিল।

শয়ন ঘরে? একি আশ্চর্য্য! কর্ত্তা মহাশয় আমাকে শয়ন ঘরে ডাকিতে-ছেন? আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আজি প্রায় ছয়মাস অতীত হইতে চলিল, প্রথম দিন ভিন্ন ত অদ্যাপি সে মুখও কখন হইতে পাই নাই, হইবার কখনও আদেশ পাই নাই; তবে আজ হঠাৎ একি অভূতপূর্ব্ব আদেশ! কেন ডাকেন? ইহার কারণ কি? নির্ম্মলকুমারের গৃহত্যাগের পর আমার সহিত কর্ত্তা মহাশয় একদিনও ভালরূপ কথা কহেন নাই, আমাকে দেখিবা মাত্র তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন,—তবে বোধ হয়, নির্ম্মলকুমারের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন, হয়ত এমন কিছু বুঝিয়াছেন, যাহাতে আমাকে শয়নগৃহে লইয়া গিয়া কোন নূতন প্রশ্ন করিবেন। আমি শয়নগৃহে যাইতে আদেশ পাইয়াছি, যাই, যদি অবসর পাই, তবে সেই ভুজঙ্গিনীকে একবার মানসনয়নে ভালরূপে দেখিব; দেখি, তাহার মুখ চক্ষে এখনও কি ভয়ঙ্করী কুটিলতা প্রকাশ করে! যাই গিয়া দেখি, অদ্য দ্বিপ্রহরের

সেই অজ্ঞাত পরামর্শ তাহার আকার ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয় কি না! হায় হায়, নির্ম্মলকুমার! দাদা! তুমিও যেমন সংসারের ভুগ বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়াছ, আমারও সেই দশা! তবে তোমা কর্ত্তৃক সংসার পরিত্যক্ত, আর আমি সংসার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। নচেৎ তোমাতে আমাতে আর কিছুই প্রভেদ নাই! উঃ ধন্য কলিকাল! ধন্য সংসার! আর শত ধন্য তোমার তুমি—ভুজঙ্গিনি! শ্রীমতি জয়কালী দেবী!!

দ্বাদশ চক্র।

সুখের মাত্রা বাড়িল।

একটি পরম সুসজ্জিত শয্যাগার। দেয়ালের চতুর্দ্দিক অতিসুন্দর সুরুচিসঙ্গত তৈলাক্তচিত্রে (Oil-Painting) নানাবর্ণে সুরঞ্জিত। তদুপরি স্থানে স্থানে নানান মত দীর্ঘ দীর্ঘ হিন্দু দেব-দেবীর ভক্তিমূলক চিত্রমূর্ত্তি। গৃহের তলভাগে অতি সুকোমল সুবৃহৎ গালিচা বিস্তারিত। দক্ষিণভাগে বাতায়নসংলগ্ন একটি মনোহর পালঙ্ক, শয্যাও তদুপযুক্ত। স্থানে স্থানে দিব্য সুন্দর কৌচ, নানাবিধ কেদারা, মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর তেপায়া, তদুপরি ফুল-তোড়া সংবদ্ধ ফুলদানী, ঠিক মধ্যস্থলে পঁচিশটি কাঁচের ডাল বিস্তার করিয়া একটী প্রকাণ্ড ঝাড়, নানা চিত্রে চিত্রিত একখানি টানা পাখা লম্বিত, বারটি অর্দ্ধাঙ্গাবৃতা পরী অতি নয়নরঞ্জন বারটি আলোক স্তম্ভ ধরিয়া দেয়ালের দশদিকে উড্ডীন হইতেছে। এক কথায় বলিতে হইলে গৃহটিকে একটি রাজশয়নাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূহুর্ত্ত মধ্যে শয়নাগারটিকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম। আর একটি যুগলচিত্র

দেখিলাম, তাহা অম্লে মধুরে, কোমলে কঠিনে রৌদ্রে বরিষায়, হাস্যে রোদনে, বৃদ্ধে যুবতীতে!

আমার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় একটি কৌচে এবং সম্মুখবর্ত্তী অপর একখানি কৌচে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃতা অষ্টাদশবর্ষীয়া তৎপত্নী শ্রীমতি জয়কালী দেবী উভয়ে মুখামুখী হইয়া উপবিষ্ট আছেন। আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি যত্নে সমাদরে হাত দু'খানি ধরিয়া আমাকে তৎপার্শ্বে বসাইলেন। আমি অতি কুণ্ঠিতভাবে বসিয়া আছি, কর্ত্তা মহাশয় কহিলেন, "আজ অনেকগুলি প্রশ্ন-বাণ তোমার উপর বর্ষণ হ'বে, তুমি অম্লান বদনে উত্তর কর। প্রথমে জিজ্ঞাসা করি,— কে তুমি?"

আমি অকুতোভয়ে কহিয়া উঠিলাম, "অদ্যাবধি জানি না, আমি কে। আমার পরিচয় যতদূর আমি জান্‌তেম, মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে সে সমস্তই নিবেদন করে'ছি। এখন এইমাত্র জানি, আর এইমাত্র আমার পরিচয়, আপনি আমার প্রতিপালক পিতা, আপনার আশ্রয়ে আমি পুত্ররূপে প্রতিপালিত হচ্চি।"

কর্ত্তা মহাশয়। "ভাল, আর অধিক বল্‌তে হবে না, বুঝ্‌লেম তুমি আমার প্রতিপাল্য পুত্র। আজ যে হঠাৎ আমার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে আমি তোমাকে আমার শয়ন ঘরে আহ্বান ক'রেছি, তার কি কারণ তুমি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ?"

আমি। "আজ্ঞে না।"

কর্ত্তা মহাশয়। "তুমি আর একটি অতি গুরুতর কথা শুন্‌বে বোলে। যা বলি, সমস্তই ধীরে ধীরে তার উত্তর দাও। আমি এতদিন জান্‌তেম, নির্ম্মলকুমার যথার্থই নির্ম্মলচরিত্র; কিন্তু তার চরিত্র যে এত পঙ্কিল, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। বল দেখি, মাতা আর বিমাতায় প্রভেদ কি? ছি ছি! সে পাপাশয় পুত্রের পাপাচরণ দেখবার পূর্ব্বে হা বিধাতঃ আমাকে পুত্রহীন কল্লে না কেন? শোন ব্রজেন্দ্র, সে পাপাত্মার পাপ ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিষয় আমাকে বোঝাবার চেষ্টা পেয়ো না। আমি স্থির জানি, কায়মনে

জানি, যে কারণে নির্ম্মল পাপমুখ দেখাবার ভয়ে চুপি চুপি পলায়ন ক'রেছে, সে কারণের অণুমাত্রও মিথ্যা নহে। এই সতীর সহিত সে যে পশুবৎ ব্যবহার করেছে, তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাকে পুত্র-হত্যার পাপে লিপ্ত কর্‌বার আগে সে যে বিদায় নিয়েছে, তাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হ'য়েছে। আবার বলি ব্রজেন্দ্র! বল, সে যাবার সময় কি কি কথা ব'লে চ'লে গেছে!"

আমি স্তম্ভিত হইলাম, সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল! একি কাণ্ড! নির্ম্মলের দেবোপম পিতার মুখে অকলঙ্ক নির্ম্মলচন্দ্রের চরিত্রে একি কলঙ্ক-ঘোষণা! ধন্য! ধন্য! আশ্চর্য্য অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!

আমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! কর্ত্তা মহাশয়ের এই দুরন্ত প্রশ্নের আমি কি উত্তর দিব? উঃ—কি ঘোরতর মিথ্যামিশ্রিত দারুণ চাতুরী চক্র! কার মিথ্যা? নির্ম্মলের মিথ্যা, না নির্ম্মলের বিমাতার মিথ্যা? নির্ম্মল ত সে ছেলে নয়, নির্ম্মল যে যথার্থই নির্ম্মল। সে যখন সজল-নয়নে ভগ্নমনে কম্পিত-চরণে বিদায় গ্রহণ করে, সে ভাব ত স্পষ্ট এই দিবালোকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি,—সে ভাব ত মিথ্যা হইবার নয়, নির্ম্মল পাপকলুষিত নয়, নির্ম্মল যথার্থই নির্ম্মল। এই অষ্টাদশবর্ষীয়া ক্রূরমতি কালভুজঙ্গিনী নারী ইহারই এই সাংঘাতিক চাতুরী চক্র! ইহার এই পাপপূরিত নারকীয় প্রাণ এই দুর্ভেদ্য ছলনাজালে আবৃত করিয়া এই স্ত্রৈণ অপদার্থ বৃদ্ধকে এইরূপ অকর্ম্মণ্য করিয়াছে! কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহার একটি বিন্দুও মিথ্যা বলিব না, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতই পীড়ন করুন না কেন, আমি অটল অবিচলিত ভাবে দেবতা প্রত্যক্ষের মত সত্য ভিন্ন কখনই মিথ্যা বলিব না।

কর্ত্তা মহাশয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ব্রজেন্দ্র! তুমি এমন নীরব হয়ে রৈলে? সমস্তই অকপটে নির্ভয়ে বল, তোমাকে কি ব'লে কি বুঝিয়ে সে পালিয়ে গেছে? সে এ কথা ব'লে তোমাকে ভুলিয়েছে বুঝি, যে 'আমার বিমাতা আমাকে চুপি চুপি একটা ঘরে আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার কাণ কামড়ে দিয়েছে, আরও আরও কি সব ব'লেছে, সেইজন্য আমি বড় মনের দুঃখে এই এতটা ঐশ্বর্য্য ফেলে আমার

বাবাকে না ব'লে ক'য়ে চুপি চুপি মহাপ্রস্থান কল্লেম।" আর তুমিও অমনি ঠিক বুঝে ঘরে ফিরে এলে, আর আমার সঙ্গে সেই জন্যে ভাল ক'রে কথাও কইলে না! কেমন এ সব ঠিক ত?"

আমি গদগদ কণ্ঠে সজলনয়নে কহিলাম, "মাফ্ করুন! আমাকে মাফ্ করুন! আপনার ভ্রুকুটী ভঙ্গী দেখ্‌তে পারি না,—আর আমি নির্ম্মলের চরিত্রের উপর অযথা নিন্দাবাদও শুন্‌তে পারি না। আপনি নির্ম্মলের পিতা, আমার পালয়িতা, আমাকে দূর কত্তে হয়, দূর করুন, তাহাতে কিছুমাত্রও আমি দুঃখিত হব না, কিন্তু বিমল নির্ম্মলের উপর এরূপ বজ্রশেল নিক্ষেপ কর্ব্বেন না। আপনি আমাকে এরূপ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ কর্ব্বেন না!" এই বলিয়া আমি সকাতরে তাঁহার পাদুখানি জড়াইয়া ধরিলাম।

ঈষৎ রোষে তিনি কহিলেন, "তবে তুমি কি বল যে, এই নিরপরাধ সতীমূর্ত্তি আমার স্ত্রীরই সমস্ত দোষ? দেখ, এ বড় ভয়ঙ্কর গর্হিত ঘটনা! কে কবে শুনেছে যে, 'বিমাতা সপত্নী-পুত্রের প্রতি এইরূপ ঘৃণিত পাপা-ভিলাসিনী?' একি হয়? না, সম্ভব?"

"এ যেমন হয় না, এ যেমন অসম্ভব, তবে আমিও নির্ভয়ে বলি, 'কে কবে শুনেছে যে সপত্নীপুত্র বিমাতার প্রতি এইরূপ মহানিন্দনীয় ঘৃণিত অকথ্য পাপ অভিলাষী?' কর্ত্তা মহাশয়! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে উদ্ধার করুন, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না! আমি আপনার মর্য্যাদা রেখে কথা বল্‌তে পার্‌ছি না, আমার মস্তক ঘূর্ণিত, আমি নির্ম্মল-দাদার শোক ভুল্‌তে পাচ্ছি না।"

কর্ত্তা মহাশয় যেন উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "শোন্ জয়কালি! ব্রজেন্দ্র আবার কি ব'লে শোন! আমি কার কথা শুনি—কার কথা বিশ্বাস করি? আমায় পাগল কল্লে—যথার্থই আমায় পাগল কল্লে!"

ক্রূর সর্পিনী গর্জ্জিয়া উঠিল! "আমি তোমায় পাগল কল্লুম—না তোমরা আমায় পাগল কল্লে? সেই দিন থেকেই ত আমি বলে আস্‌ছি, আমায় ছেড়ে দাও! কেন, আমার বাপের কি ভাত নেই—না চাল চুলো নেই? যে আমাকে পেটেও ঠাঁই দিয়েছে, সে আমাকে হাঁড়ীতেও ঠাঁই দেবে।

দেখ দেখি একবার কেলেঙ্কারীর কথাটা! তোমার বেটাকে ডেকে আমি সোহাগ কত্তে গেছি? এত বড় আস্পদ্দার কথা? খুড় মড়া! একটু অক্কেল নেই? এ কথাটা ভাববার আগে তোমার মুণ্ডুটা খস্‌ল না? ব্রজ! তোর যত বড় মুখ—তত বড় কথা? তুই তার হ'য়ে সাক্ষী দিতে এসেছিস্? কোথাকার কে তুই? তুই মড়ার মতন নদীর ধারে পড়েছিলি, বাবু তোর ওপর দয়া কোরে কুড়িয়ে নিয়ে এনে ছেলের মতন প্রতিপালন কচ্চেন, তারি স্ত্রীর মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এই সব কথা বল্‌ছিস্? তোরা দুজনে যোগ সাজস্ ক'রে, আমাকে বনবাস দিবি বোলে এই সব চক্র সাজিয়েছিস্! আমি দুষী আর সে নির্দ্দুষী? তোরা কত প্রমাণ চাস্? শঙ্কর সব জান্‌ত, সে স্বচক্ষে সমস্ত দেখেছে! তাই সে আগে মানে মানে বিদায় নিয়েছে! সে যদি নির্দ্দুষী হবে, তবে পালাল কেন? তার বাপের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সব কথা খুলে বল্‌তে পারেনি? তোকে দুধ কলা দিয়ে এইজন্যে পুষেছিল বটে? বেশ, তোরাই থাক্,—আমি মানে মানে বিদেয় নিই! ডাক, শীগ্‌গির পাল্কী বেহারা-দের ডাক, আমি এখুনি বাপের বাড়ী যাব। আমি যদি আর এ বাড়ীতে থাকি, আর এক গণ্ডুষ জল স্পর্শ করি, তবে আমি অব্রাহ্মণের মেয়ে!"

গৃহিণী গমনোদ্যতা—রোষকষায়িত আঁখি! আমি মর্ম্মাহত বজ্রাহত প্রায় বসিয়া পড়িলাম। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত্রস্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "আরে চুপ কর না—একেবারে যে ক্ষেপে উঠ্‌লে দেখ্‌তে পাই! কি বিপদ! এই জন্যই ত এত দিন এ সব কথা উত্থাপন করিনি! ঠাণ্ডা হয়ে রাগটা থামাও। সত্য সত্য কি আমি তোমায় দোষী করছি? অত শক্ত শক্ত কথা বল্‌ছ কেন? যখন মুখটা ছোটে, তখন চারিদিক চেয়ে কি কথা বল্‌তে পার না? ছি! ছি! ব্রজেন্দ্র পরের ছেলে, ও নিরীহ ভাল-মানুষ, ওকে কি এমন কটু কথা বলে? ও ছেলেমানুষ অত শত কি বুঝ্‌তে পারে? সে ছোঁড়াকে একটু ভক্তি শ্রদ্ধা করত কি না, সে যেমন বুঝিয়েছে, এও তাই বেদবাক্য বোলে মেনে নিয়েছে। সত্যই ত, এ যে বড় যুক্তিসঙ্গত কথা। সে যদি নির্দ্দোষী হবে, তবে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে সব কথা বল্‌তে পাল্লে না কেন? সে মরবার ভয়েইত পালিয়েছে! যাক্ সে চুলোয় যাক্,

তার পাপ নাম আর উত্থাপন করবার আবশ্যক নাই! এখন যোড়হাত ক'রে বলি, জয়কালি! ঠাণ্ডা হও! দেখ, আমি বুড় মানুষ, আমাকে আর প্রাণে মার কেন? চুপ কর, ছিঃ বাপের বাড়ী যাবার কি নাম কত্তে আছে? তুমি চলে গেলে এত বড় সংসারটা চালাবে কে বল দেখি? ব্রজেন্দ্র! বাবা! তুইও আমাকে মাফ কর্!—"

আমার মনে যতটা দুঃখ হইয়াছিল, কর্ত্তা মহাশয়ের ওই এক "মাফ্ কর" কথায় সমস্তই ভুলিয়া গেলাম; যোড়হস্তে তাঁর পা দু'খানি ধরিয়া কহিলাম, "সেকি মহাশয়! আমাকে একি বলেন? আমি দীন দরিদ্র—পথের ভিখারী—আপনি কৃপা ক'রে আমাকে গৃহে এনেছেন, আমি আপনাকে মাফ কর্ব্ব? কিন্তু আমার এই একটি বিনীত নিবেদন, আমাকে ছেড়ে দিন; আমি পথের লোক, পথে পথেই ফিরি, গাছের ছায়াই আমার আশ্রয়, আমার এ অট্টালিকা—এ মনোহর রাজভোগ সইবে কেন? আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ দেখিয়েছেন, আমিও যৎপরোনাস্তি আদর পেয়েছি, আমি পথের ভিখারী, পথে পথেই ভ্রমণ করিগে।"

কর্ত্তা মহাশয়। "নাও, জয়কালী থাম্‌ল ত ব্রজেন্দ্র উঠ্‌ল, কা'কে রাখি বল দেখি? ব্রজ, চুপ কর বাবা, চ'খের জল মোছ, বুড়ো বাপের উপর কি রাগ কত্তে আছে বাবা? নির্ম্মল বিদেয় নিয়েছে, তুমি তার স্থান অধিকার করেছ। কার দোষ বলি বল? আমারি কপালের দোষ—আমারি * * পরিণাম! আর নির্ম্মলের কথা তুলোনা; তুমিও কষ্ট পাবে—আর আমাকেও মিছামিছি কষ্ট দেবে। আর একটি কথা বলি শোন, জয়কালি! তুমিও শুনে যাও;—এই ব্রজেন্দ্র বাহিরের ছেলের মত সে ছোঁড়ার সঙ্গে বাহিরেই থাক্‌ত। আজ থেকে ও এই অন্তঃপুরেই স্থান পাবে। শুনছ ব্রজেন্দ্র, বুঝলে আমার কথা? এই মহলের পশ্চিম কোণের ঘরে তুমি থাক্‌বে। আর কেন বাইরে পড়ে থাক? কোন কষ্ট হবে না, ঘরের ছেলের মত থাক্‌বে! ও দিকটাও একরূপ অন্ধকার হয়েছিল, তুমি আলো করে থাক্‌বে। আমার একটা মোকদ্দমার গোল চলছে, গোলটা মিটে গেলেই তোমাকে আমার কাছারীতে বার কর্‌ব"

প্রথমতঃ আমি কিছুতেই স্বীকার পাইলাম না, বিশেষতঃ নির্ম্মলের সেই 'সাবধান' শেষোক্তি আমাকে আরও সাবধান করিয়া তুলিল। কিন্তু কর্ত্তা মহাশয়ের অকাট্য প্রস্তাব আমি কোন মতেই অন্যথা করিতে পারিলাম না; অগত্যা অতি দুঃখে তাঁহার এই বাক্যে অনুমোদন করিতে হইল। অতঃপর এ সমস্ত কথাই হরদেবপুরে নির্ম্মলকুমারের নিকট পত্রযোগে প্রেরণ করিলাম।

কোথায় আজি কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, না আজ আমার আরও সুখের মাত্রা বাড়িল। ধন্য সংসার-চক্র!!

ত্রয়োদশ চক্র।

আবার ধরা পড়িলাম।

প্রকৃতই আমার আরও সুখ বাড়িল, রাজার হালে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল; কত সুখ, কত স্বচ্ছন্দতা, পাঠকগণের নিকট তাহা ক্ষুদ্র লেখনীর দ্বারা কি জানাইব? স্নান আহার বসন ভূষণ শয্যা প্রভৃতি সকলি উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ সেই দিন অবধি কর্ত্তাগৃহিণী আমাকে বড়ই সুনয়নে দেখিতেছেন। কোন বিষয়েরই অভাব নাই। বেশ আছি, নির্ম্মল দাদার শোকস্মৃতি ভিন্ন আর কোন বিষয়েরই আমার কষ্ট নাই। তবে নীরবে একাকী একঘেয়ে রকম সুখের মাঝে মাঝে যা' জ্বালাতন! দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর যখন শয্যা-গৃহে অর্দ্ধশায়িতভাবে থাকি, তখন কত কথা, কত কাহিনী—আমার জীবনের কত গুপ্ত রহস্যই মনে পড়ে। আহা! আমার সে সুখের বাল্যকাল কোথায় গেল! আমার বাল্যকালের মা'কে মনে

পড়ে, মা'র সেই সস্নেহ কোমল দৃষ্টি মনে পড়ে, আর অজস্র চক্ষের ধারে ভাসিতে থাকি! কেন এমন হইল? কি পাপে আমায় সংসারভ্রষ্ট হইয়া পরের বাড়ীতে কাল কাটাইতে হইতেছে? আমি অনাথ আতুর বালকমাত্র, আমার প্রাণের এই মহা ধন্দ মিটাইয়া দাও! মাগো! তুমি কি যথার্থই আমার গর্ভধারিণী মা নও? আঠার বৎসর তোমাকে যে মা বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছি। মা! এই পতিত সন্তানকে যে আঠার বৎসর পুত্ররূপে লালন পালন করিয়া আসিতেছিলে, তবে এমন কেন হইল মা? আমি জানি না, কিছুই জানি না, আমি নিতান্তই নির্দ্দোষ; তবে কেন মা আমাকে তাড়াইয়া দিলে? আমার কি পাপ—কি দোষ ছিল? তাহা না বলিয়া এইরূপ বিবাহের ছলনায় কোথায় বিসর্জ্জন দিলে মা? যদিই বা কোন অজ্ঞাত কারণে আমি কুপুত্র হই, তবে তুমি মা হইয়া এ সংসারে কুমাতা নাম কেন কিনিলে মা? এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আমার মা নও; নচেৎ মা হইয়া মায়ের প্রাণ ধরিয়া কে এমন একমাত্র নিরপরাধ শিশুকে অতল জলে বিসর্জ্জন দেয়? আমার সম্বন্ধে হয়ত এমন একটা কোন নিগূঢ় রহস্য আছে, যাহাতে আমি মাতা পিতা কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত হইয়াছি! উঃ সেই বা কি শ্বশুর বাড়ী! সেই শ্বশুর—সেই শাশুড়ী! নরককুণ্ড সদৃশ ১০ নং গারদ! অযাচিত অজানিত ভাবে গুপ্ত উদ্ধার! আ মরি, মরি! দেবকণ্ঠ দেববালক সদৃশ সেই বালকের কি অপূর্ব্ব মহিমা! কি মহত্ব, কি বুদ্ধিবলে আমাকে প্রতি পদে রক্ষা করিতেছে! আহা ইচ্ছা করে, তাহার আর একবার সেই মোহন কণ্ঠধ্বনি শুনি!

এইরূপ কত চিন্তাই আমার মনে আসিতে লাগিল। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রা, শেষ ঘুমাইয়া পড়িলাম। একি স্বপ্ন? না কুহক? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। একটি অশ্রুত শ্রুতিমধুর দূর গীতধ্বনি আমি যেন শুনিতে পাইলাম। কি প্রাণ ভোলান—কি মনোহর সঙ্গীত! পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থে গীতটি লিপিবদ্ধ করিলাম;—

গীত। *

সুদিনের দিনে কত কথা বোলে
আমায় রাখিলে ভুলায়ে,
(দিবে) নীলাঞ্জন-মোহন মালাটি
আমার গলাতে দুলায়ে।
দুঁহু শশী মিলে এক প্রাণে রব
উজলি ত্রিদিব আলয়ে,
মিলন মধুর—গীত-লহরী
মিশাইলে কাল প্রলয়ে?
(হায়) তত অনুরাগে বিষ মেখে, দিলে
বিরহ-অনলে জ্বালিয়ে?
(ছি ছি) সে পণ কেমন? কুদিনে পড়িয়ে
(দিলে) কোথায় আমারে বিলায়ে?

দূরবংশীধ্বনির ন্যায় গীতটি যেন আমার ঘুমন্তকর্ণে সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলাম। জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থা, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যেন বাসন্তীপবনে লহরীলীলায় নাচিতে নাচিতে, সুরতরঙ্গ আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। গীতধ্বনি যেন দূর হইতে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আরও স্পষ্টতর হইল। এখন যেন কে কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া গাহিতেছে। অতি সুমিষ্ট—অতি অপূর্ব্ব তান! স্বপ্নে যেন তাহাকে ধরিতে যাইলাম, কিন্তু কিছুই স্পর্শ করিতে পারিলাম না;—সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলাম, স্বপ্নের ঘোর যেন এখনও কাটে নাই; যেন এখনও সেই সঙ্গীতধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! এমন ত কখনও হয় নাই; একি অদ্ভুত প্রত্যক্ষবৎ স্বপ্ন! সঙ্গীতের প্রতি কথা—প্রতি তান এই সজ্ঞানকর্ণে স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিয়াছি! স্বপ্ন হইলেও এ কিন্তু আমার

---

* টোড়ী—একতালা।

মোহ নয় ভ্রম নয়। এ নিশ্চয়ই সেই দেবরূপী আমার সুহৃদ্ বালকের গীতি-উচ্ছ্বাস! কিন্তু এ স্থানে তাহার আগমন কিরূপে সম্ভবে? সুদৃঢ় রক্ষিগণ পরিবৃত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কঠিন অন্তঃপুরে সে বালক কি প্রকারে আসিল? অদ্যাবধি কখনও এ বাটীতে গান শুনি নাই, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে বরং সম্পূর্ণ বিরক্ত। তবে এই গীতধ্বনিই বা শুনিলাম কি প্রকারে? বস্তুতঃ তখন আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

এইরূপ নানা চিন্তায় চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, হরদয়াল আসিয়া কহিল, "ব্রজবাবু! গিন্নীমা'র ছোট ভগ্নী আমাদের বাটীতে আজ হঠাৎ এসে পড়েছেন। বাড়ীতে আজ একটু ছোট খাট সমারোহ। কাছারী বাড়ীতে খবর গেছে, কর্ত্তা মহাশয়ও এলেন বোলে; আপনাকে কি বলবার জন্য গিন্নী মা নিজে আসছেন।" হরদয়াল প্রস্থান করিল।

আমি একটু সতর্ক হইয়া বসিলাম, গৃহিণী ঠাকুরাণীও তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। এখন তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে কথোপকথন করেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম।

গৃহিণী কহিলেন, "ব্রজ! আমার ছোট ভগ্নী এসেছেন, কতকগুলি আমার কাজ কর। হরদয়ালকে সঙ্গে ক'রে তুমি নিজেই একবার বাজারে যাও। এই ফর্দ্দ খানা নাও, ফর্দ্দ অনুযায়িক জিনিসপত্র নিজেই কিনে নিয়ে এস। এত লোকজন থাক্‌তে, তোমাকে বল্লেম কেন? তার কারণ আর কিছুই নাই, কেবল আমার সখ। তুমি বাজার কর্‌বে, আমি রাঁধ্‌ব, আমার ছোট বোন যোগাড় যন্ত্র কর্‌বে, কর্ত্তাকে আমরা নিজে রেঁধে বেড়ে খাওয়াব। যাও, হরদয়ালকে সঙ্গে নাও, তার কাছে সব টাকা কড়ি আছে। তুমি কিন্তু একটু দেখে শুনে বাজার ক'রো। যে যে দোকান থেকে জিনিসপত্র কিন্‌তে হবে, হরদয়াল তা সমস্তই দেখিয়ে দেবে, সেই সব কিন্‌বে টিন্‌বে—তুমি সঙ্গে থাক্‌বে মাত্র।" গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। আমিও সাজসজ্জা করিয়া হরদয়ালকে সঙ্গে লইয়া বাজারে চলিলাম।

পথিমধ্যে যাইতে যাইতে একটা শিমুল বৃক্ষের অন্তরালে শঙ্করের মত একটা লোককে যেন দেখিলাম। সে আমাকে দেখিতে পাইল, কিনা

জানি না ; কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল,—যেন কি একটা উপলক্ষে কাহার অপেক্ষায় সে দাঁড়াইয়া আছে। হরদয়াল আগে আগে গমন করিতেছে, আমিও নীরবে শঙ্করের গতিবিধি দেখিবার জন্য, কিছুক্ষণ একটা বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইলাম; এত ত্বরিতপদে কাজটি করিলাম, শঙ্কর কিছুই জানিতে পারিল না। শঙ্কর তাহার পুরাতন মনিবের বাটীর দিকে অনিমিষ চাহিয়া আছে, তাহার চক্ষে আর পলক পড়ে না, সে সাগ্রহে সৌৎসুকে 'ঐকান্তিক মনে কাহাকে যেন দেখিতেছে। আমার সন্দেহ হইল। নির্ম্মলকুমারের গৃহত্যাগ হইতে এই পাষণ্ডকে একদিনও দেখি নাই। যদিও ইহাদের গুপ্তপরামর্শে কতকটা জানি যে, গৃহিণী ঠাকুরাণীর সহিত মাঝে মাঝে এ সাক্ষাৎ করে, যদিও এতাবৎকাল ধরিতে পারি নাই ; তত্রাচ আজ হঠাৎ এই লোকটাকে কেন দেখিলাম ? কেনই বা স্থিরচক্ষে বাড়ির দিকে চাহিয়া আছে ? যাহা হউক, দেখি, আর একটা গুপ্তরহস্যের আবিষ্কার করিতে পারি কি না !

আমিও একদৃষ্টে তাহার সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া, বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। ও হরি ! একি দেখিলাম ? গৃহিণী তেতলার স্নানাগারের একটা উন্মুক্ত জানালার নিকট দাঁড়াইয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী হস্ত দ্বারা কি একটা বিরাট ইঙ্গিত করিলেন ; শঙ্করও অমনি হর্ষবিকাসিতমুখে—আহ্লাদে গদগদ হইয়া পশ্চিম দিকে বাজার অভিমুখে প্রস্থান করিল। আমি অবাক ! একি কাণ্ড ! এ আবার কি চক্র ! গৃহিণীর ইঙ্গিতের অর্থ কি ? শঙ্করও কেন বাজারের দিকে দৌড় দিল ? গৃহিণী আমাকে স্বেচ্ছায় বাজারে পাঠাইয়াছেন, আমিও তাঁহার প্ররোচনায় বাজারে যাইতেছি ; তবে কি আমারি সম্বন্ধে এ কোনরূপ চাতুরী চক্রান্ত ? বড়ই ধাঁধা ঠেকিল ; একটু প্রাণে ভয়ও জন্মিল। কুলকলঙ্কিনীর অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই ! না জানি আবার আমাকে কি বিপদে ফেলিবে ! হায়, হায় ! কোথায় যাই ? ওরে ! আমার চারিদিকেই বিপদ—চারিদিকেই জঞ্জাল !

বড়ই ব্যথিত প্রাণে বাজারের দিকে চলিলাম। বাজারের প্রবেশ-পথে দেখি, হরদয়াল আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই



সে কহিল, "ব্রজবাবু! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি চারিদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি,—ভাব্‌লেম হারিয়ে গেলেন বুঝি?"

আমার মনটা তখন এতই উতলা, ভালরূপে এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। একটা ওজর করিয়া তাহাকে কহিলাম, "হরদয়াল! হঠাৎ কেমন আমার মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল, তার দরুণ আমাকে একটা গাছ তলায় ব'সে পড়্‌তে হয়েছিল, এখনও আমি সুস্থ হ'তে পার্‌ছিনা! এই বট গাছের তলাটি বেশ ঠাণ্ডা, এই খানে একটু বিশ্রাম করি। ওই কোলাহলের মধ্যে গেলে হয় ত আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ব।"

হরদয়াল কহিল, "তা বাবু, যা ভাল বোঝেন করুন; গিন্নীমা আমার সঙ্গে থাকৃতে ব'লেছিলেন, তা আপনি যদি না থাকেন, অসুখ কচ্ছে বলেন, তা আমি আর কি কত্তে পারি বলুন? তিনি মনিব, আপনাকে অত ক'রে বলেছেন; তাঁর জন্যে তবে একটা কাজ করুন, ঐ বেণের দোকান থেকে গরম-মসলা টা কিনে রাখুন, আমি ওকে পয়সা দিয়ে যাচ্ছি।"

হরদয়াল আর দাঁড়াইল না। আমি সেই বটবৃক্ষতলে চিন্তাকুলচিত্তে বসিয়া আছি, নিকটবর্ত্তী একটা বেণের দোকান হইতে একটা কোলাহল উঠিল, সেই বেণে দোকানদার এক জন খরিদ্দারের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছে। তাহার স্বর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! মহা আতঙ্কে প্রাণ কম্পিত হইতে লাগিল! আ সর্ব্বনাশ! এ স্বর যে আমি অনেক বার শুনিয়াছি! এ স্বর যে সেই দুরাচার প্রবঞ্চক আমার সাক্ষাৎ শমন শ্বশুরের! কি ভয়ঙ্কর! কি ঐন্দ্রজালিক চক্র! কি অদ্ভুত রূপান্তর! এ আবার এ দেশে কেমন করিয়া আসিল? এই পাপিষ্ঠকে সেখানে এক ভাবে দেখিয়াছিলাম, আজ হেথায় দোকানদার রূপে দেখিতেছি। এ ব্যক্তি নিশ্চয় আমার সন্ধানে আসিয়াছে। ঐ দোকান যথার্থই উহার ছলনার দোকান! না জানি আবার কি ছল পাতিয়া কি সর্ব্বনাশই করিবে! তবে আজ দুপুরের স্বপ্ন কখনই স্বপ্নবৎ মিথ্যা নয়! সে বালক তবে স্বপ্নের বালক নয়,—ইহারি সহিত কোথাও লুক্কায়িত ভাবে আছে! পলায়ন করি, প্রাণ বাঁচাই; নচেৎ উহার চক্ষে একবার পড়িলে কোন মতেই আমার নিস্তার নাই! আর মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের অট্টালিকায় প্রবেশ করিব না;—তিনি যাহা মনে করেন করুন, প্রাণ রক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—যেথায় দুই চক্ষু যাইবে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করি!

যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, হা ভাগ্য! কালান্তক ব্যাঘ্র দৃষ্টিকেও পার আছে, ক্রূর কুপিত বিষধর সর্পের দৃষ্টিও বিফল হয়; কিন্তু খলমনা নররাক্ষস মনুষ্য-প্রকৃতির তীব্র দৃষ্টি অব্যর্থ, অমোঘ, কখনই বিফল হয় না; লক্ষ্যস্থানে তার দৃষ্টি-বজ্র পড়িবেই পড়িবে! যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি সেই দুরন্তচক্রের জ্বলন্তদৃষ্টি বিদ্যুৎগতিতে আমার উপরে পড়িল! আমার যত দূর সামর্থ, তীরবেগে আবার উত্তরমুখে ছুটিলাম। সাঁই সাঁই শব্দে আমার কাণের কাছে বাতাস ছুটিতেছে! এক বার পশ্চাৎ লক্ষ্য করিলাম, দেখি আট দশ জন লোক নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, মহা ত্রাসে বেগমাত্রা আরো বাড়াইয়া দিলাম, কিন্তু সব বিফল হইল! আমার অগ্রে পশ্চাতে কাল, আমার নিষ্কৃতি কোথায়? হঠাৎ একজন বলিষ্ঠ লোক পথের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের ভিতর হইতে প্রকাশিত হইয়া একেবারে আমার সম্মুখে পর্ব্বতের মত দাঁড়াইল! তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই আমি বজ্রাহতরূপে নিস্পন্দ হইয়া গেলাম! সে সজোরে আসিয়া আমার হাত ধরিল! একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় সরোষে কহিল, "কেমন রে পাজি! এই বার তোর কোন্ বাবা এসে রক্ষে করে? তোর এত বড় যোগ্যতা, আমাদের চ'খে ধূলো দিতে যাস্? কাল্‌কের ছেলে তুই, তোর এত বুদ্ধি! আমাদের দলের দুটো লোককে খুন করে, গুলুক সন্ধান জেনে পালিয়ে এসে, তুই দেবনারাণ মুখুজ্জের বাড়ীতে রাজার হালে লুকিয়ে আছিস? মনে করিছিস বুঝি এ যাত্রা বেঁচে গেলি, আমরা আর তোর সন্ধান পাব না! হারে মুখ্যু, আমাদের চোক এড়িয়ে তুই যমের বাড়ী গিয়েও নিশ্চিন্ত থাক্‌বি মনে ভেবেছিস্? এই বার তোর কি হয়?"

সে নিমেষ মধ্যে আমার হস্ত পদ চক্ষু একেবারে বাঁধিয়া ফেলিল। আর কথা কহিতে দিল না, সজোরে ধাক্কা মারিতে মারিতে যেন এক খানা গাড়ির ভিতর প্রবেশ করাইল, সবেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিল, হায় হায়! আমার সব ফুরাইয়া গেল! আমি আবার ধরা পড়িলাম!

চতুর্দ্দশ চক্র।

সংকার? না পুনর্জ্জীবন?

"আর মেরোনা—আর মেরোনা—আর সইতে পারিনা, বরং আমায় একেবারে মেরে ফেল!"

"কেমন! আর পালাবার চেষ্টা কর্ব্বি? আর গালাগাল দিয়ে কথা ক'বি?

"না, আর পালাবনা, আর গালাগালি দেবনা! যা কত্তে হ'বে বল, এখনি কচ্ছি; আর মার খেতে পারিনা!"

"তবে যা বলি লেখ্! 'আমি দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নির্ম্মল-কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত যোগ সাজস করিয়া এই চক্র সাজাইয়াছি, আর তাঁহারি কথা অনুসারে দেবনারায়ণ বাবুকে বিষ খাওয়াছি'—"

"কখনই না, কখনই না, এ কথা আমি কখনই লিখ্‌তে পার্‌ব না। কি সর্ব্বনেশে কথা! আমি নির্ম্মলকুমারের সঙ্গে যোগ সাজস ক'রে এই চক্র সাজিয়েছি, আমি আমার পিতার স্বরূপ দেবনারায়ণবাবুকে বিষ দিয়েছি? আমাকে এখনি মেরে ফেল, এক কোপে কেটে ফেল, আমি এমন কথা কখনই লিখ্‌তে পার্‌ব না!"

"পার্‌বিনি? তবে এই নে।"

ধাঁ করিয়া এক প্রচণ্ড চড় আমার গালে মারিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তাল সামলাইতে পারিলাম না, পড়িয়া গেলাম। নির্দ্দয় পাষণ্ড একগাছা বেত বাহির করিয়া বলিল, "তোকে একেবারে মেরে ফেল্লে ত সব গোলই

মিটে গেল, তোকে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মার্ ব! এই সরু লক্‌লকে বেত দেখ্‌ছিস! হয় লেখ্, না হয় পিঠের চাম্‌ড়া তুলি বল্।"

আমার প্রাণ যায়! কোথা দরিদ্রবন্ধু দয়াময়! দরিদ্রের প্রাণ যায়! আর কত যন্ত্রণা সহ্য করি? দয়া করিয়া আমাকে বাঁচাও, একবার কৃপা-কটাক্ষে চাও!

"আবার কাঁদ্‌তে বস্‌লি? আমরা মায়া-কান্নায় ভুলি না তা জানিস্, যদি মুক্তি পেতে চাস্, তবে শীগ্‌গির এই কাগজ খানায় যা বল্লেম্ তা লিখে ফেল্!"

সহসা কেমন একটা বল পাইলাম, নিমেষের মধ্যে যেন মরিয়া হইয়া উঠিলাম। জানি, আমার মৃত্যু নিশ্চয়, এখনি হউক, অথবা একটু পরেই হউক, আমাকে মরিতেই হইবে; তবে মৃত্যুকালে কেন আর এমন ঘৃণিত-পাপে লিপ্ত হই? ভগবানকে মনে মনে স্মরণ করিয়া প্রাণের দায়ে অন্তিম-সাহসের সহিত তাহার গ্রীবাদেশে একটি বজ্র মুষ্টি প্রহার করিলাম,—আচম্বিতে বজ্র মুষ্টি খাইয়াই দুর্বৃত্ত চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। আমিও উপর্য্যুপরি কিল লাথি চড় বর্ষণ করিতে লাগিলাম। সে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে মুষ্টি ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করে, প্রতিবারে কিন্তু আমার মুষ্টিতে তাহা বিফল হইয়া পড়ে। তখন আমার প্রাণে মনে শরীরে অসীম বল; শেষে তাহার মুখ হইতে পা পর্য্যন্ত এককালীন বাঁধিয়া ফেলিলাম। সে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, আমিও দ্রুতবেগে দরজার নিকট আসিলাম,—হায় হায়, দরজা কিন্তু বহির্দ্দিক হইতে বন্ধ। আমার প্রাণও যেমন বুকের ভিতর ধক্ ধক্ করিতেছে, ছুটিয়া পলাইবার পথ খুঁজিতেছে, আমিও তদ্রূপ ঘরের ভিতর ছুটাছুটি করিতেছি, পলায়নের পথ খুঁজিতেছি!

নিরুপায় নিঃসহায় আমি, কি উপায় করিয়া—কি উপায়ে পলায়নের পথ পাই? হরি! আমি ভীষণ বিপথে পড়িয়াছি, আমায় পথ দেখাও! সর্পগহ্বরে আসিয়া সর্পকে পদাহত করিয়াছি, সেই সর্পও আমার সম্মুখে, আমি এখনি দষ্ট হইব, আমায় রক্ষা কর, আমাকে পলায়নের সন্ধান বলিয়া দাও।

বাহির হইতে অতি মৃদু শব্দে শিকলটি যেন খুলিল, যেন ধীরে ধীরে বাহির হইতে কে ধাক্কা মারিতে লাগিল। আমি সোৎকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম, "কেও কেও কে তুমি ? আমায় রক্ষা কর !"

"চুপ আস্তে !" মৃদু শব্দে এই কথটি বাহির হইতে আসিল।

সহসা নিঃশব্দে দরজাটি খুলিয়া গেল, একটি কালকম্বলাবৃত লোক অন্ধকার রূপে যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

"চুপি চুপি নিঃসাড়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে এস !" আমি নির্ব্বাক যন্ত্র-পুতুলের মত চুপি চুপি নিম্নতলের একটা অন্ধকারময় গৃহে উপস্থিত হইলাম। সেই লোকটি কহিল, "যথার্থই আজ আপনার বড় বিপদ, কোন রকমেই আপনার পালাবার পথ কর্‌তে পাচ্ছিনা ; এখন আপনার মান প্রাণ আপনারি হাতে, এই কাল কম্বলখানা আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে এইখানে প'ড়ে থাকুন,—এখন প্রায় সন্ধ্যা হ'ল ;—সমস্ত রাত্রি চুপি চুপি এই ঘরে কাটাতে হ'বে। তারপর কাল সকালে কোন না কোন উপায় কত্তে পারা যাবে। মনে বল বাঁধুন, সাহস আনুন, এই কম্বল নিন্,—ভয় পাবেন না।"

কাল কম্বলখানা সেই গৃহ মধ্যে ফেলিয়া দিয়াই লোকটা বহির্দ্দরজায় চাবি দিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। আমি কম্বল খানি সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

পাঠক মহাশয় ! এই চতুর্দ্দশ চক্রের গতি বোধ হয় এখনও বুঝিতে পারেন নাই ;—অতি জটিল, আমিও এখন ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছি না। তবে এই মাত্র স্মরণে আইসে, আজি দ্বিপ্রহরে গৃহিণী ঠাকুরাণীর অনুরোধে হরদয়ালের সহিত বাজারে আসিয়াছিলাম, পথিমধ্যে শঙ্করের প্রতি গৃহিণীর বিরাট ইঙ্গিত, বাজারের প্রান্তভাগে দোকানদার রূপে আমার শ্বশুররূপী সেই দুর্ব্বৃত্ত নরাধমের আমার প্রতি তীব্রদৃষ্টি, অতঃপর তাহারি জালে ক্ষুদ্র মৎসের মত ধৃত হইয়া এই একটা কাল পুরীতে আমি আনীত হইয়াছি। যে লোকটাকে ওই গৃহে হস্ত মুখ পদ বদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, ও তাহার সহচর ; কি সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর কথা লেখাই-বার জন্যই আমাকে পীড়ন করিয়াছে ! কেবল আমি আমার গায়ের জোরে

আজ সেই লেখন হইতে নিস্তার পাইয়াছি। তারপর এই সদাশয় মহাত্মা কে? কে ইনি আমার সুহৃদ? আমার এই দগ্ধ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এতদূর ব্যগ্র হইয়াছেন? ইঁহার এই গম্ভীর স্বর যেন আর কোথাও শুনিয়াছি, কিন্তু কোন্ চক্রে—কোথায়? প্রথমটা কিছুই মনে পড়িল না। অনেক চিন্তার পর মনে হইল, ১০ নম্বর গারদ থানা হইতে যখন সেই অজ্ঞাত-করুণলিপির উপদেশ মত পলায়ন করি, তখন এই ব্যক্তির নিকট হইতে এক সুট ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদ পরাইয়াছিলাম, ইনিই আমায় উত্তরমুখে পলায়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আহা ইনিই যথার্থই মহাত্মা—যথার্থই পরোপকারী!

আবার একি ভয়ঙ্কর কথা শুনিতেছি! দেবনারায়ণবাবুকে আমি বিষ খাওয়া মারিয়াছি! এই বা কি কথা? কেনই বা ঐ দুরাত্মা এই কথা লিখাইবার জন্য এত পীড়ন করিতেছিল? তবে কি সত্য সত্যই দেবনারায়ণবাবু ইহ-সংসারে আর নাই! হায় হায়, দেবনারায়ণবাবুর অবশেষে অপঘাতে মৃত্যু হইল? অসম্ভব নহে,—এ সংসারে সকলি সম্ভব। দেবনারায়ণবাবুর অপঘাত-মৃত্যুর অসম্ভাবনা নাই! অসতী-পত্নীকের নির্ম্মলচরিত্র পুত্রও নিরুদ্দিষ্ট হয়, বৃদ্ধ স্ত্রৈণব্যক্তির স্ত্রী কর্ত্তৃক বিষ ভক্ষণেও মৃত্যু হয়, এই পৈশাচিক-রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও সম্ভব! নচেৎ নির্ম্মলকুমার গৃহ-ত্যাগী হইতেন না, পরমসদাশয় আমার প্রতিপালক দেবনারায়ণবাবুও অপঘাতে মরিতেন না, আমিও এইরূপ পথের ভিখারী হইয়া প্রাণের ভয়ে ভীত হইতাম না! তাই বলি এই সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই!

হায় হায়, না জানি আবার কি একটা ভয়ানক বিপদ-মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে! যদি যথার্থই দেবনারায়ণবাবু হত হয়েন, তাহা হইলে না জানি আরও কি সর্ব্বনেশে ঘটনা উপস্থিত হইবে! আমি যেন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি;—সেই যে দ্বিপ্রহরে গৃহিণী বলিয়াছিলেন, 'তুমি বাজার করিবে, আমি রাঁধিব, আমার ভগ্নী যোগাড় করিয়া দিবে।' ইহারি মধ্যে কিছু রহস্য নিশ্চয় ছিল, এমন করিয়া গৃহিণী সাজাইয়াছেন যে, ব্রজেন্দ্র কোন খাদ্য দ্রব্যে বিষ মাখাইয়া পলায়ন করিয়াছে, পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া পীড়নের

দায়ে এই সম্মতি পত্র পাঠাইয়াছে। হা অদৃষ্ট! আর কত কষ্ট যে তোমাতে লিখিত, জানি না।

ক্রমে যেন রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল, ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিতে লাগিল, সেই অন্ধকারময় গৃহে ধূলির উপর শুইয়া পড়িলাম। আ মরি মরি! আবার সেই সুমিষ্ট গীতধ্বনি! স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

গীত। *

এ ধরা তোমাতে দে'ছে আপনা-ধরা,
এ ধরায় তুমি কেন আপনা-হারা?
ধরার ধারণা যত,
ধরিতেছ অবিরত,
ধরার ধরণে কেন পাগল-পারা?
এ ধরায় তুমি কেন আপনা-হারা?
ধরা ভোল, ধরা দাও, ধরা পানে ফিরে চাও,
ধারাগুলি মুছে ফেলে প্রেম দিয়ে ধরা নাও;—
ধরার ধরম ভুলি
চেয়ে আছি মুখ তুলি,
এখনো কি বুঝিলে না ধরণী-ধারা?
এ ধরায় তুমি কেন আপনা-হারা?

সেই আবার আমার প্রাণদায়িনী মনোহারিণী সুমধুর গীত-ধ্বনি! আহা, এ সেই আমার পরম উপকারী বালকবন্ধুর করুণ-ঝঙ্কার। সুরতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘোর অন্ধকারময় গৃহ! কিছুই দেখিতে পাই না, আমি যেন অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়া আছি। সন্দেহে সন্দেহে ধীরে ধীরে আবার উঠিলাম, অনুমান করিয়া সেই দরজার নিকট আসিলাম।

* কানেড়া——যৎ।

স্থির নিষ্পন্দ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। বহির্দ্দিক নিস্তব্ধ—নির্জ্জন! কেবল নৈশ-সমীরণের ধীর অস্ফুট সন্ সন্ শব্দ, আর ঝিল্লীকুলের ঝিঁঝিট রাগিণীর অস্ফুট তান। আমি কিন্তু দরজার নিকট হইতে নড়িলাম না; মনে একটু ক্ষীণ আশা এই যে, যদি কেহ চুপি চুপি আসিয়া দরজা খোলে, হয়ত আমার পলায়নের পক্ষে কতকটা সুবিধা হইতে পারে; আমি যেন নিরুদ্ধশ্বাসে তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম। বহুক্ষণ এইরূপ অবস্থায় আছি, উপরের ঘরে দুম্ দুম্ শব্দে যেন পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম, ক্রমশঃই যেন সিঁড়ি বহিয়া শব্দস্রোতঃ নামিয়া আসিতেছে। আমি বিশ্রান্ত প্রাণে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, ক্রমে যেন ফিস্ ফিস্ শব্দ আসিতে লাগিল, যেন কাহারা চুপি চুপি কথা কহিতেছে! কিসের পরামর্শ শুনিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু একটি বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। সেই যাহাকে আমি উপরের ঘরে বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার জন্য একটু ভাবিত হইলাম; তাহার পরিণাম কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! তবে ইহারা কাহারা? ইহারা কিসের পরামর্শ করে?

"হাঁ, এই ঘরই ভাল, এই ঘরেই তবে লাসটাকে আজ রাত্রের মতন লুকিয়ে রাখ।" ঈষদুচ্চে এই কথাটি কহিয়াই যেন তাহারা চলিয়া গেল। পরক্ষণেই আবার কতকগুলি ধীর পদশব্দ; আস্তে আস্তে দরজাটি খুলিয়া গেল, আমি তৎক্ষণাৎ দরজার কোণে গিয়া দম বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেই লোকগুলা যেন কি একটা ধরাধরি করিয়া সেই ঘরে ফেলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া অতি নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

হায়, আমি ত পলাইতে পারিলাম না। আমি নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া সেই কোণে দাঁড়াইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলাম! কি যে ভয়ঙ্কর ত্রাস আমার মনের ভিতর, কি যে ভয়ঙ্কর যাতনা আমার, তাহা আমিই জানি, আর সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বরই জানেন। ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া আবার সেই দরজার নিকট গেলাম, আস্তে আস্তে কপাট টানিলাম, কিন্তু বহির্দ্দিকে শিকলী সংবদ্ধ। অনেকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, আশা—আবার যদি কেহ কোন কারণে দরজা খোলে, যদি কোন উপায়ে

পলায়ন করিতে পারি; হায় হায়, কেহই আসিল না! আমি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, ভয়ে ভয়ে তথা হইতে গৃহের মধ্যস্থলে সরিয়া আসিতে চেষ্টা করিলাম। উঃ মাগো! শীতল—অতি শীতল, বরফের ন্যায় শীতল, যেন শবের একটা অঙ্গ মাড়াইয়া ফেলিলাম। দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলাম! আর যে এ ভয়ানক যমযাতনা সহ্য করিতে পারি না রে! আমাকে যদি কেহ একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারে, সে আমার পরম বন্ধু, মৃত্যুকালে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিতে পারি। কে আছ সুহৃদ্! এস, হাস্যমুখে তোমাকে আমার এ দুর্ব্বহ প্রাণ উৎসর্গ করি, আমি আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারি না! এঁ্যা—এঁ্যা এই শবদেহ কার? কেরে হতভাগ্য! তুমি বিঘোরে প্রাণ হারাইয়া এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে শবরূপে পড়িয়া আছ? আমাকেও সঙ্গী করিবে বলিয়া কি হেথায় তোমার আগমন? তাই কর, শীঘ্র শীঘ্র আমাকে সঙ্গী কর! তুমি আমার সুহৃদ্ হইতেও সুহৃদ্! তোমার পার্শ্বে তোমার মত করিয়া আমাকে শয়ন করাও। কৈ! কৈ! আমি তোমাকে এত অনুরোধ করিলাম, তুমি ত একবারও আমাকে আশ্বাস দিলে না? তুমিও বাদী? তুমিও বাদী? জীবজন্তু-জীব হইতে শব পর্য্যন্ত আমার এ সংসারে সকলেই বাদী? কে আমাকে রক্ষা করে! আমি যে পাগল হইলাম, পাগলের কথা কেহ শোনে না! উঃ, কোথায় যাই, কোথায় রক্ষা পাই? আমাকে কে রক্ষা করে? কে আছ হেথায়! বিপন্নবালককে উদ্ধার কর! কোথা—কোথা দেবশিশু! প্রতি পদে আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ, তোমারি অভয় পরামর্শে, তোমারি অভয়-যুক্তিতে, দীন হীন ব্রজেন্দ্র প্রতি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেছে, আজ এস, একবার এস ভাই! আজ তাহার বড় বিপদ, সে শবদেহের সহিত একাসনে আর বসিতে পারে না। ওহোহোঃ প্রতি নিমেষেই মনে হইতেছে, এই মৃতদেহটা করালমুখ ব্যাদান করিয়া যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, এই যেন শীতল হস্ত বিস্তার করিয়া আমাকে ধরিতে আসিতেছে, এই যেন অট্টাট্ট হাসে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। এই যেন কঙ্কাল-মূর্ত্তিতে শবদেহটা ভগ্নবেশে তাণ্ডব-নর্ত্তনে আমাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে!

আমাকে ধরে—শবদেহটা অস্থিময়হস্তে এই আমাকে জড়াইয়া ধরে! আমি কোথায যাই? অন্ধকারে দিগভ্রষ্ট! লক্ষ্য হয় না—দৃষ্টি হয় না! অন্ধকার! নিবিড় অন্ধকার!! দুস্তরঅন্ধতমঅন্ধকারসাগরে কোথায় দেব-বালকরূপী কাণ্ডারি! আমাকে পার কর, অভয়তরি দাও! এই প্রেতমূর্ত্তির নিকট হইতে আমাকে অপসৃত কর!

খুট্ করিয়া দরজাটি খুলিয়া গেল। নীরবে একটি কোমল কণ্ঠধ্বনি শুনিলাম, যেন সেই দারুণ যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম!

"ভয় নাই—ভয় নাই ভাই! আমি এসেছি!"

আমি উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "এসেছ—এসেছ বন্ধু? দেখ, ব্রজেন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখ, কোথায় তুমি? কাছে এস, আমার মস্তকে, আমার কম্পিত বক্ষে, হাত বুলিয়ে দাও! অন্ধকারে তোমাকে দেখ্‌তে পাইনা ভাই!"

"আর পাগলাম ক'রে চেঁচায় না! চুপ কর, স্থির হও, ভয় কি? তুমি নির্দ্দোষ, তোমার আবার ভয় কোথায়?"

"আমি নির্দ্দোষ, তা ত তুমি জান? তুমি জান্‌লেই আর প্রমাণের দরকার নেই। বালক! আমাকে বাঁচাও ভাই, আঁজ আমাকে এই মড়ার ভয় থেকে ত্রাণ কর!"

"ও যেমন তেমন মড়া নয়, শিউরে উঠ'না, আশ্চর্য্য হয়ো না! এই অন্ধকারে এক রকম অন্ধকার বুঝেই এমন পাগল হয়ে উঠেছ, আলোতে আপন চক্ষে এই মড়া দেখ্‌লে, না জানি তুমি কি আঁৎকেই উঠ্‌বে! এই দেখ।"

বালকটি তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিয়া ফেলিল! এ্যা—এঁ্যা—একি একি! একি দেখিলাম! শবদেহ আমার পরম পূজ্যপাদ প্রতিপালক-পিতা দেবনারায়ণবাবুর! কি সর্ব্বনাশ!! কি সর্ব্বনাশ!!! হায়, হায়, অবশেষে দেবনারায়ণবাবুর মৃতদেহ দেখিতে হইল? হা ভাগ্য!"

বালক কহিল, "কার মড়া দেখ্‌লে ত? কিন্তু দেবনারায়ণবাবু এখনও মরেন নি। এঁর জীবন এখন আমার হাতে, ইচ্ছা কল্লে আমি এখনি এঁর জীবন দান কত্তে পারি!"

আমি সোৎকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম, "তোমার যেরূপ দৈব ক্ষমতা, তুমি

মনে কল্লে দেবনারায়ণবাবুকে আবার বাঁচাতে পার, তাই কর ভাই, তাই কর, —যে রকম ক'রে পার, এখনি দেববাবুকে বাঁচাও, অনন্ত পুণ্য হবে ;—তাই কর ভাই,—তাই কর।"

বালক। "সত্যই দেববাবু এখনও মরেন নি', একরূপ তীক্ষ্ণ বিষে ইনি সমাচ্ছন্ন। পূর্ণ বার ঘণ্টাকাল এই বিষে জর্জ্জরিত থাকবেন, বাঁচ্‌বার জন্য একরূপ প্রতিষেধক ঔষধ আছে, যদি ইতিমধ্যে না খাওয়ান হয়, অর্থাৎ আজ রাত না পোহাতেই যদি সেই প্রতিষেধক এঁকে না খাওয়ান হয় ; তা হ'লে কাল সকালে কোন উপায়েই আর বাঁচান যাবে না। সেই ঔষধও আমি যোগাড় করে এনেছি, এখনই তা খাইয়ে দিচ্ছি ; কিন্তু তিন দিন সমভাবে সেবা কর্‌তে হবে। আমি পেরে উঠ্‌ব না—তোমাকেই দেববাবুর কাছে অনবরত তিন দিন থাক্‌তে হবে।"

আমি। "আমি অতি আনন্দেই সে ভার নিচ্ছি! কিন্তু ভাই, এখানে এমন লুকিয়ে থেকে ত এ কার্য্য হবে না!"

বালক। "তাও কি আবার তোমাকে ব'লে দিতে হ'বে ? তার উপায়ও আমি করেছি। আমি যা যা করি, তুমি স্থির হ'য়ে বসে দেখ।"

নিমেষ মধ্যে বালকটি দেববাবুর মুখে কি একটা তৈলাক্ত পদার্থ ঢালিয়া দিল, এবং কিছুক্ষণ স্থির হইয়া নির্নিমেষ নয়নে দেববাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি সঙ্কেত বুঝিল জানি না, ত্রস্তে আমাকে কহিল,—

"এখন আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র না, আমি কোথা থেকে এলেম, কোথা থেকে কি কাজ হ'ল, এ সব জান্‌বার তোমার এখন কিছু দরকার নেই। চল, এঁকে ধরাধরি ক'রে বাইরে নিয়ে যাই, তারপর যা যা কর্ব্বো, ইঙ্গিতে বুঝে নিও—খুব চুপি চুপি কাজ কর।"

উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলাম। সম্মুখে একখানি পাল্কী, চারি জন বেহারা ছদ্মবেশে পাল্কীর নিকট বসিয়া আছে। অতি নিঃশব্দে দেববাবুকে পাল্কীর ভিতর শায়িত করা হইল। বালকের ইঙ্গিতে দেববাবুর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া পাল্কীর ভিতরে উপবিষ্ট হইলাম। নীরবে পাল্কীর দরজা বন্ধ হইল। নিঃশব্দে পাল্কীখানি বেহারাদিগের স্কন্ধে

উঠিল, অতি চুপি চুপি বাতাস সঞ্চালনের মত পাল্কী খানি কোথায় কোন্ পথে চলিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাইতে যাইতে কেবল এই কথাই মনে উঠিতে লাগিল। দেবনারায়ণবাবুর সৎকার না পুনর্জ্জীবন?

পঞ্চদশ চক্র।

তুমি দেব না মানব?

অজ্ঞান অচৈতন্য মৃতবৎ দেবনারায়ণবাবুকে লইয়া একটি জীর্ণ পর্ণকুটীরে আজ আমার দুইদিন কাটিল। আজ সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি কাটিলে, কাল প্রভাতে সুখসূর্য্য যদি উদয় হ'ন, দেববাবু একটি দেবরূপী বালকের অপার করুণায় হয়ত প্রাণ পাইলেও পাইতে পারেন, কিন্তু এ দুরাশা আমি সহজে করি না, দেববাবু যে আবার বাঁচিয়া উঠিবেন, এ আশা আমার পক্ষে স্বপ্নবৎ! অতুল ঐশ্বর্য্যশালী দেববাবুর মহামূল্য প্রাণ একটি বালকের উপর নির্ভর, বালকের কৃপাই এখন দেববাবুর জীবন মরণ। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে! দুইদিন ত একভাবে একাসনে বসিয়া কাটাইলাম। নিদ্রা নাই,—দারুণ উৎকণ্ঠায় একটি মুহূর্ত্ত একটি যুগের মত কাটাইতেছি। বালকের ইঙ্গিতে দেববাবুর একবারও স্পর্শত্যাগ করি নাই, অটল অবিচলিত ভাবে দেববাবুকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছি। আহা, এমন সদাশয় মহৎব্যক্তিরও এমন বিপদ ঘটে? হায় হায়! সংসার কেন এমন ভয়ঙ্কর? এত অত্যাচার, অবিচার, পীড়ন কেন? কেন মানুষ মানুষের এমন দারুণ শত্রু? কেন দুর্ব্বলের—বিশ্বাসীর পরিত্রাণ হয়না? আমি এ সংসারে দুর্ব্বল বলিয়াই কি আমার এত যাতনা? আমি যুদ্ধ করিতে পারি না বলিয়াই কি আমি

সকলের পদদলিত ? আমি বালক বলিয়াই কি সংসারের পরিত্যজ্য ? কেন ? কি পাপ ? কি দোষ আমার ? আমি যে আমাকে এত দিন বুঝিতে পারিতেছি না, কেন ? সত্যই কি আমার পিতা মাতা নাই ? পৃথিবীতে আপনার বলিতে আমার কি কেহই নাই ? আমার এ শাস্তি কেন ? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে না,—এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোটী কোটী লোকের মধ্যে এমন কি আমার বলিতে কেহই নাই, যে আমার প্রাণের এই মহা অন্ধকার ঘুচাইয়া দেয় ? দেবনারায়ণবাবু ! আপনার এ যমযন্ত্রণা কেন ? আপনার কি পাপ—কি দোষ ? আপনি ত কখনই কাহারো অনিষ্ট করেন নাই ? এতাবৎকাল সত্যপথে থাকিয়া ধর্ম্মের সংসার প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, কখন কাহার মনে কষ্ট দেন নাই, নির্বিরোধে এত বড় বিষয় কেমন সুশৃঙ্খলে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তবে আপনি কেন আজ একজন কুপোষ্য বালকের ক্রোড়ে মৃতবৎ শয়িত ? আপনার দেবচরিত্র পুত্র নির্ম্মলকুমার আজ সংসার-ঘৃণায় দেশত্যাগী কেন ? আপনার বিবাহিতা সহধর্ম্মিণী এমন কুলকলঙ্কিনী কেন ? আপনি পূর্ণ বিশ্বাসীপুরুষ ; পত্নীকে পতিপ্রাণা ভাবিয়া, পত্নীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া—পত্নীর স্বভাবচরিত্রে সন্তুষ্টচিত্তে নির্ম্মলকুমারের শোক-স্মৃতি ভুলিয়া আজ পত্নীর চক্রান্তে আপনি মৃতবৎ ! হা মহোদয় মহাত্মন ! আপনি কোথায় কোন্ অন্ধকারে সংসারচৈতন্য হারাইয়া নিপতিত, আপনি তার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না ! গাত্রোত্থান করুন, পাপীরে সমুচিতশাস্তি দিন, এই বালকহৃদয়ের প্রত্যুপকার গ্রহণ করুন ! নিদারুণ হৃদয়উচ্ছ্বাসে কত কথাই বলিয়া ফেলিলাম, পাঠক মহাশয়! বালকের এ প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

এ কুটীরখানি কাহার ? এখনও জানিতে পারি নাই, এ কোন্ স্থান তাহাও জানি না। গত পরশ্ব রাত্রে পাল্কী করিয়া অচৈতন্য দেবনারায়ণবাবুকে লইয়া এই অজ্ঞাতস্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছিলাম। আহারের সময় ছদ্মবেশীলোক এই স্থানে আহার্য্য আনিয়া দেয়, মানুষের মুখ এই মাত্র দেখিতে পাই। দেবনারায়ণবাবুকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিবার উপদেশ বালকের নাই, তিন দিন সমভাবে ইহাঁকে এই অবস্থায় স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিলে

দেবনারায়ণবাবুর পুনর্জ্জীবন সম্ভব, নচেৎ আর উপায় নাই; তাই আছি—বুক বাঁধিয়া আমার পরমোপকারী প্রতিপালক পিতৃপ্রাণের আশায় তাই বসিয়া আছি! এত কষ্ট স্বীকার করিতেছি, তবু কি দেবনারায়ণবাবু বাঁচিবেন না? দেখি বালককে উপলক্ষ করিয়া ভগবান কি করেন!

সূর্য্যদেব ক্রমে পশ্চিমাচলে স্তীমিত হইলেন, এই নশ্বর সংসারে সন্ধ্যাসতী মূর্ত্তিমতী হইলেন, দিনের অসংখ্য অস্ফুট কোলাহল সন্ধ্যার শান্তিসমুদ্রে ডুবিয়া গেল, নিবিড় অন্ধকার কালমুখ ব্যাদান করিয়া পর্ণ কুটীরখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি সেই অবস্থায়—দেবনারায়ণবাবুকে ক্রোড়ে করিয়া একাকী বসিয়া আছি! এমন সময়ে বালকের সহকারী সেই অপরিচিত লোকটি প্রদীপ হস্তে প্রবেশ করিল। তাহার সহিত কোন জিজ্ঞাসায়—কোন কথায়—(বালকের উপদেশে) আমার অধিকার নাই। আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম, সেও নীরবে কুটীরকার্য্য একে একে সারিয়া লইল। অন্নব্যঞ্জন সমেত একখানি থালা লইয়া একজন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখে বসিল। আমার সমভাব,—দেবনারায়ণবাবুকে ক্রোড়ে লইয়া যতদূর পারিলাম, অন্নব্যঞ্জন উদরস্থ করিলাম, বসিয়া বসিয়াই আমার হস্ত মুখ প্রক্ষালন হইল। এই কুটীরে প্রবেশাবধি বালকটিকে একবারও দেখি নাই, বালকটি এখন কোথায়, জানিবার জন্য তাহাদিগকে কতবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোন কথাই কহে না, কেবল উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে বাক্‌হীন মুকের মত চাহিয়া থাকে। এ আবার এক যাতনা, কথা না কহিবার কারণ কি? বেশী নয়, একটি কথা,—আমার একটি প্রশ্নের উত্তর না দিবার কারণ কি? কত বিনয় অনুরোধ, তাহারা কাণেই তুলে না। তারের পুতুলের মত কার্য্য করিয়া—তারের পুতুলের মত কুটীরের আগোড় বন্ধ করিয়া চুপি চুপি চলিয়া যায়।

আর এমন করিয়া একাসনে বসিয়া থাকিতে পারি না, একি মানুষে পারে? নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব অন্ধকার কুটীরে একটা শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া তিন দিন তিন রাত আমার মত একজন বালকের বসিয়া থাকা, একি কেহ কখন পারে? না, এ নিরুপায়, ইহা ভিন্ন বোধ হয় আর কোন উপায়

নাই; তাহা না হইলে বালক অবশ্যই ইহার কোন উপায় করিত। আজ রাত্রি মাত্র, আজ রাত্রি প্রভাত হইলেই আমি এই অসহ্য যমযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব, দেবনারায়ণবাবুও জীবন পাইবেন। তবে বসিয়া থাকি, দেবনারায়ণবাবুর প্রাণের অপেক্ষায়, বালকের শুভদর্শনাপেক্ষায় আজ এই অবশিষ্ট রাত্রি মাত্র এই ভাবেই বসিয়া থাকি।

ক্রমশঃ রাত্রি গভীরা হইল, জগৎ এককালীন নিস্তব্ধ? কুটীরের কুলুঙ্গিতে টিম্ টিম্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, আমি দেওয়ালের উপর মাথাটি রাখিয়া একটু তন্দ্রা সুখ অনুভব করিতেছি,—হঠাৎ অন্তর্দ্দৃষ্টিতে যেন দেখিতে পাইলাম, কুটীরখানি আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আমার সুখ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু চাহিয়া দেখি, আমার সম্মুখে জ্বলন্ত মশাল হস্তে একজন স্ত্রীলোক, সে আমার মুখের দিকে ও দেববাবুর মুখের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে। একটা বিদ্যুৎ যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে চমকিত হইয়া উঠিল! একি প্রেত লীলা, না প্রেতিনীর ছায়া! আমি হতবুদ্ধি, আমার মুখে বাক্য নাই, চক্ষে পলক নাই, অজ্ঞান হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম! এই স্ত্রীলোক কে? ইহার কি অভিসন্ধি? ঐ শুন, স্ত্রীলোকটি কি বলে শোন;—"হঠাৎ আমাকে দেখে তোমার চোম্‌কে ওঠ্‌বার কথা বটে, কিন্তু ভয় পেয়োনা, আমি অনেক খুঁজে অনেক সুলুক সন্ধান ক'রে তোমার দেখা পেয়েছি। আমি কে জান? আমাকে কি কখন দেখেছ ব'লে তোমার মনে হয়?"

আমি ভয় বিহ্বলচিত্তে কহিলাম, "না, তোমাকে আমি কখন দেখিনি, তুমি কে? আমি তার কিছুই জানি না।"

স্ত্রীলোক। "তুমি এখনই তা জান্‌তে পার্‌বে। একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি নির্ম্মলকে দেখ্‌তে ইচ্ছা কর?"

আমি। "কে? দাদা—আমার নির্ম্মল দাদা? কোথায় তিনি? কোথায় তিনি?"

স্ত্রীলোক। "এই খানেই আছে; তুমি যদি চেঁচাও, তা'হলে আর দেখ্‌তে পাবে না।"

আমি। "না আমি চেঁচাব না, কোথায় তিনি আমাকে বল, আমি এখনিই তাঁকে দেখব!"

স্ত্রীলোক। "তবে ঐ শব দেহটা ছেড়ে শিগ্‌গির আমার পেছনে পেছনে এস।"

তৎক্ষণাৎ আমি দেবনারায়ণবাবুর মস্তকটি ভূমিতে নামাইতে যাই, কে যেন আমার কাণে কাণে চুপি চুপি বলিয়া দিল, 'এমন কাজ করিও না, এমন কাজ করিও না, ডাকিনীর মোহমন্ত্রে ভুলিও না!' অমনি আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! উপস্থিতবুদ্ধিবলে তাহাকে কহিলাম, "তোমাকে চিনি না, তোমার কথার ভাবও বুঝ্‌তে পারি না; যদি সত্যই আমার নির্ম্মলদাদা এখানে এসে থাকেন, তবে তাঁকে আমার সম্মুখে নিয়ে এস, আমি উঠ্‌তে পার্‌ব না।"

স্ত্রীলোক। "আরে পাগল! সে আস্‌তে চায় না, সে তার মরা বাপকে চোখে দেখ্‌তে পারবে না। তোমাকে কি একটা বিশেষ কথা বল্‌বে, এসনা—ভয় কি?"

আমি। "কখনই যাবনা, তিনি তাঁর মরা বাপকে দেখ্‌তে পার্‌বেন না? একি কথা? কে বল্লে ইনি মৃত? আমি যদি এঁকে ছেড়ে উঠি, তা হ'লে তাঁকে মরা বাপ্‌ দেখ্‌তে হবে বটে, কিন্তু এখনও ইনি মরেন নি! তুমি যাও, তাঁকে এই কথা বল যে, ব্রজেন্দ্র তাঁর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পাল্লে না, ব্রজেন্দ্র তাঁরি কাজ কচ্ছে, আজ তিন দিন তিন রাত জেগে তাঁর বাপকেই বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছে, সে ছেড়ে উঠ্‌লে, নির্ম্মলচন্দ্র সত্যই পিতৃহীন হবেন।

স্ত্রীলোক। "তুমি কেমন ছোকরা? আমার কথা তুমি শুন্‌বে না? নির্ম্মলের সঙ্গে দেখা কর্‌বে না? এস, ছিঃ একগুঁয়েমী ছাড়, যাও—নির্ম্মল ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে. তাকে ডেকে এনে দু'জনে এঁকে বাঁচাবার চেষ্টা কর, আর কথা নড়চড় ক'র না! যাও—

আমি। "কখনই যাব না, এঁকে ছেড়ে আমি কখনই উঠ্‌ব না, কেন তুমি আমাকে এমন কথা বল? তোমার নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে, এত রাত্রে একলা তুমি স্ত্রীলোক হয়ে কি মনে ক'রে এখানে এসেছ, কে তুমি?"

স্ত্রীলোক। "দ্যাখ্, তোর ভালর জন্যই বল্‌চি, নির্ম্মলের ভালর জন্যে বল্‌চি, শীগ্‌গির এখান থেকে ওঠ্, নইলে তোর কি দশা হ'বে, তা তুই এখনো বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না! তুই যদি আমার কথা শুন্‌তিস্, তা হলে আমার পরিচয় পেয়ে চোমকে উঠ্‌তিস্! তোকে উঠ্‌তেই হবে, কেমন তুই আমার কথা ঠেলিস্, তা দেখ্‌ছি!"

আবার একি বিপদ! এ ডাকিনী কে? ক্রমেই যে বল প্রকাশ আরম্ভ করে! আমি ইহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি, যাহাতে দেবনারায়ণবাবু আর গাত্রোত্থান না করেন, এ পাপিনী তাহারি জন্য আসিয়াছে; কিন্তু আমার প্রাণপণ, আমি কখনই উহার কুহকে ভুলিব না, উহার মনে যাহাই থাকে—করুক, আমি কখনই ফাঁদে পা দিব না! দেখি, উহার কত বল—কত কৌশল!

স্ত্রীলোকটা সরোষে কহিয়া উঠিল, "তবে তুই উঠ্‌বিনি? পাজি ছোঁড়া! জান না কার হাতে প'ড়েছ? ওঠ্—এখনি ওঠ্! তা না হ'লে তোর দফা রফা কর্‌ব! তোর অদৃষ্টে যে কি যাতনা আছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি! বেরো এখান থেকে—দূর হ—এখান থেকে! তবু উঠ্‌লিনি?"—

একি কাণ্ড! আচম্বিতে এক সময়েই সেই জ্বলন্ত মশালটা আর টিম্ টিম প্রদীপ নিবিয়া গেল! যেন কাহারা কুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, স্ত্রীলোকটার হস্ত মুখ পদ বন্ধ করিয়া সজোরে টানিতে টানিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে লইয়া কোথায় প্রস্থান করিল।

সপ্তসুরে একটি ঝঙ্কার উঠিল, "এস, দু'জনেই আমরা ধরাধরি ক'রে দেববাবুকে বাহিরে নিয়ে যাই, এখানে আর থাকা হ'বে না, লোক লেগেছে। ঐ মেয়েমানুষটা কে বুঝ্‌তে পেরেছ? ও তোমার দেববাবুর একটি শালী, ওঁরাই ক'জনে প'ড়ে দেববাবুকে বিষ খাইয়েছেন! শঙ্কর টঙ্কর সব বাইরে ছিল, তোমার এখনি প্রাণ যেত। তারা কেউ প্রাণে মরেনি বটে, কিন্তু সব আমার জালে ধরা পড়েছে! এস, আমরা ধরাধরি ক'রে দেববাবুকে তেমনি ক'রে পাল্কীতে তুলে দি,—আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেহারারা ওঁকে নিয়ে যাক্। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কাজ আছে, সেই কাজ গুলি তোমাকে কত্তে হ'বে, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক। এস, এঁকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে আসি।"

সেই ঘুট্ ঘুট্ ঘনাবৃত অন্ধকারে উভয়ে দেববাবুকে ধরাধরি করিয়া অতি কষ্টে পাল্কীতে তুলিয়া দিলাম। বেহারারা তাঁহাকে লইয়া নিঃশব্দে কোথায় চলিয়া গেল।

আবার করাল অন্ধকার মধ্যে আমরা উভয়ে চুপি চুপি চলিলাম। কোথায় যাইতে হইবে কিছুই জানি না, এই অনন্ত অন্ধকারসমুদ্রে বালকই আমার কাণ্ডারী। যাইতে যাইতে একবার আমার মনে এই ভাবটি উঠিল, কে তুমি? দেব না মানব?

ষোড়শ চক্র।

তুমি বীরজা? না বীরবাহু?

নিবিড় অন্ধকারময় বিজন বনমধ্য দিয়া আমি বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। কোথায় যাইতে হইবে, তাহার কিছুই জানি না, বালকই আমার লক্ষ্যস্থল, বালকের লক্ষ্যই আমার লক্ষ্য। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে বালক যেন কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া পড়ে, যেন কাণ পাতিয়া কাহার পদশব্দ শ্রবণ করে! দূরে একটা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে মৃদু নিনাদে একটি ধীর বংশীধ্বনি উঠিল, তৎক্ষণাৎ বালকের মুখ হইতেও বংশীধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত হইল। অমনি পলক মধ্যে কাল কম্বলাবৃত একটি লোক আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইল। বালক কহিল, "কেও—গোবিন্দলাল?"

উত্তর হইল, "আজ্ঞে হাঁ।"

বালক। "যা যা বলেছিলুম তা সব ঠিক ত?"

উত্তর। "আজ্ঞে হাঁ।"

বালক। "পোষাক রং প্রভৃতি সব মজুত ?"

উত্তর। "আজ্ঞে হঁা।"

বালক। "দলবল কোথা ?

উত্তর। "আজ্ঞে ঘাটীতে।"

বালক। "তোমার লোক জন ?"

উত্তর। "যেখানে হুকুম করেছেন, সেখানেই! হুকুম হয় ত, আপনার সম্মুখে হাজির করি।"

বালক। "না, এখন দরকার নেই, সময় মত হুকুম হবে। তোমার আড্ডায় আমাদের সাজিয়ে দিবে চল।"

আবার নীরবে আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। অনতিদূরেই একটি কুটীর দৃষ্ট হইল, কুটীরের মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট হইলাম। কুটীর খানির আসবাব পত্র বড় চমৎকার—বড় অদ্ভুত! এক কোণে একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছে, এক পাশে একখানি উলঙ্গ চৌকী, তাহাতে মাদুর কিম্বা কোন আস্তরণ বিস্তৃত নাই। কেবল নানা রকমের ছোট বড় কাঁচা পাকা দাড়ী, গোঁফ, পরচুল; নানাবিধ অপরিস্কার সরাতে গোলা-রং, অনেক গুলি ছোট বড় পুঁটুলি, কতকগুলি অর্দ্ধশুষ্ক বন্য লতা, ব্রস সমেত একখানি বড় আয়না, অনেক রকমের রং মাখান ছেঁড়া কাপড়, ছোট ছোট কাগজের মোড়ক। সারি সারি বড় বড় তিনটা জালা মেজেয় পোঁতা; একটা বাঁশের আল্‌না ঝুলান। ঘর খানিকে বেশ করিয়া দেখিলে, যাদুকরের সাজ ঘর বলিয়া বোধ হয়। আমরা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র, সেই লোকটি মেজেয় একখানি মাদুর পাতিয়া দিল, আমরা তাহাতে উপবিষ্ট হইলাম।

বালক কহিল, "গোবিন্দলাল! রাত আর বড় বেশী নেই, যে সাজ সাজাতে হবে, এই বাবুকে বেশ বেমালুম ক'রে সাজিয়ে দাও। আমার সাজ সরঞ্জাম সব নিয়ে এস, আমি বাহিরের দাওয়ায় আছি, একটা প্রদীপ দাও।"

বালক আর একটি প্রদীপ লইয়া বাহিরের দাওয়ায় চলিয়া গেল, তৎসঙ্গে গোবিন্দলালও একটা বড় পুঁটুলী লইয়া বাহিরে গেল।

আমি হতভম্ব—নির্ব্বাক নিশ্চল! এ আবার কি ব্যাপার! এ যে ছদ্ম-বেশের আয়োজন দেখিতেছি। এ বালক কে? এই যে অনুচর গোবিন্দলাল, বালকের সহিত এত বিনয় সম্ভ্রমে কথা কহে কেন? কে এই মহাবুদ্ধি-বালক? এ রহস্য আমি এতকাল বুঝিতে পারিতেছি না! দস্যুসম্প্রদায়ে বাস করে, দস্যুসন্তান বলিয়া পরিচিত, অথচ এ সব কি অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড! ছদ্মবেশে কোন্ কার্য্য সাধিতে হইবে? জানি না—বালকই জানে, বালকের কৌশলই জানে।

আমার সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া সেই লোকটি আমাকে সাজাইতে বসিল। মুখে এক প্রকার রং মাখাইয়া দিল, কি রং তাহা জানি না; মস্তকে পরিষ্কার কোঁকড়ান বাবরী চুল পরাইল, কর্ণে এক প্রকার মাকড়ির মত অলঙ্কার আটা দিয়া বসাইয়া দিল! টুপি, মের-জাই, পায়জামা, নাগরা জুতা প্রভৃতি সমস্তই যথাযোগ্য স্থানে শোভিত হইয়া আমাকে একটি হিন্দুস্থানী বালকে রূপান্তরিত করিল। তাহার ক্ষিপ্রহস্ততায় বেশ নৈপুণ্যে আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আয়নাতে আমার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না, অধিক কি, আপনাকেই আপনি চিনিতে পারিলাম না। আমার মুখের রংয়ের সহিত আমার মুখমণ্ডল আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দিবালোকেও কখনই কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না!

"আমি কে চেন দেখি?" পশ্চাত হইতে কে যেন বলিল।

আমরি! কি অপরূপ মোহিনী মূর্ত্তি! দেবারাধ্যা ত্রিলোকারাধ্যা সন্ন্যাসিনীছবি! গৈরিকবস্ত্র পরিধান, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা লম্বিত, মস্তকে আলুলায়িত কৃষ্ণকেশ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, নিষ্কলঙ্ক শশীর মত ঢল ঢল বিমল মুখখানি, হস্তে ত্রিশূল—কে তুমি? কৈলাসবাসিনীর মত কে তুমি যোগিনী-দেবী এই অন্ধকারে আবির্ভূতা হইলে?

"আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমার গলার আওয়াজেও বুঝ্‌তে পাচ্ছনা? ছি! কি তুমি?"

এঁ্যা এঁ্যা! সেই বালক তুমি? কি অদ্ভুত প্রতিভাশালী বালক তুমি!! আহা, এমন রূপ তোমার? তুমি দেব কি দেবী, মানব কি

মানবী, আমায় প্রকাশ করে বল ! আমার দুই চক্ষে তোমার অতুল রূপরাশি ধরে না ! তোমার দুর্ব্বোধ্য জটিল অমানুষিক বুদ্ধিতে আমি বুদ্ধিহত ! তোমার ভাবে আমি উন্মত্ত। বল, তুমি কে ? অবশ্য তুমি কেহ আমার আপনার হইতে আপনার ! আমি সংসার বিতাড়িত, সংসার আমাকে মহান দুর্গম পঙ্কে ফেলিয়া দিতে চায়, পিতা মাতা প্রভৃতি আমার সংসারের আত্মীয়গণ আমার জীবন লইতে চায়, তুমি কেন আমার এই দগ্ধপ্রাণের জন্য এত উদ্যোগী ? কে তুমি আমার আপনার হইতে আপনার ? আমায় বল, আমাকে আর সংশয়ে রাখিও না। আমাকে তোমার সম্বোধনের অধিকার দাও, তোমাকে কি বলিয়া আহ্বান করি ? আমাকে বল, নচেৎ—"

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না, অশ্রুজলে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আবার একি দেখিলাম ! সেই দেবীমূর্ত্তি নিশ্চল,—পুত্তলিকা-প্রতিমূর্ত্তির মত নির্ব্বাক ! ঝর ঝর অজস্র অশ্রুধারে নয়নযুগল প্লাবিত! প্রস্ফুটিত পদ্মপলাশের মত অশ্রুসিক্ত রক্তাভ-আঁখিদুটি আমার মুখের প্রতি স্থির স্থির নিপতিত ! আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না !

একি ! এই উদাসিনী দেবীর উদাস চক্ষে রোদনের অশ্রু কেন ? আমার যে কিছুই বোধগম্য হয় না।—"তুমি কাঁদ কেন ?"

দেবীমূর্ত্তি কহিলেন, "কেন কাঁদি ? তোমার ভাবে কাঁদি, তোমায় দেখে কাঁদি,—তুমি উদাসীন সংসারবিহীন ব'লেই কাঁদি ! দেখ, আমার প্রাণ বড়ই কোমল, কাঠিন্য দেখ্‌লেই আমার প্রাণে ব্যথা লাগে ! তুমি নির্দ্দোষ, তোমার বড় কষ্ট, তোমার বড় বিপদ, তাই তোমায় দেখে আমি কাঁদি। আর আমার পরিচয় ? আমার পরিচয় নিয়ে তোমার কি হবে ? হয় ত আমার পরিচয় এত ছোট, যে, তোমায় গায়েই লাগ্‌বে না,—তোমার মনেই সইবে না;—নয় ত আমার পরিচয় এত বড়, যে, তোমার গায়েও সইবে না, প্রাণেও ধরবে না,—আর আমি পুরুষ কি মেয়ে ? তাও ত তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ, দরকারের সময় দরকারের মত হই ! অবশ্য দুইই আমি এক সঙ্গে হ'তে পারি না, একটা আমি ঠিক, সে যে কোনটা, তা এখন তুমি বুঝ্‌বে

না।' একদিন না একদিন এমন সময় আস্‌বে, যে, তুমি আপনিই আমাকে ঠিক্ ভেবে বেছে নেবে। এখন চল, এক যায়গায় যাই। ভাল কথা, তুমি ঘোড়ায় চড়্‌তে পার?"

আমি। "ছেলেবেলায় চড়্‌তেম বটে, এখন অভ্যাস না থাক্‌লেও হয় ত পারি। কিন্তু একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে তা বল্‌তেই হ'বে। আপনার পরিচয় আমি কিছুমাত্রও জান্‌তে পাল্লেম না, কৃপা ক'রে আপনার নাম কি বলুন, কি ব'লে আপনাকে সম্বোধন করি?"

দেবীমূর্ত্তি। "যখন আমি বালকসাজে থাক্‌ব, তখন তুমি আমাকে 'বীরবাহু' ব'লে ডেকো; এখন আমি স্ত্রীলোক—এখন আমি 'বীরজা'। আর একটা কথা বলি তোমায়, যেমন তুমি আমাকে বরাবর "তুমি" ব'লেই আসছ, যে বেশে যেখানেই থাকিনা কেন, তুমি আমাকে "তুমি" বলেই ডেকো, আমি "আপনি—মহাশয়" হ'তে পারি না। এস আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।"

অন্ধকারে বনপথ দিয়া নীরবে বীরজাসুন্দরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। কেবলি এক কথা আমার প্রাণের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল। কে তুমি? তুমি বীরজা—না বীরবাহু?

সপ্তদশ চক্র।

দেবী-প্রতিভা।

বীরাঙ্গনা বীরজাদেবী অশ্বারোহণে ধীর কদমে বনপথ অতিক্রম করিতে-ছেন, আমি যথাসাধ্য তৎসঙ্গে সঙ্গে চলিতেছি। প্রাতঃকালোত্থিত রক্তিম সূর্য্য দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া উদয় হইতেছেন, আমাদের চক্ষুর অন্ধকার অপসৃত হইল, পথ পরিষ্কার হইল, সেই দুর্গম পথ সুগম হইল। অদ্য রাত্রি



তিনটা হইতে আমরা উভয়ে অশ্বারোহণ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম অভিমুখে ছুটিতেছি। কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থির নাই। যখন রাত্রি ছিল, আমরা আস্তে আস্তে আসিতেছিলাম, প্রভাত উদয় দেখিয়া আমাদিগের বেগমাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল।—অশ্ব দুটিও খুব সাহসী ও তেজস্বী। কোন দিকে দৃষ্টি নাই, অবিশ্রান্ত পশ্চিম মুখে চলিতেছি। সম্মুখেই একটি চৌমাথা, তথায় আসিয়া বীরজাদেবী একবার থামিলেন, একবার চারিদিক চাহিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া, দক্ষিণ দিকের পথ ধরিলেন। কিছুদূর আসিয়া দেখিলাম, একটা খাল জঙ্গল বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়া গিয়াছে। এ দেশের নাম—খালের নাম কিছুই জানি না, আমি অবাক্-সঙ্গীর মত বীরজাদেবীর পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী, পশ্চিম দিকের মোড় ফিরিয়াই সম্মুখে দেখি একখানা ভাঙ্গা চোরা মস্ত বাড়ী, সদর দরজা খোলা, বাটীতেও কোন লোক আছে বলিয়া বোধ হয় না। রজনীতেও যেমন ঘুমন্ত ছিল, এখন প্রভাতেও তদ্রূপ! আমরা উভয়েই অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম।

দেবী কহিলেন, "আসবার সময়ে যে খাল দেখে এসেছ, তার ধারে যে নিবিড় জঙ্গল দেখেছ, সেইখানে একটু গা-ঢাকা হ'য়ে ঘোড়াদুটিকে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা কর। আস্‌বে না জানি, তবু যদি কেউ আসে, যদি কোন কথা কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে, প্রথমটা গম্ভীর হয়ে থেক, যখন দেখ্‌লে যে নেহাৎ পার্‌ছনা, কেবল এই কথা বলো, 'আমি দেবীরাণীর সঙ্গী,—'বস্‌ এই পর্য্যন্ত।" বীরজাদেবী বাটীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, আমিও অশ্বদুটিকে লইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম।

কি রহস্যময় ঘটনা! এ কোন্ স্থান? কোথায় আসিলাম? কোন্ কার্য্য উদ্ধারের জন্য এই ছদ্মবেশ? আমি জানি না, এই মহাপ্রতিভাময়ী দেবীর অসীম মহিমার বিন্দুও বুঝিতে পারি না! অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, নচেৎ এত কষ্ট স্বীকার কেন? এতদূর অশ্বারোহণের ক্লেশ সহিবার কারণ কি? হে মহামহিমাময়িমমতাপ্রবাহিনি দেবি! আমি অতি ক্ষুদ্র, তোমার অনন্ত মহিমার কণামাত্র বুঝিবার আমার ক্ষমতা নাই! যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কে তুমি"? আমি বলিব, "আমি দেবী-

রাণীর সঙ্গী।" দেবীরাণী কে? উনিই কি একাধারে বীরবাহু—বীরজা—দেবীরাণী?

জীবনে এতাবৎকাল কখনও আমি সহিসের কার্য্য করি নাই। পিতার পুত্র হইয়া পিত্রালয়ে যখন ছিলাম, তখন সহিসের কার্য্য কখন কখন বসিয়া দেখিতাম। হায়, তখন কি জানিতাম যে ভবিষ্যতে আমার এত নিগ্রহ আছে? আমাকে সহিসের কার্য্য করিতে হইবে? দূর হউক আর এ কথা মনে আনিব না। সংসারচক্রের মহান্ আবর্ত্তনে পড়িয়া রাজপুত্র কিরূপে পথের ভিখারী হয়, আমিই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঘৃণা, লোক-লজ্জা, মান, অভিমান, সমস্তই দূর হউক, জগতের চক্ষে আমি ঘৃণিত পতিত হই, দেবীরাণীর মমতার দাস আমি, দেবীরাণীর অশ্বসেবাই আমার প্রধান কার্য্য!

যথাসাধ্য অশ্বদুটীর সেবা করিতে ক্রটী করিলাম না। নবীন নধর বন্য ঘাস গুলি দেখিয়া আহ্লাদে ঘোড়াদুটি আহারে প্রবৃত্ত হইল, আমিও একটা আম্রবৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ বসিয়া আছি, একটা ধীর মৃদুগুঞ্জন শব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্রমে ধীর পদশব্দও নিকটবর্ত্তী হইল! সভয়ে পথের দিকে চাহিয়া দেখি, দুইজন লোক পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে সেই ভাঙ্গা বাড়ীখানার দিকে চলিয়া যাইতেছে; পাছে তাহারা আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমি বৃক্ষটির অন্তরালে লুকাইয়া তাহাদের গতিবিধি দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ তাহারা এদিক ওদিক চাহিয়া কি একটা সঙ্কেত করিল। তৎক্ষণাৎ আর একজন ভয়ানক লোক প্রকাণ্ড লাঠিস্কন্ধে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। আমিও মহা সন্দেহে অভিভূত হইলাম। ইহাদের উদ্দেশ্য, চুপিচুপি কথা বার্ত্তার কারণ জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলাম। তাহারা যে স্থানে দণ্ডায়মান, ঠিক্ তাহারি পশ্চাতে খালের ধারে একটা ঝোপ দেখিতে পাইলাম। সেই স্থানে যাইতে পারিলে তাহাদের কথা বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। আরও একটু সুবিধা ঘোড়াদুটি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও রাস্তা হইতে তাহাদের দেখা যায় না। আমি

কাল বিলম্ব না করিয়া চুপি চুপি সেই ঝোপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। কি মর্ম্মভেদী কথাই আমার কর্ণে বজ্রস্বরূপ নিপতিত হইল! প্রথম দুইজনের একজন বলিতেছে ;—

"ছুঁড়ী ভারী তেজী, ভারী চালাক! ওকে ভুলিয়ে মাত্তে পার্‌বেনা! একেব্বারে চুপিচুপি তার পেছনের দিকে গিয়ে সোজা সুজী মাথার উপর এক ঘা!"

দ্বিতীয়। "আর রায়মোশাই কি বলেছেন জান? "ওই ছুঁড়ীই নাকি সেই ছোঁড়াটাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আন্‌চে;" ও ভারী বিশ্বাসঘাতকী, ওর উপর তিনি হাড়ে চটেছেন। মেধো! তুই ঠিক দেখিচিস্ ত?"

প্রথম। "ঠিক না ত কি আমি ঠাট্টা কত্তে এইচি নাকি? আমি হাঁসপুকুরের ওপার থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখিছি! ছুঁড়ী সন্নিসী সেজে বুক উঁচিয়ে ত্রিশূল ঘাড়ে ক'রে সেই যে ছোঁড়াটাকে নূতন ধরে এনে যে ঘরে কয়েদ ক'রে রেখেছে, সে ঘরের সিঁড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে, আমি পুকুর পার থেকে সব দেখেছি! তুই চ'না, এত ভয় খাচ্চিস্ কেন? একটা মেয়েমানুষের কাছে এত ভয়?"

প্রথম। সরোষে সেই লাঠিয়ালের প্রতি কহিল, "বংশী, তুই একটু গাঢাকা গাঢাকা হয়ে পেছনে পেছনে থাকিস্। চ' ত, এগিয়ে চ' ত।" তাহারা বাটীর ভিতর প্রস্থান করিল।

কি সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসিনীর যে মহাবিপদ! কি হইবে—কেমন করিয়া তিনি রক্ষা পাইবেন? আমার প্রাণদায়িনী পরমোপকারিণী দয়াময়ী দেবী পরের উপকার করিতে আসিয়া বুঝি নিজে প্রাণে বিনষ্ট হ'ন! আমি থাকিতে—আমার জীবন থাকিতে কখনই তাহা হইতে দিব না। আমি যাই, প্রাণপণে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করি। আর দাঁড়াইলাম না, উন্মত্তবৎ সেই ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। হঠাৎ একটা গম্ভীর স্বর স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "কোথায় যান? ফিরুন—ফিরুন! অমন ছেলে-মানুষী কাজ কর্ব্বেন না।" এ আবার কি? আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম! উত্তর দিক হইতে এই শব্দটি আসিল। সেই দিকে চাহিয়া

দেখি, একটি লোক আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে উপস্থিত হইলাম। তাহার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র তাহাকে চিনিতে পারিলাম, এ সেই গোবিন্দলাল, যে আমাকে সাজাইয়া দিয়াছে।

গোবিন্দলাল কহিল, "আমাদের দেবীরাণী কি এতই দুর্ব্বল—এতই অজ্ঞান, আমরা থাক্‌তে তাঁকে গুণ্ডার হাতে মর্‌তে হবে? তাঁর অগাধ বুদ্ধিতে তিনি নিজে অক্ষত শরীরে বাঁচবেন, ঐ গুণ্ডারাই লাভে হ'তে তাঁর জালে প'ড়ে মারা যাবে।"

অস্থিরচিত্ত আমি, তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে উনি দেবীরাণী? আমাকে ব'লে দিয়ে কি আমার মহা সন্দেহ ঘোচাতে পার না?"

গম্ভীর স্বরে গোবিন্দলাল কহিল, "চুপ করুন, সম্পূর্ণ নিষেধ। আমাকে যা বল্লেন, আর কখনও কাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন্ না।"

আমি। "আচ্ছা, এই ভাঙ্গা বাড়ীতে তাঁর আস্‌বার কারণ কি? কা'কে উদ্ধার কর্‌বার জন্য তিনি এতদূর কষ্ট স্বীকার কর্‌ছেন?"

গোবিন্দলাল। "তাও ক্রমে জান্‌তে পার্‌বেন। আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন, ব'সে ব'সে দেবীরাণীর তেজ দম্ভ দেখুন।"

একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদ কোলাহল উঠিল! শশব্যস্তে গোবিন্দলাল উঠিয়া আমাকে কহিল, "আপনি যেমন আছেন, তেমনি লুকিয়ে থাকুন, কি ব্যাপারখানা একবার দেখে আসি। ভয় পাবেন না,—আর বাড়ীর দিকে যাবার চেষ্টা কর্‌বেন না।" গোবিন্দলাল ত্রস্তে প্রস্থান করিল।

আমি নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কম্পিত প্রাণে বসিয়া কত ভাবনাই ভাবিতেছি। কে দেবীরাণী? দেখিতে বালিকা, কিন্তু বলবুদ্ধিতে সিংহ-বাহিনী পার্ব্বতীর মত! কি অন্ধকারময় গুপ্ত রহস্য আজ উন্মোচিত হইবে! কত ভাবনা কত কল্পনাই যে তখন আমার, লেখনীতে আর কি প্রকাশ করিব! একটু অন্যমনস্ক হইয়া এই সকল বিষয় তোলাপাড়া করিতেছি;—সম্মুখেই দেখি, ত্রিশূল হস্তে মহিষমর্দ্দিনী বেশে যেন রোষে

উন্মাদিনী দেবীরাণী! গোবিন্দলালকে বলিতেছেন, "আমার সুমুখে আর নরহত্যা রক্তপাত ক'রোনা। ওরা আর কোথায় যাবে? আমার জালে যখন পড়েছে, তখন ওদের আর পালাবার পথ কোথা? আর যা কত্তে হবে, এখনি কর।" আর দাঁড়াইলেন না, আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই আর কোন কথা না কহিয়া সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দলাল আমাকে কহিল, "শীগগির শীগগির আসুন।" আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া বনপথ ধরিয়া পূর্ব্বে যে খালের ধারে আমি অশ্ব সহিত উপবিষ্ট ছিলাম, তাহার কিছু দূরে আসিয়াই দেখি——আমার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে আব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল! চতুর্দ্দিক ধূমাকারময়! একি দেখি!! এ্যাঁ এ্যাঁ দাদা! দাদা!! আমার নির্ম্মল দাদা!!! দেবনারায়ণবাবুর এক মাত্র নিরুদ্দিষ্ট কুমার নির্ম্মলকুমার? কি সর্ব্বনাশ! ইনিই কি তবে এই ভাঙ্গা বাড়ীতে এতকাল আবদ্ধ ছিলেন? দয়াময়ী দেবীর তবে কি ইঁহাকেই উদ্ধার করিবার জন্য এত বড় কৌশলের অবতারণা? ধন্য ধন্য তুমি দয়াময়ি! ধন্য তোমার দয়ালু প্রাণ! অনর্গল আনন্দাশ্রু নয়ন যুগলে প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না, যেন নিশ্চল হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলাম।

গোবিন্দলাল কহিল, "আপনার ভাব দেখে বুঝেছি, এ ভাব স্বতঃই মানুষের মনে হ'তে পারে! উঠুন, এমন সব জায়গায় এমন অকর্ম্মণ্য হ'লে চল্‌বে না। দেখ্‌চেন ত বালিকা হয়ে আমাদের দেবীরাণী কত বড় বীর, কতদূর মনের বল! শুনুন্, এখন আপনাকে আমাদের মাননীয়া দেবীর অনেক গুলি হুকুম পালন কত্তে হবে। ঐ যে বাবুটি যেন কাহার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে অবশ্যই চিন্‌তে পেরেছেন। ওঁরে উদ্ধারের জন্যই আজ এত বড় কাণ্ড। কোন কারণে আপনি ওঁকে ধরা ছোঁয়া দেবেন না! ওঁকে দেখে যেন বালকের মতন অস্থিরতা দেখাবেন না। আপনার ছদ্মবেশের কারণই এই। ওঁর যত বড়ই তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকুক

না কেন, 'আপনাকে বোবা বোলেই জান্‌বেন, তাই বোলেই ওঁকে আপনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা দু'জনে ঘোড়ায় ক'রে যে পথ দিয়ে এসেছেন, সেই পথ ধ'রে বরাবর চ'লে যান, আপনি বুদ্ধিমান যুবক, অবশ্য সে রাস্তা চিন্‌তে পার্‌বেন, যদি ভুলে যান্‌, সে আপনিই বুঝ্‌বেন; ভুলের দরুণ যে ঘটনা ঘট্‌বে, সে আপনার; তাতে আর কেউ দোষী হ'তে পারবে না। যে কুটীরে কাল রাত্রে ছদ্মবেশ ধরেছিলেন, সেইখানে আমাদের না যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌বেন, ঘোড়াটাকে বনের মধ্যে ছেড়ে দিবেন, ওঁকে চ'লে যাবার ইঙ্গিত কর্‌বেন। যা যা বল্লেম সব মনে রাখ্‌বেন, একটি কথাও ফেল্‌বেন না, একটিও ভুলবেন না! এখন আসুন, আপনাদের যাবার উদ্যোগ ক'রে দিই গে।"

আমি অবনত বদনে ধীরে ধীরে তাহার সহিত চলিলাম। হায়! এতকালের পর নির্ম্মলদাদার সহিত সাক্ষাৎ হইল, মুখ ফুটিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিলাম না, তাঁহাকে ধরা দিবার আমার অধিকার নাই, মুখ চিনাইবার আদেশ নাই, তাঁহার সম্মুখে অবনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গোবিন্দলাল নির্ম্মলকুমারের কাণে কাণে কি কথা বলিয়া দিল, গোবিন্দলালের সঙ্কেতে আমরা উভয়ে অশ্বরোহণ করিয়া যে রাস্তা ধরিয়া গত কল্য রাত্র হইতে আসিয়াছিলাম, সেই দুর্গম পথ কষ্টে চিনিতে চিনিতে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল। নিদ্রা ত জীবনের মত আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, স্নানাহারের কোন নিদর্শন নাই, একে পথ ক্লেশ, তায় দারুণ উৎকণ্ঠা, তাহার উপর স্নানাহার নাই। সহৃদয় পাঠক! ভাবুন দেখি কি দুর্ব্বিসহ অপার যন্ত্রণা আমার! আমার সুহৃদ্‌ হইতেও সুহৃদ্‌, প্রাণাধিক প্রিয়তম নির্ম্মলদাদা আমার এখন সঙ্গী; কিন্তু এমনি ঘটনা বৈচিত্র্য, তাঁহার সহিত কথা কহিবার, অধিক কি মুখ দেখাইবারও আমার যো নাই। একি কম কষ্ট কম যাতনা! কি করি, অমি নির্ব্বাক মুকের মত তাঁহার পথপ্রদর্শক। যাইতে যাইতে নির্ম্মলকুমার কেমন একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া দেখেন, আমি রোমে রোমে কম্পিত হই! একবার মনে

হয়, নির্ম্মলদাদার গলা ধরিয়া ক্ষণেক কাঁদি, তাঁহার সাংসারিক দুরবস্থার কথা একবার শ্রবণ করাই, তাঁহার পিতা মৃত কি জীবিত জানি না, তাঁহার সকল কথাই বলিয়া ফেলি, তাঁহার গৃহত্যাগের পর হইতে এতাবৎ ঘটনা যাহা আমার ঘটিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে সমস্ত বলিয়া আমার কষ্টের লাঘব করি, কিন্তু বলিতে পারি না, জিহ্বা জড়াইয়া যায়, ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠি, দেবীর উপদেশ দেবীর বাক্য হেলন করিতে পারি না।

বেলা প্রায় পাঁচটা, দারুণ পরিশ্রান্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গত রজনীর কুটীরের নিকট আসিলাম। মনে একটু ভয় হইল, বুঝিবা নির্ম্মলকুমারের নিকট আমার সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে! কপাল ঘর্ম্মাক্ত, মুখের রং বুঝি ঘর্ম্মের সহিত গলিয়া পড়ে; কিন্তু বেশকারের এমনি কৌশল, কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, স্বেদজল ভিন্ন একটুও রং আমার হাতে লাগিল না।

কুটীরের নিকট আসিবা মাত্র আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম, নির্ম্মলকুমারকে সঙ্কেত করিতে হইল না, তিনি একবার আমার দিকে চাহিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন, নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। কতকক্ষণ আমি সেই পথ চাহিয়া রহিলাম, নির্ম্মলকুমার আমাকে নিরাশ্রয় নির্ব্বান্ধব করিয়া উধাও হইয়া উড়িয়া গেলেন। একান্ত ভগ্নমনে ঘোড়াটিকে জঙ্গল মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নমনে কুটীরের নিকট অগ্রসর হইলাম। আমি এতদূর পরিশ্রান্ত, বাতাসের ভরে যেন পড়িয়া যাই। তার উপর কৃত্রিম বেশ ভূষা; হস্তে মুখে চক্ষে রংয়ের প্রলেপ, আমার অসহ্য দুর্ব্বহ কষ্ট। কিয়ৎক্ষণ মৃতবৎ হইয়া দাওয়ায় পড়িয়া রহিলাম। অনেকক্ষণের পর কাননের স্বাধীন মুক্ত বাতাসে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। উঠিলাম, আমার নিকটে কুটীরের চাবি ছিল, দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পায়জামা, মেরজাই, টুপি, পরচুল প্রভৃতি সমস্তই একে একে খুলিলাম। একটু যেন কষ্টের ভার কমিয়া গেল। তারপর মুখের রং তুলিবার প্রক্রিয়া ত জানা নাই, কি করিলে আমার স্বাভাবিক আদি রং ফিরিয়া পাই? যে পর্য্যন্ত জামা পায়জামা আমার অঙ্গে ঢাকা পড়ে, সে পর্য্যন্ত রং ছিলনা, কেবল গ্রীবা হইতে মুখমণ্ডল, দুই বাহু আর জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত, এই সকল অঙ্গই রংয়ে রূপা-

স্তরিত। জালা হইতে জল তুলিলাম, বিশেষ মনোযোগের সহিত হাতের রং তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কোন রকমেই উঠিলনা, তৈলাক্ত তরল দ্রব্যের উপর জল ঢালিলে জলের যে দশা হয়, তাহাই হইতে লাগিল,—জলে এ রং উঠিবার নয়।

রং তুলিবার আশায় ছাই দিয়া আহার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। গোবিন্দলালের যেরূপ সুবন্দোবস্ত, তাহাতে যে একজন ব্রাহ্মণসন্তান অনাহারে থাকিবে, ইহা কখনই মনে হয় না; অবশ্যই কুটীর মধ্যে কোন না কোন স্থানে অন্ততঃ এক জনের মতনও আহার্য্য আছে, দেখি, আমার এ কল্পনা সত্য কি মিথ্যা। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যই একটা তাকের উপর সরা চাপা প্রচুর পরিমাণে ফলমূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। যদিও আমি আহারের অনুমতি পাই নাই, কিন্তু কি করি, ক্ষুৎপিপাসার অসহ্য যাতনায় তখন আমি জ্ঞানশূন্য, হাত মুখ ধুইয়া কিছু শান্ত হইয়া সেই ফলমূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি তিন ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ পরম পরিতোষরূপে আহার করিলাম, যেন মৃত শরীরে আবার নব প্রাণ নব বল ফিরিয়া আসিল। আমিই জগতের চক্ষে ধরা পড়িয়াছি বলিয়া, দিন আর কাহারও হাত ধরা নয়; দেখিতে দেখিতে বেলা টুকু কাটিয়া গেল, দিনের আলোটি যেন আমার ভয় ভীত প্রাণের ক্ষুদ্র আলোটি লইয়া অন্ধকারে নিবিয়া গেল; দিনও অন্ধকারে আত্মহারা, আমিও অন্ধকারে আত্মহারা।

ক্রমেই রাত্রি গভীরা হইতে লাগিল, নিস্তব্ধতা আসিয়া বনপ্রদেশ গ্রাস করিয়া ফেলিল। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি বাড়িয়া উঠে, কেহই আসে না, আমি একাকী অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীরে। আলোক নাই, প্রজ্জ্বলনের কোন উপকরণ নাই, অন্ধকারে ভয়ে আমি যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। এ অন্ধকারে কি একটিবারও আলো জ্বলিবে না? এক দিনের জন্যও কি বিপদ আমাকে ভুলিয়া থাকিবে না? আমার যতদূর পরমায়ু ততদুর কি নিগ্রহ বিপদময়? জানি এ জীবনে পিতামাতা পাইব না, সংসার জানি না, আমি পথের ভিখারী, পথে পথে ভিক্ষা করিয়া এই পোড়া প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিব, বিধাতা যে কেন আমায় এ পাপ সংসারে পাঠাইয়াছেন, যদিও তাহা

জানি, কিন্তু তবে স্বাধীনভাবে বেড়াইতে পারিব না কেন? পথের ভিখারী হইলে কি এমন বিপদে পড়িতে হয়? একটার পর একটা বিপদ, আমার পক্ষে কি অবশ্যম্ভাবী? দেখ, এ আবার কি বিপদ! কেহ সঙ্গী নাই, অজানিত অশ্রুতপূর্ব্ব স্থানে আমার কেহ সঙ্গী নাই। দেশের নাম জানিনা, কি দুর্গম স্থানেই আমি নিপতিত, কোথায় যাই? পথ চিনি না, তবে আমি যাই কোথায়? থাকি, এই দাওয়ার মাটীর সহিত মিশাইয়া থাকি! বক্ষে বল বাঁধিয়া বসিয়া বসিয়াই এই কাল রাত্রিটা কাটাইয়া দিই, কেহ আসে ভালই, না আসে, যেমন আছি তেমনি থাকি।

তন্দ্রায় তন্দ্রায় ভয়াবেশে দাওয়ার উপর পড়িয়া অন্ধকার রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম।

প্রকৃতির সুনিয়মে সূর্য্যোদয় হইল, কিন্তু আমার নয়। চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, রাত্র, অমা, পূর্ণিমা আমার সব সমান। সূর্য্যোদয় হইল, জগতের জড়তান্ধকার নষ্ট হইল; কিন্তু আমার জড়তান্ধকার পূর্ব্ববৎই রহিল। তবে নূতন কথা এই, ব্যাঘ্র, ভল্লুকে আমাকে ছিঁড়িয়া খায় নাই, নররাক্ষসে আমাকে গ্রাস করে নাই, আকস্মিক আর কোন নববিধ বিপদ ঘটে নাই, অপেক্ষাকৃত শান্তিসমুদ্রে মগ্ন হইয়া আপনাকে একটু লুকাইয়া ছিলাম, পৃথিবী যেন আমার সন্ধান পায় নাই।

একটু বেলা হইলে গোবিন্দলাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আঃ আমি যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, আগ্রহে আগ্রহে কত কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দেবীরাণীর সংবাদ তন্মধ্যে আমার প্রধান প্রশ্ন।

গোবিন্দলাল কহিল, "দেবীরাণী ভাল আছেন, তাঁর জন্য কোন চিন্তা নাই। একটা ঘটনা চক্রে পড়িয়া কাল আমরা আর ফিরে আস্‌তে পারি নি। আপনার বড় কষ্ট হয়েছে তা আমরা জানি; আমাদের মাফ্ কর্ব্বেন, দেবীরাণীর এই হুকুম। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কাল যার সঙ্গে আপনি ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন, তাঁকে ত আপনি ধরা দেন নি? তিনি ত কোন রকমে আপনাকে জান্‌তে পারেন নি? ঠিক্ ক'রে বল্‌বেন, ইতিমধ্যে তার উপায় হ'তে পার্‌বে।"

আমি কহিলাম, "ঈশ্বরের শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, তুমি যা যা আমাকে ব'লে দিয়েছিলে, ঠিক ঠিক আমি তা পালন ক'রেছি, একটিরও এদিক ওদিক করি নাই। আমি বিশ্বাসঘাতক নই, তা তুমি নিশ্চয় জেন গোবিন্দলাল!"

গোবিন্দলাল। "না না সে কি কথা, অমন কথা বল্‌ছেন কেন? তবে কথা এই যে, যদি কোন রকমে তিনি জেনে থাকেন, তা হ'লে না কি এখনো কোন উপায় হ'তে পারে, এই জন্যই আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা,—তা ভালই হয়েছে। কাপড় চোপড় সব খুলেছেন দেখ্‌ছি, রং কিন্তু ওঠাতে পারেন নি কেমন?"

আমি। "না অনেক চেষ্টা করেছি, কোন রকমেই রং তুল্‌তে পারি নি! তোমার এ রং উঠ্‌বে ত? না চিরকাল এই রকম সেজে থাক্‌তে হবে?"

গোবিন্দলাল। "রং তোল্‌বার একটি সামান্য জিনিস আছে, সেটি না মাখালে কার সাধ্য তোলে? আমাদের দেবীরাণী এতকাল বালক সেজে ছিলেন, কিন্তু কখন কি চিন্‌তে পেরেছিলেন? আসুন, আপনাকে পরিষ্কার ক'রে দিই।"

চৌকির উপর যে শুষ্ক বন্য-লতার একটি ডাল পড়িয়াছিল, সেই পাতার রস যেখানেই মাখাইতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইতে লাগিল! স্বাভাবিক রং ফিরিয়া পাইলাম, আমি যে ব্রজেন্দ্র সেই ব্রজেন্দ্রই হইলাম।

গোবিন্দলাল এখানে আহার করিবে না, তাহার কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, আমাকে আহারাদি করাইয়া সে নিমন্ত্রণে যাইবে। গোবিন্দলাল পাকের উদ্যোগ করিয়াছিল, আমি পরম পরিতোষে স্বপাক অন্ন ব্যঞ্জন উদর পূর্ত্তি করিলাম।

আহারাদি সারিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় আমার দাওয়ার উপর উপবিষ্ট হইলাম। আমি কহিলাম;—"গোবিন্দলাল! তোমাদের কৃপায় এখন এক রকম বেঁচে গেলেম। এখন যাই কোথা? দেবনারায়ণ-বাবুর ত কোন সংবাদ পেলেম না, তিনি বেঁচে উঠেছেন কি না, তাও জানতে পাল্লেম না! নির্ম্মল দাদা যে কোথায় গেলেন, তাও বল্লে না,

যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই আমায় রাখ্‌লে। এখন বল কি করি, কোথায় যাই ?"

গোবিন্দলাল কহিল, "আজ আর কোথাও যাবেন না, চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর বেড়াচ্ছে, আবার ধরা পড়্‌বেন ; আপনি এখনো নিরাপদ ন'ন ভাবুন, কাল সকাল পর্য্যন্ত এই কুটীরেই আপনাকে থাকতে হবে ; হয়ত আজ সন্ধ্যার মধ্যেই দেবীরাণী এখানে আস্‌বেন। তিনি যে রকম হুকুম করেন, সেই রকম হ'বে ; এখন আপনাকে একলা এইখানে থাকতে হ'বে। কুঁড়ের মধ্যে বিছানা করে দিই গে, একটু ঘুমাবেন আসুন।"

রং হাঁড়ী সরা প্রভৃতি সরাইয়া গোবিন্দলাল সেই চৌকির উপর একটু বিছানা করিয়া দিল। সে নিমন্ত্রণে প্রস্থান করিলে, আমি কুটীরের দরজা বন্ধ করিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় একটি মধুর গীতধ্বনি শুনিয়া আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। গীতটি অতি চমৎকার, এখনও বেশ স্মরণে আছে ;—

গীত।*

বিজনে সজনে দেশে কি বিদেশে,
বিরহ হুতাশে মিলন আবেশে,
যখন যে বেশে যে ভাবে থাকি
সদাই তোমারে চাই।
কাছের মিলনে যত না পেয়েছি,
দূরের আড়ালে সব তা জেনেছি,
কাছে থেকে কভু হয়না ভাবনা,
দূরের ভাবনা চাই।

* মুলতান মিশ্র——একতালা।

মিলনের যত সুর গাথা গুলি,
উৎস বহিয়ে দে'ছ প্রাণ খুলি,
সে ত কাছে ব'সে মুখে মুখে চেয়ে
কত কথা তুমি ব'লেছ ;—
সেই ভাব সেই কথা সে কবিতা,
সেই নানা ভাবে কবিতার গীতা
দূরে ব'সে যদি সব ভেবে পাই,
কাছে ব'সে কেন চাই ?
নিকটে যাবনা তুমিও এসনা,
দূরে থেকে দোঁহে করিব ভাবনা,
হে ভাবময়—ভাবের পাগল !
ভাব দিয়ে কেন ভাবনা ?
বিরহের চেয়ে মিলন কি ভাল—
স্মৃতিটির চেয়ে তাকি আর ভাল ?
তোমা চেয়ে তব স্মরণীয় গুলি,
তাহাই কেবলি চাই।

গান শুনিয়া আমি বিকলচিত্তে দ্রুতবেগে উঠিয়া একেবারে বাহিরের দাওয়ায় আসিলাম। আমরি ! মরি ! সেই গান—সেই আওয়াজ ! দয়াময়ী দেবীরাণী আসিতেছেন। না, না, আজ সে মূর্ত্তি ন'ন,—আজ আর সন্না-সিনী দেবী বীরজামূর্ত্তি ন'ন, আমার প্রাণের বাসনা সেই বালকমূর্ত্তি ! নীরবে একাকী ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার অনুপম রূপ-সৌন্দর্য্য আমি আকুল অন্তরে তাঁহাকে অভ্যর্থনার কারণ কিয়দ্দূর গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বালক আসিয়া কহিলেন, "আজ যদি আর একটা অঘটন ঘটনা দেখ্‌তে চাও, তবে এখনি এই পূর্ব্বদিকের রাস্তা ধ'রে বরাবর যাও ; একটি বাজার দেখ্‌তে পাবে, সেই বাজারে, আজ একটি নূতন রকমে খরিদ বিক্রী হবে। এমন কেনা বেচা কখন দেখনি। যাও, আর দাঁড়িওনা।"

আমি কহিলাম, "তুমি যাবেনা ?"

বালক। "না, তোমাকে একাই যেতে হবে। আর দেখ, সেই জিনিসের খরিদ্দারটা কে হয়, বেশ ক'রে দেখে রেখো। যাও, আর দাঁড়িওনা।"

আমি। "আমি ফিরে এসে আবার তোমার দেখা পাব ত ?"

বালক। "সে ভগবানের হাত! দেখা না হওয়া, এখনকার দিনে কেউ বল্‌তে পারে না। আর সময় নষ্ট ক'রনা।"

আমি আর দাঁড়াইলাম না, দেবীরাণীকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বমুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভাবিতে লাগিলাম, কি আবার অঘটন ঘটনা ? জানি না, দেবীরাণী জানেন, দেবীর প্রতিভা জানেন। আহা! ধন্য দেবী-প্রতিভা!

অষ্টাদশ চক্র।

বিসর্জ্জনে আনন্দমিলন।

স্থানের নাম শুনিলাম দেবগ্রাম। এই কি তবে সেই দেবনারায়ণবাবুর দেবগ্রাম ? দেববাবুর অট্টালিকা হইতে তবে কি আমি এত নিকটে আছি ? এত নিকটে থাকিয়া দেববাবুকে লইয়া তিন রাত্র জাগিয়া বসিয়াছিলাম ? কি আশ্চর্য্য! কোনরূপে তাহা বুঝিতে পারি নাই। একি! এইত সেই বাজার! দেববাবুর এইত দেববাজার! এই বাজারেই তবে কি কোন অঘটন ঘটনা ঘটিবে ? এই বাজারেই তবে কি কোন অপূর্ব্ব বস্তু বিক্রয় হইবে ? বীরজা-দেবী বলিয়াছেন, 'এমন বিক্রয় আর কখন দেখি নাই।' দেখি, কি অভূতপূর্ব্ব বিক্রয়!

ভাবিতে ভাবিতে বাজারের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। লোকে-লোকারণ্য, বাজারের ভিতর প্রবেশ করে কার সাধ্য! জনস্রোতঃ দেখিয়া দ্বিগুণতর সন্দেহ কৌতূহল বাড়িল! অনেক কষ্টে বাজারের পথে প্রবেশ করিতে পারিলাম। আমার জীবনের পরম বৈরী সেই শ্বশুররূপী দস্যুর বেণের দোকান বন্ধ দেখিলাম, তাই রক্ষা,—নচেৎ দোকান খোলা দেখিলে, এই জনতার মধ্যে আমাকে হাঁফাইয়া মরিতে হইত। কষ্টে স্বষ্টে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে আর একটু ভিতরে অগ্রসর হইলাম। হায় হায় আবার সেই! আমার শ্বশুররূপী সেই রায় মহাশয়, শঙ্কর আর দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি সেই জনতার এক স্থলে দাঁড়াইয়া মহাব্যস্তে কিসের পরামর্শ করিতেছে! কি সর্ব্বনাশ! এরা আবার এখানে কেন? কিসের পরামর্শ করে? ধাঁ করিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িয়া একেবারে সেই জনস্রোতের মধ্যে মিশাইয়া গেলাম, মনে ভয়ানক ভয় হইল! যথা সাধ্য বল প্রয়োগের সহিত একেবারে সেই ঘটনার স্থলের এক পার্শ্বে লুকাইয়া একি নিদারুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিলাম! মলিনবেশে ম্লানমুখে দেবনারায়ণবাবু তাঁহার পত্নীর হাত ধরিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন। এত ভিড়ে—লোকের এত কলরবে আমি কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। মন প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মহাজ্ঞানী দেবনারায়ণবাবু আজ এমন জ্ঞানশূন্য কেন? তিনি পত্নীকে আজ প্রকাশ্যে এত লোকের মাঝখানে আনিয়াছেন কেন? হায়! দেবনারায়ণবাবুর আর সে চেহারা নাই, আজ দেববাবু যেন প্রকৃতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ধন্য দেবীরাণি! তোমার অসীম দয়ায় আজ দেববাবুকে জীবিত দেখিলাম। কি করি? কিরূপে দেববাবুর মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পারি? একটু একটু করিয়া তথায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখন দেববাবুর নিকট আর ধরা দিবনা, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইব না। আগে বুঝি, তবে সেই মত কাজ করিব।

সুবিধামত একটু নিরালা স্থান পাইলাম। দেববাবুর ঠিক পশ্চাতে, একটু দূরে দুই খানি খোড়ো ঘরের নিম্ন ছাঁচতলায় একটু নর্দ্দামার মত আছে, তাহারি এক পাশে একটু গা ঢাকা হইয়া দাঁড়াইলাম। এখন দেবাবুর

প্রতিশব্দ বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতেছি। দেববাবু কম্পিতকণ্ঠে বলিতেছেন, "এখানে যত ভদ্রলোক উপস্থিত হয়েছেন, সকলেই এই অভাগার কথা শুন্থন; এই যে কালভুজঙ্গিনী সদৃশী যুবতী দেখ্ছেন, ইনি আমার তৃতীয়-পক্ষীয়া পত্নী। যতদিন অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন ছিলাম, ততদিন এঁর সতীত্ব-সৌরভে আমি বিমোহিত, এঁর সেবা শুশ্রূষায় পতিভক্তিতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলাম। আমি এমনিই অপদার্থ অসার, এঁর ভাণ ছলনাময় সতীত্বের উপর সত্য বিশ্বাস রেখে, আমার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র নির্ম্মলকুমারকে পরিত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! এ পাপিনী এত বড় নরকের কীট, আপনি বিমাতা হয়ে আপনার অপত্যবৎ সপত্নীপুত্রের প্রতি দুর্ম্মদ পাপ কথা প্রকাশ করে; সে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান্, এই সংঘাতিক পাপ কথা কর্ণে প্রাণে ধারণ কত্তে না পেরে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য চুপি চুপি দেশ ত্যাগ করে। ব্রজেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি অনাথ নিরাশ্রয় হতভাগ্য যুবক, প্রতিপাল্য স্বরূপ আমার বাটীতে থাকৃত, সে নির্ম্মলকুমারের পরম সুহৃদ্, তাকে এই সমস্ত কথা ব'লে আমার অন্ধের নয়ন স্বরূপ প্রিয়-পুত্র নির্ম্মল কোথায় পথের ভিখারী হয়ে বেড়াচ্চে। এই কুলকলঙ্কিনীর মোহে তাকেও ভুলে আছি। হায় হায়, চক্ষু থাকৃতে আমি এতই অন্ধ—জ্ঞান থাকৃতে আমি এতই অজ্ঞান, এই দুশ্চারিণী আমার একটা পুরাতন ভৃত্যের সহিত পাপ প্রণয়াসক্তা! আমাকে পুত্রহীন ক'রেও এ কুলটার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই, একদিন—একদিন আমাকে বিষ পর্য্যন্ত খাইয়েছিল। কিন্তু কেন জানিনা, কোন্ ছদ্মবেশী দেবতার অনুগ্রহে আমার প্রাণত্যাগ হ'ল না!! আমি পুনর্জ্জীবন পেয়েছি বটে, কিন্তু এই দুষ্টার জন্য পাপসংসারে থাকৃতে আর আমার তিলমাত্রও ইচ্ছা নাই! এই জনতার মধ্যে আমার শুভানুধ্যায়ী সহৃদয় অনেক আছেন, তাঁরা বলুন, এই বিশ্বাসঘাতিনী দুশ্চারিণীর কোন্ ব্যবস্থা উচিত!!"

জনতার মধ্যে একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "তুষানল এ পাপের পূর্ণ ব্যবস্থা! অথবা 'মা ব'লে' জন্মের মতন পরিত্যাগ।" সমস্ত লোকেই এ কথার অনুমোদন করিলেন।

দেববাবু যেন দুর্দ্দম উচ্ছ্বসিত বেগ ধারণ করিতে পারেন না! উন্মাদের মত বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তবে তাই হোক্,—এই স্থিরবুদ্ধি প্রাচীনের মহাবাক্যই সফল হোক্! সকলে তবে শুনুন, আমি যথার্থ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে নারায়ণের নাম স্মরণ পূর্ব্বক একান্ত মনে এই সত্য বাক্য উচ্চারণ কচ্ছি, অদ্যাবধি এই মুহূর্ত্ত হ'তে এই পতিঘাতিনী পাপিনীকে "মা" বোলে পরিত্যাগ কল্লেম! এঁর সহিত আজ থেকে আমার কোন সম্বন্ধ রইল না। এই অসংখ্য লোকের মধ্যে যাঁর সহিত যেখানেই যেতে চান, আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে অনুমতি কচ্ছি, স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নাই!"

দেববাবুর এই হৃদয়-বিদারক বাক্যে আপামর সাধারণ সকলেই নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! আমি জনতা হইতে কিয়দ্দূরে আছি, সুতরাং তাঁহার পত্নীকে ভালরূপে দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহার অবস্থা তখন কিরূপ, তাহাও জানিনা। অপরাহ্ণ হইয়া আসিতেছে, দিনের আলোও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে! কি হইতে কি হইল জানিনা, একটা গোল উঠিল, "আহা ধর ধর—মেয়েমানুষটা মোলো বুঝি!" আমার সম্মুখস্থিত সমস্ত লোকই এই বলিতে বলিতে তাঁহাদের দিকে ছুটিল। আমারও বড় ধাঁধাঁ ঠেকিল, থাকিতে পারিলাম না, সেই দিকে ছুটিলাম। দেখিলাম, জয়কালী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন! আহা, মনে বড়ই দুঃখ হইল; যদিও জয়কালীর পক্ষে এই দণ্ড উপযুক্ত, তত্রাচ স্ত্রীলোক বলিয়া আমার কেমন বড়ই মায়া হইতে লাগিল! আহা, হাজার হউক স্ত্রীলোক!

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বজ্রাহত ভাবে দণ্ডায়মান। তাঁহার যেন তখন বাহ্যজ্ঞান বাহ্যদৃষ্টি কিছুই নাই! ভোর হইয়া কি অনন্ত চিন্তায় চিন্তিত! এমন সময় উঃ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ভিড়ের মধ্য হইতে দুই জন যমদূতের মত মুখস্‌ধারী ছদ্মবেশী তীরবেগে আসিয়া জয়কালীকে স্কন্ধে করিয়া চকিতের ন্যায় সেই ভিড়ের মধ্যে বেমালুম সরিয়া গেল। বাজার শুদ্ধ সমস্ত লোকই অবাক্। কেহ বাধা দিতে পারিল না,—এমন কি কেহ একটি কথাও কহিতে পারিল না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই কোটীপদধূলির উপর বসিয়া পড়িলেন। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া দেব-

বাবুর পদতলে লুটাইয়া পড়ি। আহা, এ সময় নির্ম্মলকুমার কোথা? তিনি ত এখন এ দেশে আছেন, এত বড় একটা রোমহর্ষণ শোক অভিনয় হইতেছে, ইতর ভদ্র দেশের প্রায় সমস্ত লোকই এ স্থলে উপস্থিত, এমন সময়ে তবে তিনি কোথা? আহা, এই মুহূর্ত্তমধ্যে যদি তিনি আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার পিতার ক্ষতবিক্ষত সন্তপ্তচিত্তে কতকটা শান্তি-বারি বর্ষিত হয়!

দুইজন অজ্ঞাত ছদ্মবেশী কর্ত্তৃক জয়কালী অপহৃতা হইলে পর, বাজারের ইতর সাধারণের ভিড় গণ্ডগোল অনেকটা কমিয়া গেল। দেববাবু বাজারের ঠিক্ মধ্যস্থলে আছেন, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দেবগ্রামের প্রায় শতাবধি মান্য গণ্য ভদ্র লোক দাঁড়াইয়া আছেন। সকলেই হা হুতাশ করিতেছেন, সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। কিয়ৎক্ষণ পরে দেববাবু চীৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আহা, তাঁহার সেই বিদীর্ণহৃদয়সম্ভূত কাতর চীৎকারে কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিলনা, মহাকঠিন পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া গেল!

দেববাবু কহিয়া উঠিলেন, "অতঃপর আমাকে দেখে সকলে সাবধান হও, ভ্রমেও কখন কেউ স্ত্রীলোকের কুহকে পড়োনা। বৃদ্ধবয়সে জেনে শুনে কখন মায়াবিনীদের মায়া-ফাঁদে পা দিও না, আমার মত মহা-যন্ত্রণাগ্রস্ত হবে, আমার—ওহো প্রাণের নির্ম্মলকুমার রে! বাপ্ রে! কোথায় তুই? আয় বাবা! তোর বুড় বাপকে একবার দেখা দে! তোর জলন্ত শোক আর সহ্য কত্তে পারছিনা! আমার কণ্টক ঘুচেছে! পাপ বিষবৃক্ষ আজ সমূলে পড়েছে, তুই যে আমার চন্দনতরু, আয় বাবা, একবার আয়, আমার এই দগ্ধবক্ষে একবার মলয়ার হাওয়া দে! আমি কুহকিনীর কুহকচক্রে প'ড়ে তোকে বুঝ্‌তে পারিনি বাপ! নইলে তোর মত উজ্জ্বল অমূল্য রত্নকে আমি ইচ্ছা ক'রে বিসর্জ্জন দিয়েছিরে! কে যেন বল্‌ছে,—কে যেন আমার বুকের মধ্যে এসে স্পষ্ট স্পষ্ট বল্‌ছে, "নির্ম্মল কোথাও যায়নি, নির্ম্মল এইখানেই আছে, নির্ম্মল তার বাপ্‌কে পরীক্ষা কচ্ছে"। আর পরীক্ষা দিতে পারিনি বাবা! যদি হেথায় থাকিস্, আয়, আমার সুমুখে একবার

আয়, আমি তোর কাছে মাফ্ চাচ্ছি, তোর বুড় বাপ্‌কে ক্ষমা দে রে! নির্ম্মল রে! আর সংসারে যাব না! এই উইল নে, আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, নগদ টাকাকড়ি, বাগান বাড়ী প্রভৃতি আমার পৈত্রিক কিম্বা স্বোপার্জ্জিত যা কিছু আমার বল্‌তে আছে, এই উইলে সে সমস্তই লিখে গেছি! তোর রাজত্ব তুই নে! আমাকে ক্ষমা দে, কোথায় তুই? আয় বাপ্, আয়!—"দেববাবু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে একটা যেন যুগান্তর উপস্থিত হইল, দুইশত চক্ষু অস্ফুট কল্লোলে এবং মহা কৌতূহলের সহিত বাজারের উত্তরদিকে অনিমেষ চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম, আর একটা কি নূতন ঘটনা আসিতেছে! ওরে, একি দেখিলাম! সজলনয়নে কম্পিতপ্রাণে ভগ্নচরণে শোকার্ত্ত দেববাবুর একমাত্র হারান ধন নির্ম্মলকুমার ধীরে ধীরে আসিতেছেন। সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বলিয়া উঠিলেন, "দেববাবু! উঠুন, চেয়ে দেখুন, নির্ম্মলকুমার এসেছেন—নির্ম্মলকুমার এসেছেন! আঃ! ভগবান রক্ষা করেছেন!"

দেববাবু পাগলের মতন কহিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, এলিরে! নির্ম্মলরে! এতদিনের পর বুড় বাপকে মনে পড়্‌ল! কৈ! কোথা তুই?" পাগলের ন্যায় দুই বাহু বিস্তার করিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন।

চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের মত দেবনারায়ণের বক্ষে নির্ম্মলকুমার বেগে আসিয়া পড়িলেন। দু'জনেই দু'জনের স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া রহিলেন, দু'জনেরই অশ্রুজলে স্কন্ধ বক্ষঃ প্লাবিত হইতে লাগিল। পিতা পুত্রে সে যে কি অদ্ভুত শোকময় মিলন! যিনি একবার দেখিয়াছেন, জীবনে কখনও তিনি ভুলিতে পারিবেন না। যথার্থ, সকলকারই একচক্ষে আনন্দ—আর চক্ষে শোকাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিনা, দু'জনের মধ্যে গিয়া পড়ি, আর একটা স্রোতঃ উথলিয়া উঠুক। যেমন দুই পদ অগ্রসর হইয়াছি, সর্ব্বনাশ! আচম্বিতে যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল! দেখিলাম, আমার শ্বশুর আর নরাধম সেই শঙ্কর উভয়ে মুড়ি স্মুড়ি দিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে! প্রথমটা ভয়েই ত আমার আত্মাপ্রাণ শুকাইয়া গেল! যেখানকার আমি সেইখানকার মাটীর সহিত মিশাইয়া রহিলাম! হায় হায়,

এখানেও সেই উৎপাত—এমন সময়েও দারুণ বিড়ম্বনা! দূর হউক, আর ভয় করিলে চলিবে না, এত ভয় কি? এই এত লোকের মধ্যে ওরা দুইজন আমার কি করিতে পারে? ধরাইয়া দিই, দেববাবুকে বলিয়া দিই, ঐ সেই পাষণ্ড শঙ্কর আর আমার মহাবৈরী রায়মহাশয়, গোপনে কি অভিপ্রায়ে বেড়াইতেছে! তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া টিপি টিপি পাশ কাটাইতে আরম্ভ করিলাম, আমার কাণের কাছে কে যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিয়া গেল! কি বলে? কে এ ব্যক্তি? ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ চাহিলাম, দেখি দূরে জনতার মধ্যে গোবিন্দলাল ইঙ্গিতে তাঁহাদের দিকে যাইতে নিষেধ করিতেছে। কেন? ইহার তাৎপর্য্য কি? যে দেবনারায়ণবাবুর দুর্গম অভয়দুর্গ মধ্যে এতদিন নিরাপদে লুকাইয়া ছিলাম, তাঁহার নিকট গিয়া প্রাণ বাঁচাইব, ইহাতে গোবিন্দলাল নিষেধ করে কেন? গোবিন্দলালের দিকে আবার চাহিলাম, আবার সেও সেইরূপ নিষেধ ইঙ্গিত করিল! এবার তাহার তীব্র ইঙ্গিতে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, ভয়চকিতে তথায় নীরবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

দেবনারায়ণবাবু আর কিছুতেই সংসারে পুনঃপ্রবেশ করিতে চাহেন না; এইখানেই নির্ম্মলকে উইল দিয়া, তাঁহাকে একমাত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু উপস্থিত ভদ্রগণের প্রবোধ বিনয়ে, নির্ম্মলকুমারের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে, তাঁহার কর্ম্মচারিগণের আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া অগত্যা নির্ম্মল-কুমারের হাত ধরিয়া তখনকার মত বাটী ফিরিয়া গেলেন, জনতাও ক্রমশঃ তৎসঙ্গে মিলাইতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যারও পূর্ণ আবির্ভাব, চতুর্দ্দিকের দীপমালা দোকানে জ্বলিয়া উঠিল!

আমি একখানি মলিন ছায়ার মত সেই বাজারের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কি করি, কোথায় যাই? মনে দারুণ অশান্তি, কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিনা। হায়, আমার কোন দিকেই সুখ নাই, পিতাপুত্রে এমন অপূর্ব্ব আনন্দমিলন হইল, আমি এমনই দুরদৃষ্ট, এই অতুল আনন্দে যোগ দিতে পারিলাম না, কাছেও যাইতে পারিলাম না, দূর দৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। গোবিন্দলালের নিষেধ; কিন্তু কেন গোবিন্দলাল

আমার এই উচ্ছ্বসিত বেগে এমন দারুণ আঘাত দিল? অবশ্যই স্বীকার করি, আমার ভালর জন্যই গোবিন্দলালের ঐ নিষেধ ইঙ্গিত। কিন্তু আমার পরম দয়াবান প্রতিপালক প্রভুর নিকট যাইবার আমার কি ক্ষতি? তিনি ত আমার অক্ষয় দুর্গ, তাঁহার কাছে আর আমার অশুভ কি? গোবিন্দলাল! এস তুমি, আমাকে সব কথা বুঝাইয়া বল, এখন আমি কোন্ পথে যাই?

ব্যাকুল অন্তঃকরণে আমি চতুর্দ্দিকে গোবিন্দলালকে খুঁজিতে লাগিলাম, গোবিন্দলালের কিন্তু সাক্ষাৎ পাইলাম না। একবার কেন চুপি চুপি তবে দেববাবুর বাটীর দিকে যাইনা? পিতাপুত্রের কিরূপ শোকসম্ভাষণ হইতেছে, একবার কেন দেখিয়া আসিনা? কেমন মনের বেগ, কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিনা, আমাকে কে যেন আকর্ষণ করিয়া সেই দিকে লইয়া চলিল। কিছু দূরে অগ্রসর হইয়াছি, মনে কেমন কিন্তু খট্‌কা লাগিল; যাব—কি—যাবনা, মনের ভিতর এমনি একটা প্রশ্ন উঠিয়া মনকে বড়ই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। দেবীরাণীকে অদ্য যাবতীয় ঘটনা বলিতে হইবে, তিনি হয়ত আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এখন আমার কোন্ কর্ত্তব্য পালন করিলে ঠিক কাজ করা হয়? দেবীরাণী আমার প্রাণদায়িনী, দেবীরাণী আমার জীবনের হিতাকাঙ্খিনী; দেববাবুও তদ্রূপ, দেববাবুও আমার প্রতি ততোঽধিক শুভানুধ্যায়ী, আমার যেমন দেবী, তেমনি দেব। কিন্তু দেবের অপেক্ষা দেবীর পরোপকারিতা কিছু বেশী; দেবী আমার হিতাকাঙ্খিনী,—আমার হিতাকাঙ্খীরও হিতাকাঙ্খিনী; তবে তাঁহার নিকট যাওয়া চাই, আগে এই সমস্ত কথা বলি গিয়ে, তিনি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই করিব।

দেববাবুর বাটীতে যাওয়া রহিত করিলাম, আবার গতি ফিরাইয়া কুটীরে যাইবার পথ ধরিলাম। নানান্ থানা ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে চলিতেছি; রাস্তায় তখনও ভিড় খুব, তখনও দু'ধারি লোকের সারি চলিতেছে। আমি সেই সারিস্রোতের মধ্যে যেন ডুব দিয়া চলিতে লাগিলাম। কত লোকের কত প্রকার মত শুনিতেছি! কেহ বলে, "দেববাবুর এতটা করা ভাল হয় নাই, এমন বাজারের মধ্যে দু'হাজার লোকের সাম্‌নে এত বড় কেলেঙ্কারীটা

না ক'রে অন্য উপায়ে ত্যাগ কল্লে চল্‌তে পার্‌ত।" কেহ বলে, "ঠিক হয়েছে, বেটী যেমন, তার মতন ব্যবস্থাও হয়েছে।" কোন স্ত্রীলোক বলিতেছে, "তা হউক বাবু, এ কেলেঙ্কারীটা চেপে রাখ্‌লেই হ'ত, হাটের মাঝে হাঁড়ী না ভাঙ্গলেও চল্‌ত।" এইরূপ স্ত্রী পুরুষে যে যাহার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে করিতে চলিতেছে! আমি কিন্তু দেববাবুর ধৈর্য্যগুণে মোহিত হইলাম। স্ত্রীর ব্যভিচার দৃষ্টে কত লোকে সর্ব্বনাশ করিয়াছে! খুন করিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইয়াছে; কিন্তু দেববাবুর কি অসাধারণ ধৈর্য্য গুণ! কেমন বুদ্ধিবলে সর্ব্বলোককে সাক্ষী করিয়া এই দুরূহ কার্য্যটী সমাধা করিলেন!

এক পদ অগ্রসর, চারিবার পশ্চাৎপদ হইয়া নিতান্ত উদাস মনে চলিতেছি; এখনও আশা, যদি গোবিন্দলালকে আর একবার দেখিতে পাই, তাহার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়া লই। আমি আর দোটানায় পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে পারি না। ধাঁ করিয়া একটা লোক যেন আমার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল, আমার একটু চমক ভাঙ্গিল। তখন রাত্র্যন্ধকার প্রযুক্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! একবার থমকিয়া দাঁড়াইলাম, চারিদিক চাহিলাম, কতিপয় ব্যক্তির গমনাগমন ব্যতীত কাহাকেও পরিচিত ভাবে দেখিলাম না। আবার একজন—আবার একজন—কেন ইহারা আমার গা ঘেঁসিয়া এইরূপ তীরবেগে চলিয়া যায়? না কথা, সহজ নয়! আর একটা কি বিপদ চক্র আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, আবার কি একটা সর্ব্বনাশ-খড়্গ আমার মাথার উপর ঝুলিতেছে! পালাই,—কোন দিকে আর চাহিব না! খুব দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আধ হাত পরিমাণ একটি ক্ষুদ্র লাঠি সজোরে আমার পায়ের গোছে লাগিল। চতুর্দ্দিক ধোঁয়া দেখিলাম, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সটান চীৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম, তাহার পর কি হইল, আর জানি না।

উণবিংশ চক্র।

আবার গারদখানা।

আমি কোথায় কোন্ অজানিত অপরিচিত স্থানে আছি, জানি না। চন্দ্র সূর্য্য দিন রাত্র দেখিতে পাইনা, লোকের কোলাহল, গমনাগমন-জনিত কোন চিহ্ন, পৃথিবী কি নরক কি স্বর্গ, আমি জীবিত কি মৃত, সজ্ঞান কি জ্ঞানশূন্য, কিছুই বোধ হয় না। কোথায়—আমি কোথায় আছি? অবার-অসূর্য্যম্পশ্যরূপে আমি কোথায় আছি? স্থির চক্ষে চতুর্দ্দিক চাহিয়া আছি; মনে ত হয় না, এ স্থানে কখন আসিয়াছি কি? মনে ত হয় না! যত দূর আমি দেখিয়াছি, যত দিন আমি প্রাণ লইয়া এ সংসারে আছি, তত দিন যেন আমার স্বপ্নময়—তত দিন যেন আমি স্বপ্নঘোরে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তবে এওত আমার স্বপ্ন নয়! অনেক রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, না, আমি নিদ্রিত নই, এ আমার স্বপ্ন নয়, আমি জাগ্রত বটে। বক্ষে হাত চাপিয়া ধরিলাম, কেবল প্রাণটি ধুক্ ধুক্ করিতেছে। প্রাণ আছে, তবে মরি নাই! নিস্তব্ধ নির্ব্বাত অন্ধকারময় গৃহে একটু একটু আলো আসে, অতি সূক্ষ্ম! মুখ তুলিয়া চাহিলাম, একটা বিকৃত পতিত দেহ দেখিলাম, এ কার দেহ? এ অন্ধকারে আবার এ কে রে? আমি! আমি! উঃ কি ভয়ঙ্কর! আমারি দেহ দেখিয়া আমি এত অস্থির! উঃ এ কিগো! আমার পায়ে আমার কোমরে এত ব্যথা কেন? ওমা বড়ই যাতনা! দূর হ'রে জগৎ সংসার! দূর হ' দূর হ'! আমায় ছেড়ে দে! আমায় ছেড়ে দে! আমাকে আর ধরিয়া রাখিসনি রে! আর কেন? আমায় ক্ষমা দাওনা! আমার শৃঙ্খল কাটিয়া দাও! সংসার!

সংসার! সংসারের লোক! সংসারের কীট! আমি সংসার চাহি না, লোকালয় চাহি না, আমাকে অগাধ সমুদ্রে ভাসিয়া দাও! দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া যাই! আমি কূল চাহি না, পারাপার চাহি না, আমায় তল দেখাইয়া দাও, আমি অতলের তলে লুকাইয়া থাকি। তুমি আমার কাছে আসিও না, আমি তোমার কাছে যাইবনা!

প্রাণের ভিতর কি একটা আবেগ তরঙ্গ উঠিল, তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে পারিলাম না। এ কি তন্দ্রা? বুঝিলাম না, আস্তে আস্তে যেন চৈতন্যটি মিশাইয়া গেল।

কতক্ষণ এইরূপে আচ্ছন্ন ছিলাম, জানি না। একটা শৃঙ্খল খুলিবার ঘোর শব্দে আমার আচ্ছন্ন বন্ধন যেন খুলিয়া গেল, আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম,—হরি হরি! "গোবিন্দলাল? গোবিন্দলাল! এস ভাই এস! আমি যে পা তুল্‌তে পারি না, আমি যে কোমর তুল্‌তে পারি না। আমায় শীঘ্র বল, আমি কোথায়! আমি ত তোমার অভয় দুর্গে?"

গোবিন্দলাল। "চুপ করুন, চুপ করুন, এত অস্থির হবেন না! কোথায় আছেন, সব্‌ জান্‌বেন। আপনার পায়ে কোমরে এত ব্যথার কারণ কি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? আগাগোড়া বেশ ক'রে ভেবে দেখুন দেখি, মনে পড়ে কি না?

আমি। "মনে প'ড়েছে ভাই মনে পড়েছে। দেববাবুর অসাধারণ পত্নীত্যাগ—পিতাপুত্রের অপূর্ব্ব মিলন দেখে তোমাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে যখন রাস্তা দিয়ে আসি, মনে পড়্‌ছে বটে, আমার পায়ের গোছে হঠাৎ কোথা থেকে এসে একটা ছোট লাঠি সজোরে পড়ে, তাইতে সেই খানেই আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি, তার পর কি কি হ'য়েছে জানি না। এ কোথায় কার খর্পরে এসে পড়েছি গোবিন্দলাল?"

গোবিন্দলাল। "যে খর্পর আজ এতকাল ধরে আপনার মাথার উপর দুল্‌ছে, যে খর্পরে পড়ে আপনি স্থানভ্রষ্ট সংসারভ্রষ্ট এমন কি প্রাণভ্রষ্ট পর্য্যন্ত হ'তে বসেছেন, সেই খর্পরেই আপনি আবার এসে পড়েছেন?"

আমি। "এর কারণ কি তুমি কিছু জান? আমাকে কি একটুও

বুঝিয়ে দিয়ে আমার মহা উপকার কত্তে পার না ? আমার যা মহা অদ্ভুত রহস্য ঢাকা পড়ে আছে, তুমি কি তার কিছু খুলে দিতে পার না ? আমার—"

আমার মুখ হইতে যেন কথাটা কাড়িয়া লইয়া গোবিন্দলাল সচকিতে বলিল, "চুপ করুন! চুপ করুন, কি আবোল তাবোল বকছেন ? আমি এ বিষয়ের কি জানি ? ও কথা কেন আমাকে অমন করে বল্‌ছেন্ ? আমি কিছুই জানি না, ও কথা ছেড়ে দিন্।"

আমি। "আচ্ছা, এ কোথা এসেছি ? তা বল, কারা আমায় নিয়ে এয়েছে, তাত জান ? আমি প্রাণে বাঁচ্‌ব ত ?"

গোবিন্দলাল। "প্রাণে বাঁচবার কথা এক ভগবান ভিন্ন আর কেউ বল্‌তে পারে না। আপনি আমাদের খর্পরেই এসে পড়েছেন; তা ভয় নাই, সাধ্যমত বাঁচাতে কসুর কর্‌ব না। এখন আসুন, আপনার সর্ব্বাঙ্গে এই ওষুধটা ডোলে দিই।" গোবিন্দলাল একটা কি মলমের মত ঔষধ আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইতে বসিল। কত প্রশ্ন আমার মনে উঠিতেছে পড়িতেছে, আমি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি ? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমি দুই দিন দুই রাত্রি এই স্থানে অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছি, গোবিন্দলাল মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার তদারক করিয়া গিয়াছে। এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার একবারও জ্ঞান হয় নাই, আমি নিশ্চল মৃতবৎ-পতিত ছিলাম। যতবার দেবরাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ততবারই আমি বিফল হইয়াছি। গোবিন্দলালকে, সে দিন জয়কালীবিসর্জ্জনের সময় দেবনাবুর নিকটে গমন বাধার ইঙ্গিতের অর্থ কি, প্রভৃতি কত কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে একটিরও উত্তর দিল না, সে নীরবে আমার সর্ব্বশরীরে ঔষধই মাখাইতে থাকে। এখন বেলা ঠিক দশটা।

গোবিন্দলাল কহিল, "এখন একটু সুস্থ ব'লে বোধ হচ্ছে কি ? ক্ষুধা কেমন ? কিছু আহার কর্ব্বেন কি ?"

আমি। "শরীর সুস্থ অসুস্থর জন্য আমি কখনও ভাবিত নই, আমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাকলে শরীরের মহাযন্ত্রণাকেও ডরাই না; ক্ষুধার কথা বল্‌ছ ? কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই,—কোন খাদ্যে রুচি নাই!"

গোবিন্দলাল। "তবে আজও উপবাসে কেটে যাক্। আপনি হয়ত এখনও বুঝ্‌তে পারেন নি, এ কয়েকদিন খুব জ্বর ভোগ করেছেন। নাড়ীর গতিতে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপনার এখন জ্বর ত্যাগ হয়েছে। যা বলি শুনুন, যেমন আছেন, এইরূপ স্থির হয়ে থাকুন। উতলা হবেন না, অস্থির হবেন না; আপনার কাছে যেই আসুক না কেন, তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না, পালাবার চেষ্টা কি আর কিছু, এ যেন একবারও আপনার মনে না উঠে। আমার সঙ্গে কি দেবরাণীর সঙ্গে যেন আপনার আলাপই নেই, আমাদের কথা ত একেবারেই মুখে আন্‌বেন না। যদি কেউ আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, অবশ্য সঙ্গত আর সময় বুঝে ঠিক্ ঠিক্ তার উত্তর দেবেন। খুব সাবধানে থাকুন। আমরা থাক্‌তে আপনার কোন ভয় নাই জান্‌বেন। আমি এখন চল্লেম, একটি কথাও ভুলবেন না।" লৌহ দরজা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল প্রস্থান করিল।

শরীরে সামর্থ্য নাই, মনে প্রাণে সামর্থ্য নাই, স্থির নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া আছি। অনন্ত ভয়ান্ধকারে অভয়ের একটুমাত্র সূক্ষ্ম রশ্মি গোবিন্দলাল; আমি অথও বিপদে পতিত হইলেও গোবিন্দলাল আমার পক্ষে। কিন্তু একি ব্যাপার! একি দারুণ মোহ রহস্য! গোবিন্দলাল দেবীরাণী কে? অবশ্যই আমি দস্যুর চক্রে নিপতিত, আমার প্রাণ লইতে সকলেই লালায়িত, ক্ষুদ্র মান সম নরহন্তার জালে আমি দৃঢ়তর আবদ্ধ; তবে গোবিন্দলালের এত সদাশয়তা কেন? গোবিন্দলাল কেন আমার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এত ব্যাকুল? পূতিগন্ধময় কোটী যন্ত্রণার আধার ভীষণ নরকে এমন দেবহৃদয় গোবিন্দলাল কে? দুর্ভেদ্য অমানিশার করাল অন্ধকার মধ্যে পূর্ণশশীর মত এমন দেবীমূর্ত্তি দেবীরাণী কে? ইহাঁরাও ত দস্যুসম্প্রদায়ের অন্যতম, ঝঞ্ঝা-ঝটিকার সহায়, বিপদবজ্রের বিদ্যুৎ, কৃপাণের খরশান, নারকীর সহকারী? এই অভাগার প্রতি ইহাঁদের এত দয়া কেন? অবশ্যই কোন গূঢ় অভিসন্ধি গূঢ় রহস্য আছে। অতি হীন, পথের ধূলির মত এই দরিদ্রের বহির্গমনোন্মুখ ক্ষুদ্র প্রাণটি হয়ত ইহাঁদের কোন আবশ্যকে আছে, কিন্তু কি আবশ্যক? কি করিয়া বলিব? জানিনা।

গোবিন্দলালের ঔষধ বোধ হয় খুব ভাল, আমার সর্ব্বাঙ্গের যাতনা অনেক অংশে উপশম হইল, কেমন একটু স্বাচ্ছন্দ্য শরীরে আসিল, আমি একটু যেন সুস্থ হইলাম। শায়িত অবস্থাতেই আছি, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যমদূতের মত একজন ভীষণাকৃতি লোকের বজ্র গম্ভীর আওয়াজে আমার সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম, উঃ সেই কালান্তক কাল সদৃশ আমার জাল শ্বশুররূপী রায় মহাশয় বিকট চক্ষে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! আমি তাহার প্রতি আর চাহিতে পারিলাম না, ভয়ে ভয়ে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। সে তর্জ্জন গর্জ্জনে আমায় কহিল, "কেমন হে চালাক ছোকরা, আছ কেমন? ইস্, আমার দিকে আর চাইতে পাল্লেনা যে! বলি হাঁরে! আমি বাঘ নাকি?"

আমি চক্ষু মুদিত করিয়াই কহিলাম, "নরপ্রকৃতিতে তুমি তাহাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর! তোমার মহাযত্নে আমি রাজার হালে আছি, আমার থাকাথাকির খবর আর তোমাকে নিতে হ'বে না, আমি বেশ আছি; তোমাকে অনুরোধ করি, আমার সুমুখ হ'তে সরে যাও, তা হ'লে আমি আরও থাক্‌ব ভাল।"

রায় মহাশয়! "বটেরে হারামজাদা পাজি! তোমার সুমুখ থেকে সর্‌ব বটে; তোমাকে আগে ভবসংসার থেকে সরাই, তার পর আমি সর্‌ব।"

আমার যেন সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তাহাকে কহিলাম, "তাই কর, তাই যদি তুমি একেবারে কর্‌তে পার, তাহলে বড় কাজ হয়; তাহ'লে তোমাদের অনেক পুণ্য হ'বে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটায় যতটা পুণ্য, এক কোপে কাটায় তার চেয়ে অনেক পুণ্য। আমি তোমায় বল্‌ছি, বিনয় ক'রে তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি, আমাকে একটি কোপে পৃথিবী থেকে সরাও, আমার সকল জ্বালা জুড়াবে, তোমাদেরও সকল কণ্টক ঘুচ্‌বে।"

রায় মহাশয়। "দ্যাখ্, বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লি! তোকে পেঁচিয়ে কাটি, কি এক কোপে কাটি, সে আমাদের ইচ্ছা।—খবরদার, আর বেশী কথা কস্‌নি।"

আমি। "আচ্ছা, কেন বল দেখি—আমাকে এত যাতনা দিচ্চ? আমি তোমাদের কি ক'রেছি? তোমারও ত মানুষের প্রাণ, বল দেখি এ অবস্থা যদি তোমার হয়, তা হ'লে তোমার কি রকম বোধ হ'ত? আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি, আমার শরীরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, আমার যাতনাটা একবার বোঝ দেখি? তোমাদের আমি কি দোষ করেছি? জ্ঞানকৃত হোক, আর অজ্ঞানকৃতই হোক, বল আমার কি অপরাধ? তুমি প্রথমে আমায় শ্বশুর বোলে পরিচয় দিলে, কত যত্ন মায়া মমতা দেখালে, কেন,—কে তুমি? আমাকে একবার কেন বলনা? যিনি আমাকে আঠার বৎসর প্রতিপালন ক'রে এসেছেন, যাঁকে আমি বাবা বোলেই জানি, তিনি কি সত্যই আমার বাবা নন? আমার মা কোথায়, আমার সংসার কোথায়? আমার ধন ঐশ্বর্য্য কোথায়? ওগো, তুমি সব জান, তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, একবার আমায় বল—আমি কে"?

আমার এই সকরুণ কাতর উক্তিতে পাষণ্ডের পাষাণ প্রাণে যেন একটু দয়ার সঞ্চার হইল, অনেকক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া যেন কি ভাবিতে লাগিল। আর ফেন সে ব্যক্তি নয়, বেশ নরম হইয়া নম্রস্বরে আমায় কহিল, "আমি সব জানি, তুমি কে কি বৃত্তান্ত, আমি সব জানি, তুমি কি চক্রে পড়েছ, তাও আমার জান্‌তে বাকী নেই। আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করব, তার যদি তুমি ঠিক ঠাক্ উত্তর দিতে পার, তোমার জীবনের যা রহস্য আমার মুঠার ভিতর আছে; সব খুলে বল্‌তে পারি।"

আমি। "এখনি—তুমি এখনি আমায় জিজ্ঞাসা কর; তা হ'লে তুমি আমায় মুক্তি দেবে? আমার ঘোর রহস্য খুলে দেবে? আমার বাপ মা কে কোথায় আছেন সব তুমি আমায় বল্‌তে পার? এত জান, তবে কেন এমন যাতনা দিচ্ছ? বল, কি জান্‌তে চাও বল।"

রায় মহাশয়। "আচ্ছা, এ বেশ কথা; বল দেখি, গারদখানার সুলুকসন্ধান তুমি কি ক'রে জান্‌তে পাল্লে? গুপ্ত—দেয়ালের চাবির যোগাড় ক'রে, দুটো লোককে খুন ক'রে, অমন যমালয় থেকে মেয়েমানুষ সেজে কেমন ক'রে পালালে? কে তোমাকে সাহায্য করেছিল? এসব সন্ধান

তুমি কেমন ক'রে পেলে? আমাদের দু'হাজার লোককে ফাঁকি দিয়ে মঙ্গলাবুড়ীর কাছে বনলতা বোলে পরিচয় দিয়ে কেমন করে তুমি সে রাতটা কাটালে? তারপর দেববাবুর বাড়ীতেই বা কেমন ক'রে জায়গা পেলে? ঠিক্ ক'রে বল দেখি, বিবে জরা দেববাবুকে নিয়ে তুমি যে তিন দিন তিন রাত কাটালে, কে এসব কুবুদ্ধি দিয়েছিল? নির্ম্মলকুমারের সন্ধান দিলে কে? তিনটে লোক তার পাহারায় থাকৃত, তাদের কোথায় সরিয়ে দিয়ে ছদ্মবেশ ধরে ঘোড়ায় চ'ড়ে কার বুদ্ধিতে তুমি বাজারের ভেতর ছেড়ে দিয়ে গেলে? অবশ্যই আমাদের দলের লোক তোমার কেউ সহায় হয়েছে; কে সে ব্যক্তি—কে সে বিশ্বাসঘাতক? এ সমস্ত কথা যদি তুমি একে একে বল্‌তে পার, তা হ'লে নিশ্চয় তোমার মুক্তি হয়, তোমার যা গুপ্ত কথা সব ভেঙ্গে দিতে পারি।"

আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, কি সর্ব্বনাশ! এ সকল কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করি! এ ধূর্ত্তের কি ভয়ঙ্করী ছলনা! এ সমস্ত প্রকাশ করিলে, দেবীরাণীর আজ ঘোর বিপদ! কেবল মাত্র তাঁহারি অব্যর্থ বুদ্ধিবলে আমি এখনও জীবিত, তিনিই এই সকলের মূল, তাঁহাকে বিপদে ফেলিলে, আবার পরমোকারিণী দেবীর বিশ্বাসঘাতক হইলে, এই প্রবঞ্চক আমার জীবনের ঘোর রহস্য উন্মোচন করিতে পারে। না, কখনই না, দয়াময়ীর অসীম দয়া কখনই ভুলিতে পারিবনা, দেবীরাণীর সহকারী গোবিন্দলালকে কখনই বিনষ্ট হইতে দিব না। আমার সম্বন্ধে যত বড়ই গুপ্ত কথা থাকুক না কেন, পৃথিবীর যত কিছু যন্ত্রণা থাকুক না কেন, আমাতেই থাক্; জ্ঞান থাকৃতে, প্রাণ থাকৃতে আমি কখনই বলিব না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত আবার যেন পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিয়া উঠিল, "চুপ ক'রে রৈলি যে? কথা গুল বুঝি গ্রাহ্য হ'লনা? বল্ ঠিক্ ক'রে বল্, কে তোর সহায়?"

আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলাম, "জগদীশ্বর আমার সহায়, জগদীশ্বর আমাকে প্রতিপদে বাঁচাচ্ছেন। ভগবান আমার রক্ষক!"

রায় মহাশয় ক্রোধ গর্জ্জনস্বরে কহিয়া উঠিল, "এখন যদি একটি লাঠিতে তোমার মাথাটী দু'খান ক'রে দিই, ভগবান তোমায় কেমন বাঁচায় বাঁচাক্ দেখি!"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে নরাধম আমার মাথার উপর প্রকাণ্ড লাঠি উঠাইয়া ধরিল। "এখনও বল্‌ছি বল, তোর কোন্ বাবা এসে সুলুক সন্ধান দিয়ে যায়। তা'হ'লে এখনি বেঁচে যাবি, তোর সব কথা শুন্‌তে পাবি। নৈলে এই লাঠি এখনি তোর মাথার খুলী ওড়াবে। বল বল্‌চি, এখনি বল্।"

হা মহিমাময়ী দেবি! কোথায় তুমি? আমি আর তোমাকে লুকাইয়া রাখিতে পারি না। তোমার কাছে বুঝি বিশ্বাসঘাতক হইতে হইল, দুরাচারের হস্তে আমার প্রাণ যায়! আমি কি করি? কোন্ দিক্ রাখি? কে বড়? আমার প্রাণ বড়—না তুমি বড়? কার জীবন মূল্যবান? তোমার, তোমার,—নিশ্চয় তোমার! আমি অবহেলে প্রাণ বিসর্জ্জন করি, তাহাতে কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু তোমার প্রাণের মূল্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনিময় করিলেও শোধ হয় না। তুমি আজীবন পরোপকারব্রতে ব্রতী থাক, লোক-শিক্ষায় শিক্ষামূর্ত্তিমতী হও, তোমার একটি প্রাণ লইয়া সংসার স্বর্গ হউক, তুমি অটল হইয়া থাক, আমি প্রাণ উৎসর্গ করি।

মনকে স্থির দৃঢ় করিয়া অবিচলিত ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলাম। পাষণ্ড কত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, কত ভয় দেখাইতে লাগিল, কত প্রবোধ—কত বিনয়, হায়, কতই তাহার ছলনা! আমার সঙ্কল্প বিফল হইবার নয় দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্রোধে দুরাচার কহিয়া উঠিল, "এতদিন তোকে ভালকথা বোলেই আস্‌ছি, এখন দ্যাখ্, তোর কি দুর্দ্দশা করি! তোকে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মার্‌ব! থাক্ হারামজাদা! গোবিন্দলালকে পাঠাতুম, সে তোকে কত যত্ন কর্‌ত, ওষুধ দিয়ে বাঁচালে, তাকে আর এ এ ঘরে আস্‌তে দেব না। যেমন তুই কুকুর, তোর তেমনি মুগুর না হ'লে আর হ'বেনা। থাক্ বদ্‌মাস, এই ঘরে ম'রে প'ড়ে থাক্!" এক ধাক্কায় আমাকে ফেলিয়া দিল। তারপরে একটা ভয়ঙ্কর ঝন্ ঝন্ শব্দে লৌহ দরজা বন্ধ করিয়া বেগে প্রস্থান করিল।

শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, ধাক্কা সামলাইতে পারিলাম না, কিয়ৎক্ষণ অচেতন ভাবে পড়িয়া রহিলাম। আমি আর লিখিতে পারি না, তখনকার সে ভাব, সে বিপদ, সে যাতনা স্মরণ করিলে, আমি যে কি অভিভূত হইয়া পড়ি, পাঠক মহাশয়! আমার ভাব-ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়, আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি, একটা বিদ্যুৎ যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠে,—উন্মনা হইয়া যেন পৃথিবী-চৈতন্য হারাইয়া ফেলি। আমি যে কি আপন্ন কি বিপন্ন! আমার সহৃদয় পাঠক! একবার হৃদয় দিয়া বুঝুন, মনশ্চক্ষে দেখুন। আমার এই ভয়ঙ্কর বিপদ কাহারও যেন না হয়, অতি বড় শত্রুও যেন এ বিপদে না পড়ে। আমি একা—সংসারের মধ্যে ঘোর নিরাশ্রয়ী আমি একা! তবে আমার বলিতে এ সংসারে যে আছ! কোথায় তুমি? একবার আমার দুঃখে 'আহা' বল, তুমি নিরশ্রুনেত্র হইও না, তুমি আমাকে উদ্ধার করিতে পার আর নাই পার, তুমি একবার আমার জন্য ব্যাকুল হও, একবার আমাকে স্মরণ কর! এই দুস্তর বিপদসমুদ্র মাঝে একটি সুখতরঙ্গ হৃদয় ধারণ করিয়া ডুবি।

বিংশ চক্র।

লোমহর্ষণ ঘটনা।

এই অবস্থায় আমার এক সপ্তাহ কাটিল! গোবিন্দলাল আর আইসে না, আর একজন লোক দুই বেলা আমাকে দুই মুঠা আহার করাইয়া যায়, এমনই কুটিল রহস্য, কোন কথাই ইহার সহিত হয় না। কত হাতে পায়ে ধরি, কত প্রলোভন দেখাই, কথা কহে না, ইঙ্গিতেও কোন ভাব দেখায় না! গোবিন্দলাল বলিয়াছিল, আমি জ্বরাভিভূত ছিলাম; আমিত এখনও স্থির

করিতে পারি না, আমার জ্বর কি বিজ্বর! তবে সর্ব্বাঙ্গে যে বেদনা ছিল, তাহা এখন আর নাই, এই কয় দিনের পর আজ যেন সুস্থ আছি। যাহা হয় হউক আমিত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, মহাসাগরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রভেলায় বসিয়া আছি, যে দিকে ইচ্ছা হয় ভেলা ভাসিয়া যাউক, কূল পাই ভাল, নচেৎ দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া যাই, আর যুদ্ধ করিয়া কি করিব?

স্থির নির্ব্বাক হইয়া আছি, কারাগার বলিতে হয় বলুন, অন্ধকূপ বলিতে হয় বলুন; সেই গৃহ মাত্রই আমার সম্বল, সেই ধ্যান সেই জ্ঞান। চক্ষু চাহিলে, জানালা দরজা, কড়ি বরগা, চতুষ্কোণ দেয়াল, আমার একটা জঘন্য বিছানা, আর আমার সর্ব্বাঙ্গ, এই দেখি; চক্ষু মুদিলেও তাই;—রুদ্ধ বাতাস, ঘনাবৃত অন্ধকার, ধার করা একটু দিনের আলো, আর সেই লোকটা; ইহারাই আমার সঙ্গী, আলাপ পরিচয় করিতেও ইহাঁরা, বাদ বিসম্বাদ করিতেও ইহাঁরা।

রায় মহাশয় ওরফে আমার পত্নীর পিতাঠাকুর মহাশয়, আর সেই দিন হইতে শুভাগমন করেন নাই। তাঁর পদধূলি, সুমিষ্ট বজ্রমুষ্টি, সরল সুন্দর কটমট কটাক্ষ, আর বীণাবিনিন্দিত মধুর গালাগালি, এ সকল এই কয় দিনের জন্য স্থগিত আছে। আমার একটু স্বাচ্ছন্দ্য কি সেই জন্য? জানি না।

এখন বোধ হয় রাত্রি ১০টা কি ১১টা। এই সময় হইলেই আমার ভোগ আইসে। প্রাণ টুকু যেন নিতান্ত না রাখিলে নয়, একটু যত্ন স্বীকার করিয়া দায়ে পড়িয়া সেই সুখাদ্যগুলিকে উদরপরিতোষ করি। পাঠক মহাশয়! জানিয়া রাখিবেন, আমি এখন একটু মন্দের ভাল।

বাহিরে শৃঙ্খল খুলিবার শব্দ হইল, আমি একটু উৎকর্ণ হইলাম। উৎকর্ণ হইবার আর কিছু আমার আবশ্যক ছিলনা, যে আইসে সেই আসিবে নিশ্চয়; কিন্তু একটু প্রভেদ দেখিলাম। যে লোকটা আমার আহার্য্য আনে, তার আগমন আমি অনেকক্ষণ হইতে বুঝিতে পারি, সে কিছু জানাইতে জানাইতে আইসে। অদ্যকার শৃঙ্খলের শব্দ অতি মধুর! কেমন চুপি চুপি, কেমন অস্পষ্ট! খুট্ করিয়া দরজাটী খুলিয়া গেল; আহাহা! আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা আনন্দকল্লোল উঠিল, পুলকানন্দে প্রাণ মন পূর্ণিত

হইয়া উঠিল, আমার সকল দুঃখ ঘুচিয়া গেল! আমার অন্নপূর্ণা স্বরূপিণী পরম হিতৈষিণী দেবীরাণী সেই সুমোহন বালক বেশে অন্নপূর্ণ থালা হস্তে আমার সম্মুখে আবির্ভাব হইলেন। আমি বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, অতুল প্রেমানন্দে লাফাইয়া উঠিলাম। তাঁহারও চক্ষে আনন্দাশ্রু, আমারও চক্ষে আনন্দাশ্রু, ঠিক্ একসময়ে উভয়ের মুখ হইতে কি একটা অস্ফুট ধ্বনি উঠিল। নিবিড় জলদজালের মধ্য হইতে আমার আলোকরা পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে, ভয়ঙ্কর শ্মশানক্ষেত্রে আমার পারিজাত ফুল ফুঠিয়াছে, দারুন বীভৎসময় নরকের মধ্যে পুণ্যময় স্বর্গালোক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে! এ দৃশ্য কি নয়নে ধারণ করিতে পারি? আর কি আমার যমযন্ত্রণা থাকে? আজ এই নির্দ্দয় দস্যুগহ্বরে আমার দয়াময়ী দেবীর অন্নপূর্ণা রূপে আবির্ভাব!

দেবীরাণী বীরবাহু বেশে আসিয়াছেন, এখন হইতে ইঁহাকে বীরবাহু বলিয়া সম্বোধন করিব!

"বীরবাহু! তুমি বড় উভয় সঙ্কটে পড়েছ না? আমি বুঝতে পাচ্ছি, রায় মহাশয় তোমাকে বড়ই পীড়ন কচ্ছেন।"

"সে সব কথা পরে হবে; এখন যা এনেছি খাও, একটু সুস্থ হও।"

আমার অদম্য উচ্ছ্বাস এখনও উপশমিত হয় নাই। তাঁহার মুখের দিকে অনিমেষ-নেত্রে চাহিয়া আছি। কি গভীর উদারভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল, কি বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত মধুর চাহনী, কি অনুপম কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!

আমি ভাবে গদগদ হইয়া কহিলাম, "আমার ক্ষুধা নাই, বীরবাহু, বীরজে, দেবীরাণি! তোমার অতুল রূপরাশি মধ্যে আমার রোগ, শোক, আমার জ্বালা যন্ত্রণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, বিপদ, আমার সমস্ত সংসার উৎসর্গ করেছি। তুমি যেখানে, আমার স্বর্গ সেখানে, এই ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর অনাথ ব্রাহ্মণসন্তানের সম্মুখে অন্নপূর্ণ থালা হস্তে অন্নপূর্ণা বেশে আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি তোমায় দেখি, প্রাণভোরে, নয়নভোরে ভাব দিয়ে প্রেম দিয়ে দেখি, আমি একবার তোমায় মনে মনে পূজা করি!" আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না, তাঁহার চরণতলে বসিয়া পড়িলাম।

সসম্ভ্রমে দুই তিন পশ্চাৎপদ হইয়া বীরবাহু ত্রাস্তে কহিয়া উঠিলেন, "কি

কর—কি কর! একি, পাগল হয়ে উঠ্‌লে যে! ও সব কি পাগলাম হচ্ছে? ছেড়ে দাও—এ ভাব মন থেকে একেবারে ছেড়ে দাও। অনাহারে, অনিদ্রায়, বিষম যন্ত্রণায় তোমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে দেখছি। অনেক কথা তোমার সঙ্গে আছে, সব কথা পরে হবে। আর দ্বিরুক্তি করো না, শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নিয়ে সবল হও।"

বীরবাহুবেশে দেবরাণী অতি যত্নে অতি আদরে আমার সম্মুখে বসিয়া আমায় আহার করাইলেন। আমি যে যম-গহ্বরে আছি, তাহা আর যেন মনে নাই! সুখসেব্য অট্টালিকায় বসিয়া রাজভোগে অমৃতবৎ আহার করিলাম। আচমন প্রভৃতি সেই স্থানেই হইল। আমার উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই, আমি যেন আজ কত শান্ত—কত নিরাপদ!

আমি সুস্থির ও সবল হইলে পর বীরবাহু কহিলেন, "কতকগুলি বিশেষ দরকারী কথা শুনে নাও। আমি কে কি বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য ভুলেও যেন কখন চেষ্টা করো না। তুমি কোথায় কি জন্য এসেছ, তাও তোমার জান্‌বার দরকার নেই। রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, আমি কেন এইরূপে ছদ্মবেশে এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় আছি, তাও তোমার জেনে কাজ নাই। গোবিন্দলালের সঙ্গে তোমার এখন আর বড় সাক্ষাৎ হবে না। চোম্‌কে উঠনা সে বিষম বিপদে পড়েছে। পাষণ্ডেরা গোবিন্দলালকে সন্দেহ করেছে, সে যে তোমার মুক্তিদাতা, তা আমি এক প্রকার প্রমাণ করেছি; তান্‌লে আমরা তিন জনেই মারা যেতেম। ভয় নাই, তার জন্য তুমি কিছু ভেবনা; তার প্রাণ আমার হাতেই আছে। দলপতি একটা বিশেষ কাজ হাঁসিল কর্‌বার জন্য কয়দিন এখানে নেই তাই আমি একটু স্বাধীনতা পেয়ে নানান্ কৌশল ক'রে তোমার কাছে আস্‌তে পেরেছি। আর একটি কথা বলি শোন; এখনও বোল্‌তে পারি না, হয়ত তুমি আজ মুক্তি পেলেও পেতে পার। রাত দুপুরে আমি একবার তোমার কাছে আস্‌ব আমার সঙ্গে এক জায়গায় তোমাকে চুপ চুপি যেতে হ'বে। একটা নূতন জিনিস্ দেখ্‌তে পাবে। ভাল কথা যদি আমি নিজে না আস্‌তে পারি, যাকে পাঠাব, তার সঙ্গে নির্ভয়ে যেও। এই একটা পুঁটুলি রেখে গেলাম

এতে তোমার ছদ্মবেশ আছে, তোমাকে আজও আবার বনলতা সাজ্‌তে হ'বে। সেই লোকটি তোমাকে যেখানে নে যাবে, সেইখানে যেও, আমাকে দেখ্‌তে পাবে। হয়ত এই বেশেই আজই তোমার মুক্তি হ'তে পারে। আমি এখন চল্লেম্।"

বীরবাহু সেই গৃহ মধ্যে একটা পুঁটুলী ফেলিয়া দিয়া অতি সন্তর্পণে লৌহ দরজাটি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

হর্ষ বিষাদে অবাক্ হইয়া আমি সেই গৃহ মধ্যে বসিয়া রহিলাম। আমি এই অদ্ভুত চক্রান্তের কণা মাত্রও বুঝিতে পারি না। দেবীরাণীর অমানুষিক রহস্য কবে বুঝিতে পারিব? কে দেবীরাণী? তিনি দস্যুদলের অধিনায়িকা, কি বিপন্না কি পরাধীনা, আমি ছন্দাংশও বুঝিতে পারি না। আজ আমার মুক্তি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু গোবিন্দলাল আমা হইতে আজ ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, আমার হর্ষ বিষাদ যেন যুগপৎ মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল। দেবীরাণীর ইচ্ছায় গোবিন্দলাল আপন্ন, তবে দেবীরাণীই বুঝিবেন, দেবীরাণীবু দ্ধিমতী, অবশ্যই তাঁর অব্যর্থ বুদ্ধি কৌশলে আজ গোবিন্দলাল ও আমি দু'জনেই ত্রাণ পাইব।

মন বড়ই ইতস্ততঃ করিতেছে, একবার বসি, একবার উঠি, কি যে করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না, কিছুই ভাল লাগে না। কখন দ্বিপ্রহর বাজিবে, কখন দেবীরাণীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবে, দেবীরাণী কি দ্রষ্টব্য আমায় দেখাইবেন? আবার কখন আমি দেবীরাণীর সঙ্গী হইব?

থাকিতে পারিলাম না, সেই পুঁটুলীটি খুলিলাম। দেখি সেই বেশ, সেই আমার বনলতা বেশের সাজ সরঞ্জাম। আবার আমাকে আজ স্ত্রীলোক সাজিয়া আমাকে কোন্ কর্ম্ম সমুদ্রে ঝম্প দিতে হইবে? জানি না, দেবীরাণী জানেন—দেবীরাণীর বুদ্ধি জানে।

আস্তে আস্তে বাহির হইতে শৃঙ্খল খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি পাগলের মত সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম! দরজা খুলিয়া একটি লোক গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাকে চিনি না, কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লোকটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই কহিল,

"আমার নাম গঙ্গাধর, আমি আপনাকে সাজাতে এসেছি, একটু তৎপর হোন।"

তৎক্ষণাৎ গঙ্গাধর পুঁটুলী খুলিয়া সাজ সরঞ্জাম বাহির করিয়া আমাকে সাজাইতে বসিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে ষোড়শী যুবতী রূপে পরিবর্ত্তিত করিল। হাতের পায়ের মুখের রং আরও উজ্জ্বল হইল। নিকটে আরসী ছিলনা, আপনাকে আপনি দেখিতে পাইলাম না; জানিনা, কতদূর সুন্দরী হইলাম। আমার নামকরণ হইল সেই "বনলতা"। গঙ্গাধর আর কথা কহে না, সে এখন ইঙ্গিতে কাজ সারিতে লাগিল। একবার অতি মৃদু-স্বরে কহিল, "আসুন, আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।" একটি কথা বলিতে ভুলিলাম, চারিগাছি মল উপস্থিত এখন আমার পদযুগলে শোভমান হইলনা, আমি গোপনে রাখিলাম। নির্দ্দিষ্টস্থানে গিয়া পায়ে দিব, গঙ্গাধরের অল্প কথায় এই আভাস পাইলাম।

মল চারিগাছি অতি গোপনে রাখিয়া নিঃশব্দে গঙ্গাধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিতে করিতে চলিলাম। কত দালান, কত উঠান, কত ছোট ছোট ঘর অতিক্রম করিলাম; কত সংশয়, কত ভয়, কত আনন্দ, আমার প্রাণের ভিতর খেলা করিতে লাগিল। আমি কোথায় যাইতেছি? এই দুর্গম ভয়াবহ স্থানের উপর দিয়া এক জন অপরিচিতের সহিত আমি ষোড়শী বনলতারূপে কোথায় যাইতেছি? দেবীরাণি! তোমার নিকট, তোমার অভয় দুর্গের মধ্যে, কি জানি তুমি আমাকে কি মোহন রহস্য-জালে আবদ্ধ করিয়াছ!

অন্ধকারে যদিও কিছু দেখিতে পাইতেছিনা, তবুও এস্থান আর একটি মহল বলিয়া বোধ হইল, চতুর্দ্দিক নিথর, নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক ঘুমন্ত। এত বড় একটা দস্যু সম্প্রদায় এই অট্টালিকায় বাস করে, সকলেই অসতর্ক, সকলেই এমন ঘুমন্ত কেন? এই গভীর নিস্তব্ধতা দেখিয়া আমার আর একটা শঙ্কা আসিল, থম্ থম্ গভীর মেঘময় আকাশের লক্ষণে একটা ঘোর ঝটিকার কল্পনা আসিয়া পড়িল! তবু একটু ভরসা, মেঘমালার মধ্যে আমার স্থির বিদ্যু-ল্লতা বিরাজিতা আছেন, তিনিই আমার ধ্রুব, তিনিই আমার আলোক।

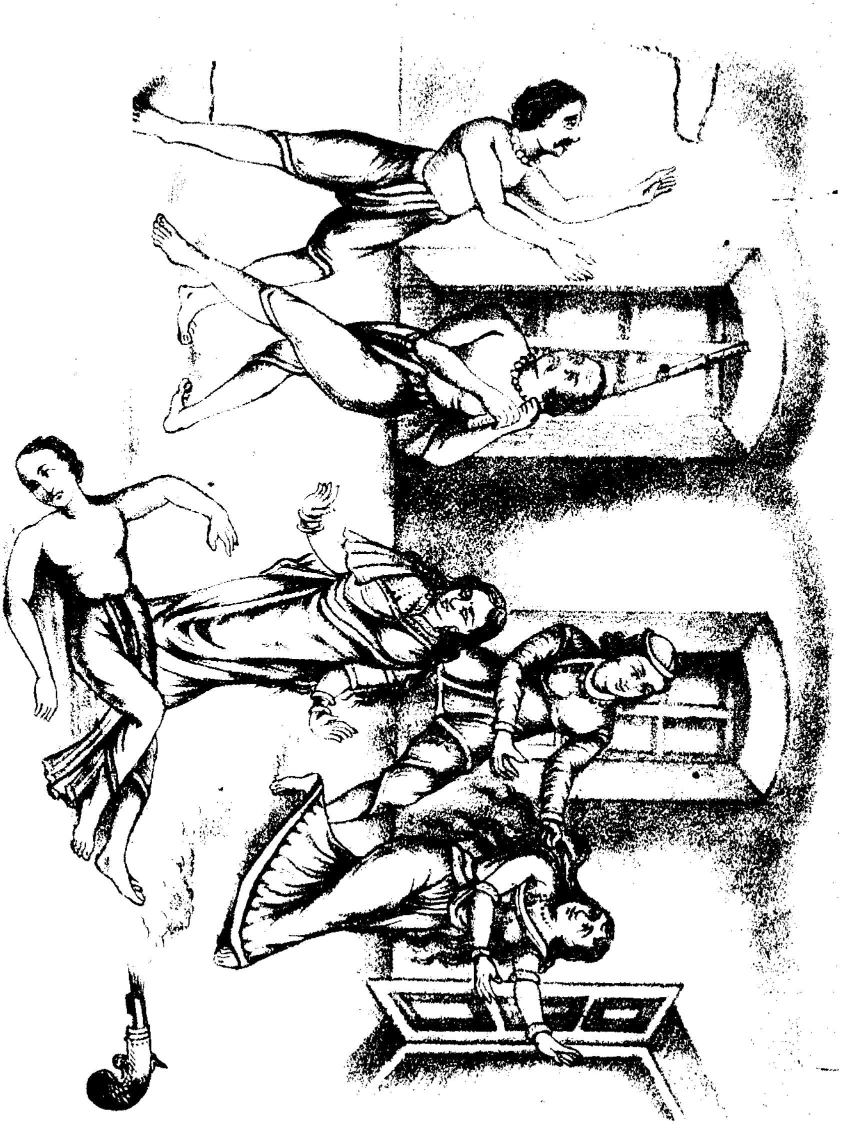
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি, একটা গোঁ গোঁ স্বর শুনিতে পাইলাম, যেন কেহ কাহাকে গলা টিপিয়া প্রাণবধ করিতেছে! দু'জনেই আমরা তথায় যেন বজ্রাহত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি সর্ব্বনাশ! আবার একটা কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! গঙ্গাধর কহিয়া উঠিল, "শীগ্‌গির আসুন—শীগ্‌গির আসুন,—বুঝি কাজ শেষ হয়ে গেল।"

সম্মুখের দক্ষিণ দিকেই একটা সরু গলিপথ আছে; কে যেন আমাদের পায়ে পালক বাঁধিয়া দিল, যেন হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া সেই গলিপথ অতিক্রম করিলাম। সম্মুখেই আর একখানা বাড়ী; সেই বাড়ীর কোণে যেন আর এক ব্যক্তি অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। আমাদের দেখিয়াই কহিয়া উঠিল, "ভয় কোরোনা, আমি বীরবাহু; এই দরজার ফাটাল দিয়া দেখ, কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে!" তৎক্ষণাৎ দরজার ফাটাল দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, একটা 'গাছ-কোমর' বাঁধা স্ত্রীলোক আর একজনের বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া মারিতেছে, আর একজন ভীষণ আকৃতি লোক লাঠি হস্তে বিচঞ্চলভাবে সেই ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কি ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! আমি রোমে রোমে কম্পিত হইয়া উঠিলাম! প্রথমটা তাহাদের চিনিতে পারিলাম না; তারপর যখন বীরবাহুর মুখে শুনিলাম, বিমাতা স্বহস্তে সপত্নী-পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিতেছে, পিশাচী জয়কালী নির্ম্মলকুমারকে গলা টিপিয়া মারিতেছে, তখন বোধ হইল, ব্রহ্মাণ্ড বুঝি বিদীর্ণ হইয়া গেল, আমার চক্ষের ভিতর কে যেন জ্বলন্ত শল্য বিদ্ধ করিয়া দিল!

আমি চুপি চুপি ভয়চকিতে বীরবাহুর কাণে কাণে কহিলাম,—"কি উপায়? কি উপায় কল্লে নির্ম্মলকুমার এ যাত্রা রক্ষা পান? এখনি একটা কৌশল কর, নৈলে গেলো, নির্ম্মলকুমার পিশাচীহস্তে এখনি যায়। রক্ষা কর, কি উপায় ঠাউরেছ?"

চকিতে বীরবাহু কহিয়া উঠিলেন, "উপায়? উপায় এই দেখ!"

দুম্ করিয়া বজ্র নিনাদে ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বীরবাহু একটা ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে রজনীর অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঘরের



ভিতরে পিশাচী আর তাহার সহচর চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিক চাহিতে লাগিল। তিন্ জনেই এককালে সমবলে সেই দরজায় লাথী মারিলাম। হুড়মুড় শব্দে ভিতর দিকের খিল ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিয়া গেল। আমরা বাঘের মত এক লাফে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এত সহজে আর এত অল্প কালের মধ্যে এই কাজটি সমাধা হইয়া গেল, আমরা তখন কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। গঙ্গাধর কোন কথা না কহিয়া সেই লোকটার নিকট হইতে সবলে লাঠি কাড়িয়া, সেই লাঠিতেই ধাঁ করিয়া তাহার মাথায় সজোরে এক ঘা! রক্তে রক্তনদী হইয়া গেল, দুর্ব্বৃত্ত চীৎকার করিয়া তথায় অচেতন হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে জয়কালী যেমন সেই ভগ্ন দরজার মধ্য দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিবে, বীরের মত তখনি বীরবাহু এক লাফে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহাকে ধরাশায়িনী করিল। আর কোন কথা নয়, তাহার মুখের ভিতর একখানা রুমাল পূরিয়া দিয়া মুখ চক্ষু এবং হস্ত পদ প্রভৃতি বাঁধিয়া ফেলিল। মস্তকে গুরুতর আঘাতে আহত হইয়া যে ব্যক্তি পতিত, গঙ্গাধর তাহারও সর্ব্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিল। সে তথায় পড়িয়া থাক্; গঙ্গাধর জয়কালীকে পাঁজাকোলা করিয়া, আমি এবং বীরবাহু অচেতন নির্ম্মলকুমারকে ধরাধরি করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ভগ্ন দরজা দিয়া পূর্ব্ব-পথাভিমুখে নিঃশব্দে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কোন্ স্থান দিয়া যাইতেছি, অন্ধকারে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অনুমানে বুঝিলাম, এ আমার কারাগারের পথ নয়; উত্তর দিক্ দিয়া আসিয়াছিলাম, এখন সেই দিকে না গিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতেছি। এত বড় বাড়ী আমি জীবনে কখন দেখি নাই, একটি পল্লীবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিছুদূরে অগ্রসর হইয়াছি, একটি লোক অন্ধকারে আপনাকে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বীরবাহু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জয়পাল! এ দিক্‌কার সব কাজ হাঁসিল, তোমার কতদূর?"

জয়পাল উত্তর করিল, "আমিও সব ঠিক্ ক'রে রেখেছি, এখন আপনার হুকুমের অপেক্ষা।"

বীরবাহু। "এখন রাত কত?"

জয়পাল। "রাত প্রায় তিন্‌টে হ'তে চল্লো।"

বীরবাহু। "রায় মহাশয়ের ফিরে আস্‌তে তা'হলে এখনও ঢের দেরী? প্রায় সেই ভোরের কথা, কেমন?"

জয়পাল। "আজ্ঞে হাঁ।"

বীরবাহু। "তোমার দলবল সব ঠিক্ আছে?

জয়পাল। "আজ্ঞে হাঁ।"

বীরবাহু। "তবে এক কাজ কর; তোমার আড্ডায় এখন এদের নিয়ে যাও। এই স্ত্রীলোকটিকে (অবশ্য আমাকে দেখাইয়া) আজ রাতটি খুব সাবধানে রাখবে; এদের দু'জনের জ্ঞান হ'লে জয়কালীকে তখনি আলাদা ক'রে ফেল্‌বে, নির্ম্মলের সঙ্গে যেন চোখোচোখী না হয়। এই নাও, নির্ম্মলের একদিক ধর। গঙ্গাধর, জয়পালের আড্ডায় জয়কালীকে রেখে এসে শীগ্‌গির আমার সঙ্গে হাতীখানায় দেখা কর,—আমি তবে চলি।"

বীরবাহু কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

আমরা ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে অন্ধকার ভেদ করিতে করিতে চলিলাম।

একবিংশ চক্র।

সেই শ্বশুরালয়!

প্রভাতের আর বড় বিলম্ব নাই, চারিদিক প্রায় ফর্সা হইয়া আসিয়াছে, কাক কোকিলও ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংসারের জ্ঞান, সংসারের রহস্য সম্বন্ধে আমি জন্মান্ধ, কিছুই জানিনা, জানিবার উপায় নাই, কবে জানিব, তাহাও জানিনা! প্রতি মুহূর্ত্তে কি কি ঘটনা ঘটিতেছে, ঘটনাময়

বিধাতা জানেন, আর জানেন সেই দেবীরূপিণী দেবীরাণী। সুতরাং উপস্থিত আমি যে কোথায় আছি, কিছুই জানি না। একটা চুন বালীহীন ইষ্টকময় ভগ্নগৃহে অচৈতন্য নির্ম্মলকুমারকে লইয়া অদ্যকার এই ঘোরতর বিপদের রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম। অচৈতন্যা জয়কালীকে এই গৃহে কতকটা সুস্থ করিয়া চেতনের প্রারম্ভেই জয়পাল তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, যাইবার সময় কোন কথা বলিয়া যায় নাই, সে আবার ফিরিবে কি না জানি না। এ দিকে প্রভাত হইয়া আসিল, ঘুমন্ত নির্ম্মল এখনি জাগরিত হইবেন, আমি ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট ধরা পড়িব। যদিও নির্ম্মলের নিকট ধরা পড়িলে কোন ভয় নাই—বিপদ নাই; তবু কিন্তু বোধ হয় দেবরাণীর অভিপ্রায় নয়। দেবীরাণীর ইচ্ছা, আমি এখন নির্ম্মলের চক্ষে না পড়ি, হয়ত এমন একটা কিছু তাঁহার অভিসন্ধি আছে, তাহা সিদ্ধ হইলে নির্ম্মলের নিকট আমায় প্রকাশ করিবেন। ইহাই যুক্তি, ইহাই স্থির। দেবীরাণী যদিও এ সম্বন্ধে আমায় কোন কথা বলেন নাই, তবু কিন্তু এখন নির্ম্মলকে ধরা দিব না।

তাহা যেন হইল, কিন্তু আমি এখন যাই কোথায়? দিনমান আসিয়া পড়িল, এই নারীবেশে কোথায় আত্মগোপন করি? আর একটি আমার ঘোরতর সন্দেহ আসিয়া পড়িল। আমাকে নারীবেশে রাখিবারই বা দেবীরাণীর উদ্দেশ্য কি? অদ্য রাত্রে যে যে ঘটনা ঘটিল, ইহা কি আমার স্বাভাবিক বেশে চলিতে পারিত না? এই ছদ্মবেশে আমি কোন্ কার্য্য উদ্ধার করিলাম? কি করিয়া বলিব? ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, দেবীরাণীর ইচ্ছা!

আর ভাল লাগেনা, আর এই ভারবহাবেশে নীরবে একাকী বসিয়া থাকিতে পারি না। কপালে যাহা ঘটে ঘটুক, সাবধানে সাবধানে একবার প্রভাতের স্বাধীন মুক্ত বাতাস সেবন করিয়া আসি, যথাসাধ্য প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করি।

মল চারিগাছি, এতাবৎ সময় পর্য্যন্ত আর আমার পদযুগে শোভিত হইবার সময় পায় নাই, আমার অঞ্চলের কোণে বাঁধা আছে, সুতরাং চমকপ্রদ গুরুপদশব্দের আর সম্ভাবনা রহিল না; আস্তে আস্তে পা ফেলিতে ফেলিতে আন্দাজে আন্দাজে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমি বাহিরে গেলাম।

বাহিরে আসিয়াই দেখি, উত্তরদিকে প্রকাণ্ড এক গভীর জঙ্গল; সবে মাত্র তরুণ তপনের প্রথম কিরণ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জঙ্গলটি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। একি! এ জঙ্গল যে আমার চেনা; এখানে যে আমি এক-বার সারাদিন প্রাণভয়ে বৃক্ষশিরে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছি! উঃ কি ভয়ঙ্কর রহস্য! এই স্থান হইতেই যে আমার প্রথম বিপদের প্রথম চক্র, ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ও হো হো! এখন যে আমি সমস্ত বুঝিতে পারিলাম! আমার পিতা নামক যে ব্যক্তি আঠার বৎসর কাল আমাকে পুত্রভাবে লালন করিয়াছে, যে আমাকে একটা মিথ্যা ছলনাময় বিবাহের অছিলায় নামমাত্র আমাকে বিবাহিত করিয়াছে, প্রবঞ্চনায় প্রতারণায় মুগ্ধ করিয়া যে আমাকে একটা ভাণ শ্বশুরালয় নামক যমালয়ে আনিয়া অনন্ত বিপদসমুদ্রে নিমগ্ন করি-য়াছে, ঐ যে দক্ষিণ দিকে ঘন জঙ্গলাচ্ছন্ন সেই অট্টালিকা! কি সর্ব্বনাশ! আবার আমি এখানে? হা কুচক্র! তোমার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কত দূর—দূর—দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অজ্ঞানে আবার আমাকে সেই ভয়াবহ স্থানে আনিলে? কুচক্রীর নিদারুণ মোহচক্র! এখনো তোমাতে কত বিপদ কত যন্ত্রণা? আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের কত নিষ্পেষণ-অস্ত্র তোমাতে আছে? তোমার ঘূর্ণমান চক্রের কি নিবৃত্তি নাই? আমি কঙ্কালাবশেষ না হইলে, সেই কঙ্কালাবশেষ জীর্ণ দেহ শ্মশানভূমে শৃগাল কুক্কুরাদির খাদ্য ভক্ষ্য না হইলেই কি তোমার ঘূর্ণিতগতি অচল হইবে না? ঐ সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ, ঐ অশ্বত্থের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া দেবীরাণীকে জগন্মোহন বালক বেশে দেখিয়াছিলাম; অদ্য আমি যে নামে আছি, দেবীরাণীর অদ্ভুত ক্ষমতায় আমি সেই বনলতা নামে ঐ অশ্বত্থের মূলে বসিয়া আত্মপ্রাণ ফিরিয়া পাই-য়াছিলাম। কি ইন্দ্রজাল! আবার আমি সেই ভয়াবহ স্থানে! হায় হায়, কালের খর্পরে আমি আবার সেইখানে আসিয়াছি, পলায়নের কোন পথ নাই। লাভে হইতে ধরা পড়িব, দেবীরাণীর সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সমগ্র বনভাগ নির্জ্জন, লোক চলাচল নাই। একবার তবে যতদূর পারি, চারিধার দেখিয়া বেড়াই, কেমন একটা মনের ভিতর ভয়ের কৌতূহল উঠিল। আমি এখন ব্রজেন্দ্র নই, আমি বনলতা। ভয়ঙ্কর বিপদের সহিত

যুদ্ধ করিতে যাইতেছি, এই নারীসজ্জা কি একবারও আমার বর্ম্মের কাজ করিতে পারিবে না ? ব্রজেন্দ্র অপেক্ষা বনলতা নাম কি বারেকের জন্যও নিরাপদ নয় ? আমার বাহ্যিক মূর্ত্তি নিরীক্ষণে নরঘাতিরা কি একবারও সদয় হইবে না ? দেখি না, এ সংসারে কঠিন অপেক্ষা কোমলের কত বল। আমি পাগল, প্রশ্নও যেমন, মীমাংসাও তেম্‌নি,—আবার ভয়ের কৌতূহলও ততোধিক।

বিস্ময় কৌতুকে যথাসাধ্য আত্ম গোপন করিয়া সেই অট্টালিকা অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। জন মানবের সাড়া শব্দ নাই, চতুর্দ্দিক নির্জ্জন। কোন্‌ পথ হইতে জানি না, হটাৎ গোবিন্দলাল আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমি থতমত খাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি ! গোবিন্দলাল যে, তুমি কখন মুক্তি পেলে ?"

গোবিন্দলাল কহিল, "সে সব কথা পরে হবে। এখন যা বলি শুনুন ; আজ ভয়ঙ্কর দিন ! কি অভাবনীয় ঘটনা যে ভবিষ্যতের উপর নির্ভর কচ্ছে, কল্পনাতেও এখনও আন্‌তে পাচ্ছিনি। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, পথে দেখা হ'ল, ভালই হয়েছে। এই পুঁটুলি নিন্‌, এতে আপনার সাবেক কাপড় আছে, চুপি চুপি ঐ ঝোপটার মধ্যে গিয়ে সাবেক বেশ ধরুন।"

আমি কহিলাম "তার পর কোথায় যেতে হবে ? দেবীরাণী কোথায় ?" গোবিন্দলাল বলিল, "তিনি এই খানেই কোন একটা বিশেষ কাজে আছেন, আপনি আর দেরী কর্ব্বেন না।"

নিকটস্থিত একটি ঝোপের মধ্যে গিয়া নারী বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি যে ব্রজেন্দ্র সেই ব্রজেন্দ্র হইলাম ! গোবিন্দলাল সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে, তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিলাম।

গোবিন্দলাল কহিল, "চলুন, অনেকগুলি কথা আছে, যেতে যেতে সব বল্‌ছি।" আমরা উভয়ে জঙ্গলের ধার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। যাইতে যাইতে গোবিন্দলাল কহিল, "আচ্ছা ব্রজেন্দ্রবাবু, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনার মনে পড়ে কি ?"

আমি সচকিতে কহিয়া উঠিলাম, "কি বোল্লে গোবিন্দলাল ! হরিহর

বন্দ্যোপাধ্যায়? কোথায়—কোথায় তিনি? কেন এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে? তিনি কি এখানে আছেন?

গোবিন্দলাল। "চুপ করুন, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তাঁকে এইমাত্র দেখে এলেম।"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সোৎকণ্ঠে আবার কহিয়া উঠিলাম, "কোথায়—কোন্ থানে আছেন তিনি? আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনা গোবিন্দলাল! তিনি যেখানেই থাকুন, সেইখানে আমায় একবার তুমি নিয়ে চল।"

ধীর ভাবে শান্ত স্বরে কহিল, "আপনি কি মনে করেন, সেখানে গেলে নিরাপদ হবেন? কখনই না; নিশ্চয় জান্‌বেন স্বেচ্ছায় বিপদ বজ্রকে বুকে পেতে লওয়া হবে। ভাল, কে তিনি? তাঁকে কি যথার্থই আপনার পিতা বোলে বোধ হয়?"

হতাশ ভগ্নহৃদয়ে তাহাকে কহিলাম, "কি জানি গোবিন্দলাল, এ গুরুতর রহস্যের আদ্যন্ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তিনি যে কে, তাঁর সহিত যে আমার কি সম্বন্ধ, আমি কিছুই স্থির কত্তে পাচ্ছিনা! একবার চলনা, একবার তাঁর কাছে যাই; যদি আমি পুত্র নাও হই, আঠার বৎসরের এক দিনের আদরও কি পাবনা? এই দিনে দুপুরে তোমাদের চোকের সাম্‌নে আর কি অনিষ্ট কত্তে পার্ব্বেন গোবিন্দলাল? তাই কর, কেমন?"

গোবিন্দলাল কহিল, "বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, ছেলেবুদ্ধিতে এখনও কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না। তবে সব কথা শুনুন; তিনি কি একলা আছেন ভাবছেন? তা নয়; রায় মহাশয়, শঙ্কর আর আর দল বল নিয়ে তিনি কিসের একটা মন্ত্রণা কচ্ছেন, হঠাৎ যদি সেখানে উপস্থিত হন, তা হলে কি রক্ষা আছে মনে করেন? এই যে গেল রাত্রের কাণ্ডটা ঘোট্‌ল, একি তাঁরা কেউ জান্‌তে পেরেছেন? রায়মহাশয় জানেন, আপনি এখনো কারাগারে। সেখানে আপনি কি বোলে যাবেন? কেমন ক'রে আপনি উদ্ধার পেলেন, কে আপনার সহায় হ'ল, রায় মহাশয় কি এ সব আপনার মুখ থেকে না শুনে নিশ্চিন্ত হবেন? সে দিন এ সব জান্‌বার জন্য কত আপনাকে পীড়ন

ক্ষুরে এসেছিলেন, তা কি ভুলে গেলেন নাকি? লাভে হ'তে সব মাটী হবে,—দেবীরাণীর উপর সব দোষ অর্শাবে, তা হ'লে কি ভয়ানক বিপদ বুঝুন দেখি? ও কথা মন থেকে ছেড়ে দিন। ঐ দেখুন, দেবীরাণীর অদ্ভুত কৌশলে নির্ম্মলকুমার ঘোড়ায় চ'ড়ে উত্তর মুখে ছুটে পালালেন। আঃ বাঁচা গেল, নির্ম্মলকুমার প্রাণে প্রাণে মুক্তি পেলেন।"

পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, নির্ম্মলকুমার সবেগে অশ্বারোহণে উত্তর দিক দিয়া অদৃশ্য হইলেন, আমারও যেন একটু ভয় কমিয়া গেল।

হঠাৎ দেখি, পূর্ব্বদিকের জঙ্গল হইতে দ্রুতবেগে জয়পাল আমাদিগের নিকট আসিতেছে। অস্ফুটস্বরে গোবিন্দলাল কহিয়া উঠিল, "না জানি জয়পাল কি সংবাদ আনে!" জয়পাল আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে গোবিন্দলালকে কহিল, "এতদিনের পর বুঝি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, গোবিন্দলাল! ছুটে এস—ছুটে এস; আমাদের সব কষ্ট সব কৌশল বুঝি সফল হ'ল। দেবীরাণী একলা আছেন, ব্রজেন্দ্রবাবুকেও সঙ্গে করে নিয়ে এস, আমি দৌড়ে গিয়ে খবর দিই, তোমরা আস্ছ।" জয়পাল মুহূর্ত্ত মধ্যে সরিয়া গেল।

আমার কৌতূহলের আর সীমা পরিসীমা নাই, কি ব্যাপার! গোবিন্দলাল! ব্যাপার কি? এতদিনের পর কিসের কষ্ট কিসের কৌশল সফল হ'ল? এ কোন্ সম্পর্কীয় আনন্দ? আমার, না দেবীরাণীর?"

আনন্দগদগদকণ্ঠে গোবিন্দলাল কহিল, "উপস্থিত দেবীরাণীর বটে; যদি চারিদিক বজায় থাকে, যদি ভগবান সব দিকে মুখ তুলে চান, এ আনন্দে আপনারও কিছু অংশ আছে। আসুন, ছুটে ছুটে আসুন।"

একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম,—উঃ সেই শ্বশুরালয়!

দ্বাবিংশ চক্র।

একি কাণ্ড !!

পূর্বোচ্ছ্বাসে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমি, গোবিন্দলাল এবং জয়পাল, সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা পার্শ্বস্থ গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া অতি দ্রুতবেগে প্রাণপণে চলিতেছি। নয়নে পলক নাই, মুখে বাক্য নাই। আমার প্রাণে তখন যে কতভাব কত ভাবেই খেলা করিতেছে, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর দুঃসাধ্য। ক্রমাগত আমরা দক্ষিণমুখে ছুটিতেছি ; একটি পথ বাম দিকে চলিয়া গিয়াছে, আমরা অতঃপর সেই পথ ধরিলাম।

সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা হইতে, অনুমান আমরা প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি। সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র ভগ্নগৃহ জঙ্গলের ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে। জয়পাল ত্রস্তে সেই ভগ্নগৃহের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া আমাকে বলিল, "ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটার ভিতর আপনি চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। আমাদের কথার আওয়াজ বেশ ক'রে চিনেছেন ত ? আমি অথবা গোবিন্দলাল আমাদের দু'জনের মুখ থেকে 'সদারং' এই কথাটি যতক্ষণ না শুন্‌তে পান, কখনই ঐ ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না।" এই বলিয়া জয়পাল গোবিন্দলালের সহিত যেন নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল !

নিতান্ত ভগ্নমনে কম্পিতচরণে সেই ভগ্নগৃহটির ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম। একি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ! যেন জীবন্ত নরক ! এই পৃথিবীর দশ পনেরটি শ্রেষ্ঠ প্রাণী একত্রে পচিয়া উঠিলে যতদূর দুর্বিসহ দুর্গন্ধ উঠিতে পারে, সেই মত ! সেই মতই রাশি রাশি ঘৃণিত দুর্গন্ধযুক্ত দুষ্ট বাষ্প আমার নাসিকার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্ক পূর্ণ করিল ! বমনোদ্রেক হয়, কার সাধ্য তথায় তিষ্ঠাইতে পারে !

জগতের মধ্যে যত কিছু বিপদ আছে, দুর্ভাবনা, মনস্তাপ, অত্যাচার, অবিচার, প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা প্রভৃতি যত কিছু সংসার সুখের পথে বাধা বিঘ্ন আছে, তাহার সমুদয় নাকি আমার ভোগের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, তবে এই দুর্গন্ধ আমাকে কেনই বা ভোগ করিতে হইবে না? অত্যন্ত ঘৃণায় নাক টিপিয়া তথায় স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম।

আট হাত দৈর্ঘে, চারি হাত প্রস্থে, সেই গৃহটি নির্ম্মিত। অস্তিম অবসন্ন একখানি মাত্র কড়ি আর ষোলখানি বরগায় ছাদটি কোন রূপে ধারণ করিতেছে মাত্র। পূর্ব্ব ও পশ্চিম কোণে দুইটি নাম মাত্র জানালা; কারণ গরাদে এবং কবাট তাহার কিছুই নাই, কেবল অস্তিত্বের স্মৃতি চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে।

গৃহপ্রবেশের কবাটও প্রায় সেই মত; চৌকাঠ আর বলা যায় না, এক-কাঠ সংশ্লিষ্ট দুইখানি জীর্ণ শীর্ণ কবাট গৃহটিব কোনরূপে আবরু রক্ষা করি-তেছে মাত্র! সম্ভবতঃ আগামী বর্ষাতেই এই দায়ীত্ব হইতে প্রবেশ দ্বারটি অবসর গ্রহণ করিবে! চতুষ্কোণ দেয়ালের আপাদ মস্তকই লোনা দ্বারা এক-রূপ অপরূপ রূপে গৃহের সৃষ্টিস্থিতির সময় হইতে রূপান্তরিত! ঝুল মাকড়সা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে কত, তাহা আর কি বলিব! উপস্থিত ক্ষেত্রে আর কি করিব? নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া বসিয়া বসিয়া এই সব দেখিতেছি, আর মনোমধ্যে যথারূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেছি! গৃহটি যে সনে নির্ম্মিত, সেই সনেই বোধ হয় প্রস্তুত হইয়া জড্ডান মাদুরটি এক কোণে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে, নতুবা গৃহে আর কোনই বাসোপযোগী আসবাব পত্র নাই। তলভাগ যৎপরোনাস্তি আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ। কতবিধ ক্ষুদ্র বন্যজন্তুর ক্ষুদ্র স্তূপ স্তূপ বিষ্ঠা, সারি সারি বিশৃঙ্খল ভাবে সাজান কতই খেংরাকাঠী, মুরগীর ও পায়রার পালক, আর এই রকম জঘন্য জঘন্য কত যে কি, তাহা আর অধিক কি লিখিব?

এই ত গৃহের অবস্থা, এই দ্রব্য সমূহ একত্রে মিশাইলে কি এতই ভয়াবহ দুর্গন্ধ উঠিতে পারে? তবে ইহা কি? কোথা হইতে এমন দুর্গন্ধ আসিতেছে? বারেক মাত্র জয়পালের হুকুম লঙ্ঘন করিলাম। বড়ই কৌতূহলী বড়ই

অনুসন্ধিৎসু হইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া একবার গৃহের চতুর্দ্দিক বিশেষ মনোযোগ, মনোযোগ কেন—পঞ্চেন্দ্রিয় যোগের সহিতই যথা সম্ভব অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কিছুই হইল না, প্রকৃত তথ্য কোনরূপেই বাহির করিতে পারিলাম না। আবার সেই নরককুণ্ড ফিরিয়া আসিলাম, মাগো! কি পৈশাচিক উৎকট গন্ধ!

মন অনুসন্ধিৎসু, কেমন করিয়াই বা স্থির থাকিতে পারি? আবার উঠিলাম, গৃহটির তল ভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। মাদুর শয্যার একটা অংশমাত্র, সেই মাদুরের কিন্তু মর্য্যাদা রাখিতে পারিলাম না। সে থানিকে সম্মার্জ্জনীরূপে পরিণত করিয়া গৃহটি বেশ করিয়া পরিষ্কার করিলাম। এত ধূলা জমিয়াছিল, মেজের স্বরূপ এককালীন অন্তর্হিত হইয়াছিল, এখন নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল!

কিছুই হইল না; এত অনুসন্ধান করিলাম সমস্তই বৃথা হইয়া গেল। তবে কোথা হইতে এমন দুর্গন্ধ আসিতে পারে? একি আশ্চর্য্য কাণ্ড! আবার দরজার দিকে অগ্রসর হইলাম, একবার বাতাসের তুফান বহিয়া গেল; হাঁ ঠিক—নিশ্চয়ই তাই, পশ্চিম হইতে ঠিক ঐ দুর্গন্ধ আসিতেছে! তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আম্র-বৃক্ষ তলে নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব একটা মৃত্তিকা-স্তূপের উপর মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী স্বচ্ছন্দমনে ভ্রমণ করিতেছে। ভয়ানক কৌতূহল আসিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নিশ্চয়ই এই মৃত্তিকা স্তূপ মধ্যে মৃত দেহ নিহিত আছে। যেমন করিয়াই হউক, আমাকে ইহার সন্ধান লইতেই হইবে, কোন না কোন রহস্য আবিষ্কার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে সৌভাগ্য ক্রমে কিয়দ্দূরে এক খানি কোদালি পতিত দেখিলাম, আর কি বিলম্ব সয়? তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকাস্তূপের উপর সজোরে এক কোপ বসাইলাম; গলিত মাংসাস্থি মিশ্রিত এক কোদাল মাটী উঠিয়া ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ বিস্তার করিল। আবার এক কোপ—আবার এক কোপ, এইরূপ উপর্য্যুপরি ৫।৭ কোপের পর একটা গলিত নরদেহ দেখিতে পাইলাম। কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! শরীর শিহরিয়া উঠিল! মৃতদেহ পার্শ্ব হইতে

আবার খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম, দেখিলাম কি? সারি সারি মৃতদেহ শায়িত। যতদূর খুঁড়িয়া যাইলাম, একটির পর একটি করিয়া ক্রমাগত সারি সারি শব-দেহ কবরস্থ। কোন শব অস্থিময় কঙ্কাল, কোনটা বা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে! কোনটা বা কবন্ধ, গ্রীবা-শূন্য মস্তক-শূন্য হইয়া লোকলোচনের অমানুষিক ভয় প্রদর্শক রূপে স্থির স্থির নিপতিত! কোনটা বা হস্ত পদাদি শূন্য! একটাও কিন্তু পূর্ণাবয়বে নাই, কোন না কোনটার অঙ্গহীন আছেই আছে। ইহার মধ্যে একটা স্ত্রীলোকের শব দেখিলাম অঙ্গহীনা নয়, কিন্তু এতদূর ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখ-মণ্ডল এরূপ বিভৎস আকার ধারণ করিয়াছে যে, প্রথমে কিছুতেই চিনিতে পারিলাম না; অনেকক্ষণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণের পর বোধ হইল, জীবদ্দশায় এই স্ত্রীলোকটি দেবনারায়ণ বাবুর শ্যালিকা নামে অভিহিতা ছিল, জীবনান্তে এই ঘৃণিত কবরে পাপ পুরুষসঙ্গিগণের সহিত পাপসহচরী হইয়া পাপের পরি-ণাম ফলভোগ করিতেছে। কিন্তু অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়, ইতিমধ্যে হঠাৎ কেমন করিয়া ইহার মৃত্যু হইল? বেশ বোঝা যাইতেছে, মৃতদেহ অধিক দিনের নয়; ৪।৫ দিনের মধ্যে এই কবর-শয্যায় শায়িত করা হইয়াছে। কেন এরূপ হইল? দস্যুসহচরীর জীবন-পরিণাম কি এইরূপে পরিণত হয়? না, আমি বালক—এ রহস্য বুঝিবার আমার সাধ্য কি?

একটা ভয়ঙ্কর গম্ভীর আওয়াজে 'সদারং' শব্দটি কোথা হইতে উচ্চারিত হইল! লোক-ত্রাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার হৃদয় হইতে দূরে ছিল, শব্দটা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মূহূর্ত্ত মধো আমার হৃদয় প্রাণ আচ্ছন্ন করিল! অমনি জয়পালের নিষেধ বাক্য মনোমধ্যে জাগরিত হইল, তখনি একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অন্তরালে লুকাইয়া পড়িলাম! দূর জঙ্গলের মধ্য হইতে আর একবার 'সদারং' শব্দটা প্রতিধ্বনিত হইল! দেখিলাম, আমার নিকট হইতে প্রায় ত্রিশ হস্ত দূরে দুইটা লোক প্রায় একত্রে সমাবিষ্ট! এত দূরে থাকিয়া তাহা-দের কথা বার্ত্তা কেমন করিয়াই বা শুনিতে পাইব? জয়পাল ও গোবিন্দলাল যেদিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিকে এক এক বার অঙ্গুলি হেলাইয়া তাহারা তখন কি কথা কহিয়া ঐ দিকেই চলিয়া গেল! আমি কিন্তু আর তথায়

দাঁড়াইলাম না, যথাসাধ্য যত শীঘ্র পারিলাম মাটী চাপা দিয়া যথা স্থানে কোদালিখানি রাখিয়া পুনরায় সেই ভগ্নগৃহে আসিলাম। কি উন্মত্ত মন আমার, ইচ্ছা করিয়া সাধ করিয়া নরক ঘাঁটিয়া আসিলাম! কখন গোবিন্দলাল আসিবে, কখন জয়পাল আসিবে? ক্রমাগত ঘরে বাহিরে পরিশ্রম করিতেছি, একবার বসি, একবার উঠি, অশান্ত প্রমত্ত মন কিছুতেই স্থির হয় না।

একি? এ আবার কি? গৃহ মধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে একস্থানের মাটী যেন কাঁপিয়া উঠিল, একি মনের ভ্রম? একটু বলের সহিত পদাঘাত করিলাম, প্রকৃতই যে কাঁপিয়া উঠে!

তৎক্ষণাৎ সেই স্থানটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলাম। চুণ শুর্‌কি পিটিয়া মেজেটি নির্ম্মিত হইয়াছে, মেজেটির যেরূপ রং, ঠিক সেইরূপ রংএ চিত্রিত হইয়া একখানি চতুর্দ্দিকেই এক হস্ত পরিমিত গোলাকার কাষ্ঠ বিশেষ দক্ষতায় মেজের সহিত সংলগ্ন। অনেক চেষ্টা করিলাম, সমতল মেজে হইতে গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড কোনরূপেই স্বতন্ত্র হইল না। হঠাৎ সেই কোদাল খানাকে মনে পড়িল। অতি দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া তৎক্ষণাৎ লইয়া আসিলাম। কোদালি খানি আমায় বিশেষ সাহায্য করিল, অল্পায়াসেই কাষ্ঠাবরণ উঠাইয়া ফেলিলাম;—দেখিলাম হস্তস্পর্শাতীত একটি গর্ত্ত।

যখন এরূপ সাবধানে, এরূপ দক্ষতায়, এরূপ অভাবনীয় রূপে, এরূপ জনমানব পরিশূন্য গভীর অরণ্যের মধ্যে, একটা গর্ত্ত লোক-লোচনের অগোচরে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহাতে কোন না কোন একটা গভীর রহস্য নিশ্চয়ই নিহিত আছে। দুই হস্তে ভর করিয়া অতি সাবধানে গর্ত্তমধ্যে অবতীর্ণ হইলাম। আমার পদতল হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। একটা কি পুঁটুলির মত আমার পদতল স্পর্শ করিল, বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে পুঁটুলিটা হস্তগত করিলাম। বহু দিনের পুরাতন অতি অপরিষ্কার একখানা জীর্ণ শীর্ণ বসন বন্ধনে সত্যই একটা পুঁটুলি।

অবশ্যই এই পুঁটুলি মহারহস্যময়! পুঁটুলির গ্রন্থি খুলিতে বিশেষ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু গ্রন্থি কি একটি! এমন দ্বাদশটি গ্রন্থিতে আধেয় বস্তু সযত্ন-লুক্কায়িত। এতই আগ্রহ উৎকণ্ঠা আমার প্রাণের ভিতর তোলপাড় করিতেছে, যে গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে জীর্ণবসনাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল। গলিত বস্ত্রাবরণ ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার কৌতূহল কোন ক্রমেই উপশমিত হইল না, খুব শক্ত চামড়া দ্বারা আবার একটা আবরণে দৃঢ়রূপে আবরিত! ফল কথা, কোনক্রমেই ভিতরের রহস্য উন্মোচিত হইল না। যাহা হউক, আমি কিন্তু পুঁটলিটি ছাড়িলাম না, বনের মধ্যে কোন নিভৃত স্থানে একটা বটবৃক্ষতলে অনেক মাটির নীচে বিশেষ সংগোপনে রাখিয়া আসিলাম। মনের কল্পনা এই, এক দিন না একদিন নিশ্চয়ই ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিব।

যথাসাধ্য গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড সেই গর্ত্তের মুখে বেমালুম করিয়া চাপা দিয়া, ধূলা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় পূর্ব্ববৎ করিয়া রাখিলাম। এই কার্য্য সবে মাত্র সম্পন্ন করিয়াছি, 'সদারং' শব্দ আমার কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইল। অন্যমনস্কতা বশতঃ কাহার কণ্ঠ প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই; পুনরায় ঐ শব্দ শ্রুত হওয়াতে উহা গোবিন্দলালের কণ্ঠ স্থির করিতে পারিলাম। আমিও দরজার বহির্ভাগে আসিয়া "সদারং" শব্দে প্রত্যুত্তর করিলাম। দূরে বনমধ্যে গোবিন্দলালকে দেখা গেল, অমনি তন্মুহূর্ত্তে আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি সোৎকণ্ঠে কহিলাম, 'গোবিন্দলাল! সংবাদ কি? আর কেন আমায় অন্ধকারে রাখ?"

গোবিন্দলাল। "সংবাদের জন্য এত ব্যস্ত হবেন না। সময় হ'লে শুন্‌তে পাবেন, চাইকি দেখ্‌তেও পাবেন। এখন অনেকটা আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন, উপস্থিত আর বড় ভয়ের কারণ কিছু দেখ্‌ছিনে! বেলা হ'ল, আহারাদি কর্ব্বেন আসুন!

আমি। "দেবীরাণী কোথায় গোবিন্দলাল?"

গোবিন্দলাল। "তাঁর গতিবিধি, তাঁর কার্য্যকলাপ, তাঁর দুর্ভেদ্য চাতুরী-জাল, হঠাৎ যদি আমরা বুঝ্‌তে পাত্তেম, তিনি এখন কোথায় কি ভাবে

আছেন, এক কথায় আপনি যদি জান্‌তে পেতেন, তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল ? ও সব কথা জিজ্ঞাসা করাই আপনার বিড়ম্বনা। আমার কুটীরে বিশ্রাম কর্ব্বেন চলুন।"

উভয়ে আমরা বনপথ অতিক্রম করিতে করিতে চলিলাম।

গোবিন্দলালের কুটীরে আমি সমস্ত দিনটি কাটাইয়া দিলাম! আজ আমি অপেক্ষাকৃত অনেক শান্ত, অনেক নিরাপদ। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে কুটীরে গোবিন্দলাল আমাকে হিন্দুস্থানী বালক সাজাইয়াছিল, সেই কুটীরের দাওয়ায় এখন আমি একাকী উপবিষ্ট আছি। অদ্য দিবা দ্বিপ্রহরে গোবিন্দলাল কোথা হইতে আমার নিমিত্ত প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া আহার করাইয়াছে! এ ব্যঞ্জন কোথা হইতে প্রস্তুত প্রভৃতি অনেক কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মিষ্ট মিষ্ট তিরস্কারচ্ছলে আমার সমুদয় কথাই উড়াইয়া দিয়াছে। আমাকে আহারাদি করাইয়া, সে সেই যে প্রস্থান করিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান নাই। আমি নীরবে সেই কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া নানান্ ভাবনা ভাবিতেছি, গোবিন্দলাল হর্ষ বিকসিত মুখে দেখা দিল। গোবিন্দলাল কহিল, "ব্রজেন্দ্র বাবু, উঠুন, এক চমৎকার দৃশ্য দেখবেন আসুন! কিন্তু অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন, যা দেখবেন তাতে বিচলিত হবেন না ?'

আমি। "হাঁ, যা আমাকে দেখাবে, তাতে আমি সাধ্যপক্ষে কখনই বিচলিত হ'ব না। এমন কি দৃশ্য গোবিন্দলাল ?"

গোবিন্দলাল। "যা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নি,—যা ভাববার নয়, সেই দৃশ্য ; কিন্তু তা প্রকৃত নয়, সমুদয় ভাণ মাত্র।"

আমি। "মন স্থির রাখতে বিশেষ চেষ্টা করব, চল কি দৃশ্য দেখাবে!"

গোবিন্দলাল কুটীরের দরজায় চাবি দিয়া অগ্রসর হইল, আমিও তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম একি কাণ্ড !!

ত্রয়োবিংশ চক্র।

তুমি দেবী? না দানবী?

উত্তর মুখের বড় রাস্তায় পড়িয়া আমরা বরাবর চলিতে আরম্ভ করিলাম। রজনীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, রাস্তার দুই পার্শ্বে গভীর বন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খানি কুটীর ভিন্ন লোকালয় নাই বলিলেই হয়। পথিমধ্যে গোবিন্দলালের সহিত আমার কোন কথাই হইতেছে না, সেও নীরব আমিও নীরব। অনুমান দুই ঘণ্টা কাল প্রায় চারি ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। গোবিন্দলাল কহিল, "আপনি এই স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। কি কর্‌তে হ'বে না হ'বে, আমি এখনি এসেই তার বিহিত কচ্ছি। মনে রাখ্‌বেন, আপনি এখনও নিরাপদ নন।"

সেই গভীর নির্জ্জন নিবিড় অন্ধকার দূরব্যাপী বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রশস্ত অশ্বত্থবৃক্ষ মূলে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে গোবিন্দলালের পথ প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। পথের বাম ভাগের নয়ানজুলীটা এক লম্ফে পার হইয়া গোবিন্দলাল পশ্চিম দিকে অন্ধকার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমি সেই দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

আহা মরি মরি! সেই দেবারাধ্যা মুনিজনমনোন্মাদিনী আকাশব্যাপিনী সঙ্গীত ধ্বনি কোথা হইতে আমার শ্রবণের ভিতর দিয়া প্রাণের মধ্যে মধুবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া দিল? ধীর গম্ভীর মৃদু মধুর নিক্কণ! বাতাসে ভাসিয়া এক[illegible] আইসে আবার মিলাইয়া যায়। দয়ারাণি! দেবীরাণি! এ তোমার কণ্ঠ, এ তোমারি হৃদয়প্রাণমাতোয়ারা কলকণ্ঠ! কোথায় তুমি মহিমাময়ি?

তোমার কলঝঙ্কারে আমার সমস্ত কষ্ট আমার যমযন্ত্রণা দূর হইয়াছে, একবার দর্শন দাও, আত্মহারা হই, পাপ পৃথিবী ভুলিয়া যাই!——

——নিকটে নয়, দূরে; নির্ব্বাক্ নিশীথের অস্ফুট ধ্বনির অস্পষ্টতায় প্রতীয়মান হয়, তোমার নিকট হইতে আমি অর্দ্ধক্রোশ দূরে নিপতিত! অর্দ্ধ-ক্রোশ ব্যবধান কি ব্যবধান? কোন্ দিকের দূরের আড়াল তোমার চক্ষু হইতে আমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে? কোন্ পথে, কোন্ দিকে? কোন্ স্বর্গে—কোন্ পবিত্রমন্দিরে হে দেবি! তুমি সমাসীনা? গোবিন্দলাল! এস এস, আমায় দেবীরাণীর নিকট লইয়া চল; আমি আর তোমার বাধা মানিব না; তুমি যাহাই বল না কেন, আমি আর তোমার কোন কথাই শুনিব না; আমাকে বীরজা দেবীর নিকট লইয়া চল। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে যদি কিছু আমার যন্ত্রণা থাকে, থাক্; দেবীরাণীর পদস্থ হইলে যতবিধ যন্ত্রণা, যতবিধ কষ্ট, যতবিধ জ্বালাই আমায় জ্বালাতন করুক না কেন, সে যন্ত্রণা—সে কষ্ট—সে জ্বালাই আমার স্বর্গের সুখ!

সুদূর গীতিধ্বনির মধুর বৈদ্যুতিক আকর্ষণীতে আমার প্রাণ মন আকৃষ্ট হইয়া গেল, আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গীতধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। আমি অবহিতচিত্তে আহা মরি, সেই কীর্ত্তনভাবাপন্ন মনোহর স্বর শুনিতে লাগিলাম।

গীত। *

কেন—মেঘের আড়ালে সইরে, আমার ডুবে গেল হৃদি-চাঁদ!
আমি—প্রাণ দিয়ে তারে ভালবাসি ব'লে তাই কি এমন বাদ?
ওলো—তার কথা আমি মনে মনে ভাবি গোপনে কবিতা গাঁথি,
মরি—মধুর মিলন—মধুময় প্রেম আপনা আপনি মাতি।
তবে—কেনলো বিরলে? কার কাছে বলে? আমি কি কর্য়েছি দোষ?
হবে—দু'দিনে এমন—না জানি কখন, এত প্রেমে এত রোষ!

* সৌরটীকীর্ত্তন——একতালা।

আহা আহা, কি গভীর হৃদয় ভরা ভাব ! যেমন কণ্ঠ, তেমনি সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদকারিণী কবিত্ব ! যেন মণিকাঞ্চন একাধারে মিশ্রিত হইয়া গীতজগতে কি এক অপূর্ব্ব শ্রী সংমিশ্রণ করিয়া দিয়াছে ! বীরজা ! তুমি যে কোন্ স্বর্গের দেবী, সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন !

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তবৎ সেই দিকে চলিতে লাগিলাম, একে অন্ধকার, তাহাতে দুর্গম বনপথ, কত বিঘ্ন আমার গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কণ্টকে পদদ্বয় কতবার ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, আমার দৃক্পাত নাই, আমার গতি অবিরাম, চক্ষু নিমেষহীন, হৃদয় তাড়িতের ন্যায় বেগগামী !

আ সর্ব্বনাশ ! এযে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ! এত অন্ধকারে থাকিয়াও আমি যেন বুঝিতে পারিতেছি, ১০ নং গারদ হইতে আমায় উদ্ধার করিয়া দেবীরাণী বালক বেশে বনলতা সাজে সাজাইয়া এই বাটীতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এই বাড়ীতে দস্যু-জননী "মঙ্গলা বুড়ী" বাস করে ! এই যে সেই পঞ্চপাণ্ডব ! ঐ যে দূরে অট্টালিকার উত্তর দিকে জঙ্গল বিদীর্ণ করিয়া সেই খাল প্রবাহিত ! কি দুর্ব্বোধ্য জটিল ঘটনা !

এখন কথা হইতেছে, এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিব কি না ? গোবিন্দলাল অথবা দেবীরাণীর কাহারও উপদেশ পাই নাই, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কি প্রকারেই বা প্রবিষ্ট হই ? চিরদিনই আমি কর্ত্তব্যবিমূঢ়, নিরতিশয় কুতূহলের বশবর্ত্তী ; সুতরাং উপস্থিতক্ষেত্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুরই অবধারণ করিতে পারিলাম না। ইতস্ততঃ করিতে করিতে একেবারে সদর দরজার নিকট আসিয়া পড়িলাম, ভিতর হইতে দরজার খিল বন্ধ। কি করি ? এইরূপ অন্ধকারে গুপ্ত ভাবে একাকী পরিভ্রমণ কখনই আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, আবার কি গোবিন্দলালের নির্দ্দেশিত স্থানে ফিরিয়া যাইব ? পদদ্বয় চলিতে চাহে না ; আমি যে নিশ্চয় জানি, দেবীরাণী এই বাটীর ভিতরে আছেন, জানিয়া শুনিয়া এই ক্ষীণ পা দুখানি, আমার দুর্ব্বহ প্রাণ মন বহন করিয়া এই অমৃতময় স্থান কি পরিত্যাগ করিতে পারে ? না, কখনই না, সম্পূর্ণ অসম্ভব ! হঠাৎ অন্ধকার হইতে অন্ধকাররূপী দুইটা লোক বাটীর

মধ্য হইতে বনপথে আসিয়া পড়িল, আমি ত্রস্তে কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া পড়িলাম, তাহারা কি অস্পষ্ট কথা কহিতে কহিতে কিয়ৎদূর অতিক্রম করিয়া বনপথে অন্ধকার মধ্যে মিশাইয়া গেল।

এই ত সুসময় উপস্থিত, ভগবানের কৃপায় এই ত বহির্দ্বার অবারিত। তবে একবার কেন যাই না? একবার কেন দূর হইতে প্রাণ ভরিয়া দেবী-রাণীকে দেখিয়া কৃতার্থ হই না? অনেক দিন দেখি নাই, তবে যাই—একবার যাই, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি! যদি কোন বিপদ ঘটে? ঘটে ঘটুক; দেবী-স্থানে—দেবী-দর্শন করিলে যদি বিপদ ঘটে, তবে সে বিপদ আমার শিরোধার্য্য, সে আমার সম্পদময় বিপদ। নিদারুণ সোচ্ছাসে হে বিপদভয়-বারিণি দেবীরাণি! তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি, আমাকে আশ্রয় দাও—আমাকে বিপদ ভয় হইতে মুক্ত কর।

এই ভগ্ন অট্টালিকা আমার অজানত নয়! প্রবেশ প্রস্থানের পথ, বহির্বাটীর ভিতরবাটীর উঠান, দরদালালান, উপরে উঠিবার সিঁড়ি প্রভৃতি সংযোগ বিয়োগ স্থান, কতকটা আমার জানা আছে! স্থির সঙ্কল্প হইয়া সমস্ত বিপদ আপদ অধিক কি প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক বাটীর প্রথম প্রবেশ পথে প্রবিষ্ট হইলাম। কিছুমাত্র আলোকের রশ্মি নাই, ঘুট ঘুট ঘনাবৃত অন্ধকার! এক হস্ত দূরের বস্তু গভীর অন্ধকারে লুক্কায়িত। আপনার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, অন্ধকার আবরণে আমিও প্রায় লোকলোচনের দৃষ্টি বহির্ভূত, আমার অস্তীত্বে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী বলিয়া আমি যে একটা জীবিত দস্যু শীকার অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতেছি, আমিই তার যেন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি মাত্র, ক্রোড়াগত প্রাণী আমাকে অন্ধকারের প্রতিকৃতি ভাবিলেও ভাবিতে পারে! যথাসম্ভব ধীর ভাবে যতদূর সোচ্ছ্বাসে আমার পদদ্বয় উঠিতেছে, পড়িতেছে, ততোধিক সাবধানে আমার শ্রবণ যুগল জাগ্রত রহিয়াছে, খুট করিয়া কোথায় কোন একটি মৃদুমন্দ শব্দ উঠে, বজ্রপাত-সন্ত্রস্ত আমার কর্ণ মন অমনি কি একটা অজানিত ভয়ে ভীত চকিত হয়। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে এক পা—এক পা—করিয়া প্রথম মহলটা উত্তীর্ণ হইলাম। দেবীরাণীর কণ্ঠ-ঝঙ্কার

আর নাই, কেবল উপর হইতে একটা গুন্ গুন্ শব্দ শুনিতেছি মাত্র, নিম্নতল একেবারেই নীরব নির্জ্জন!

আবার স্থললিত তানে আর একটি মধুর গীতিঝঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিক্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল! এবার বেশ বোধ হইল, যে কোণের ঘরে আমি বনলতা বেশে "মঙ্গলা-বুড়ীর" সহিত কাথাপকথন করিয়াছিলাম, সেই ঘর হইতেই যেন শব্দস্রোতঃ নামিয়া আসিতেছে। অতি সতর্কতার সহিত সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিলাম! প্রশস্ত দরদালান, সেই কোণের ঘরের দিকে একটা কুলুঙ্গিতে একটা প্রদীপ টীম্ টীম্ করিয়া জলিতেছে মাত্র, সে আলোর কিরণ এত অল্প যে তাহারি কিয়দংশ স্থান মাত্র অধিকার করিয়াছে, আমি যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারে! আর অগ্রসর হইতে সাহস হইতেছে না, সিঁড়ির কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিতে লাগিলাম।

গীত *

আমি ভিখারিণী, পথের কাঙ্গালিনী,
যতন নাহি জানি,—
তোমায় কি দিব হে রতনমণি!
কি আছে আমার— কি দিব তোমায়?
আছে শুধু হৃদিখানি;
তাহে বসাইয়ে প্রেম পূজা দিয়ে
দান দিব প্রেমখনি।
তুমি মদনমোহন রমণীরমণ
ভিখারিণী মহানিধি,
আমি কিছু নাহি চাই দেখা যেন পাই,
বুকে রাখি নিরবধি।

* কীর্ত্তন——রূপক-একতালা।

সেই গৃহ হইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বিকৃত কণ্ঠে এই কথা গুলি শুনিতে পাইলাম। "বহুৎ আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা, ক্যাবাৎ সাবাস্ বিবিজান!"

একি কাণ্ড! দেবীরাণীর স্বর্গীয় গীতি ঝঙ্কারের এই বীভৎস্ উত্তর? এ আবার কি ব্যাপার! যেমন করিয়াই হউক, প্রকৃত তথ্য আমাকে জানিতেই হইবে। অতি নিঃশব্দে যেন হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া দরজার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাহাতেই বা আমার দৃষ্টির বাধা কি? ভাঙ্গা কবাট, ফাটালের মধ্যে দিয়া যাহা দেখিলাম,—হা সংসার! হা কোটী নরকের আধার পৃথিবি! এখনও কেন একাকার প্রলয় প্লাবনে প্লাবিত হইতেছ না? এ কি স্বপ্ন?—একি কোন দুর্ব্বোধ্য ইন্দ্রজালে আমি জড়িত? কি দেখিলাম, ওরে, কি ভয়ঙ্কর কি হৃদয়বিদারক দৃশ্যই আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম! বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ভেদ হইয়া গেল,—বজ্রাগ্নিতে যেন আমার চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হইয়া গেল, থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলাম!

আমি বলিতে পারি না, ভাবিতে পারি না, আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী চলিতে চাহে না! শুনিবেন? পাঠক মহাশয়! এই অভাগার কথা শুনিবেন? ঘরের মধ্যে কে কে আছেন শুনিবেন? যাঁর ছায়া খানি একবার মাত্র মানস-দর্পণে পড়িলে এই যম-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই, যাঁর একটি কথা শুনিতে পাইলে জগতের কথা ভুলিয়া যাই, যিনি আমার এই অকূল পাথারের ধ্রুবতারা, সেই—সেই—আমার প্রাণদায়িনী বীরজাদেবী অতি ঘৃণিত সামগ্রী সমূহে বেষ্টিতা হইয়া মদের বোতল লইয়া কাহার সহিত রসালাপ করিতেছেন জানেন? উঃ বলিতে পারি না রে! আমার,—**আমার সেই পিতার সহিত!!** নির্ম্মম চণ্ডালাধম অদ্ভুত প্রকৃতি পিতা নামের অযোগ্য আমার—**আমার পিতা সেই হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত!!!** আমি ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না, চীৎকার ধ্বনি যেন আমার মুখমধ্য হইতে উগারিয়া পড়ে। আমার বক্ষঃ ফাটিয়া হুতাশ নিশ্বাস প্রলয়ের



ঝঙ্কারে বাজিয়া পড়ে! কোন্ প্রাণে যে তখন সেই নয়নভেদী দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা এখনও স্থির বলিতে পারি না।

আমার মদোন্মত্ত পিতা জড়িত কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "চালাও পানুসী, আজ ভারী আমোদের দিন! ঢাল মদ, প্রাণ তর করে দাও—আমার দেল-খোস্ বিবিজান!"

সেই অতুলনীয় রূপরাশি যাহার সম্মুখে, সে কি স্থির থাকিতে পারে? তায় মদোন্মত্ত! মাতালটা বীরজা দেবীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। বীরজাও তৎক্ষণাৎ সুকৌশলে আত্মসংবরণ করিয়া তাহার মুখে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া দিলেন।

পিতা।—"চালাও চালাও! লাগাও নাচ-গানা! জুড়িয়ে দাও কেন যাদু? গাও, গাও! ক্যা ফুর্‌তি—ক্যা ফুর্‌তি।"

হুকুম হইবামাত্র বীরজা দেবীর কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল!

গীত। *

ব'সে বঁধুয়ার পাশে গলা ধ'রে হেসে হেসে
আধ আধ প্রেমভাষে— ব'লে গেল সে,—
'যাবত জীবন রবে জীবন তোমারি হ'বে,'
আরো যে কতই কথা ব'লে গেল সে,—
তখন সে কথা শুনে বিশ্বাস হইল মনে,
'প্রেমে বাঁধি নিরবধি থাকিব দু'জনে',
কত দিন হ'ল গেল! কত রাতি পোহাইল!!
বঁধুয়া বিবশা হ'ল—— কই এল সে?

---

* জয়জয়ন্তী-মিশ্রিত তুক্ক——একতালা।

"এই যে বাবা তোমার বঁধুয়া তোমার চরণ তলে যাদু?" বলিয়া মাতালটা তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

আমার পিতা নামক সেই দুর্ম্মদ ব্যক্তির জঘন্য ঘৃণিত মাতলামি আর কত লিখিব? চূড়ান্ত রকমের যতদূর হইতে পারে! এও আবার এক চিন্তার বিষয়, মাতালের প্রশ্নে দেবীরাণীর বাক্যে একটিও প্রত্যুত্তর নাই কেন? কেবল মধ্যে মধ্যে অতি মধুর প্রাণ মাতোয়ারা অস্ফুট হি হি হাস্য, অন্তর্ভেদী বিলোল কটাক্ষ, নানাবিধ হাবভাব এবং মুহুর্মূহুঃ মদ্য প্রদান! সঙ্গীতাদেশ শ্রুতমাত্রেই দেবীরাণী অমনি মনোমোহিনী কণ্ঠে দশ দিক মাতাইয়া তুলেন! এতাধিক সাবধানে, এতাধিক সন্তর্পণে মাতালের সহিত ব্যবহার করিতেছেন যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! ধরা ছোঁয়া নাই অথচ দুর্দ্দম উন্মত্তকে কি এক অমানুষিক বুদ্ধিবলে স্থির রাখিতেছেন! তবে কি এ ঘটনা প্রকৃত নয়? দেবীরাণীর এ সমুদয় ভাণ? কোন একটা কি বিশেষ কার্য্যোদ্ধারের জন্য বীরজাদেবীর এই মহাকৌশলের অবতারণা?

হাঁ নিশ্চয়ই তাই; মহাপূজ্যা মহাবুদ্ধিমতী সতীর আদর্শরূপিণী বীরজা দেবী কি একটা মাতালের উপভোগ্যা হইতে পারে? মাতাল আবার যে সে নয়? সত্য হোক মিথ্যা হোক জানি না—একদিন ত ইঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম? এতদ্ভয়ে কি এইরূপ বিসদৃশ অঘটনীয় একটা লোকবিগর্হিত সম্বন্ধে জড়িত হইতে পারেন? অবশ্যই দেবীরাণীর কোন মহাকৌশল!

ও: ঠিক্ ঠিক্! কি আশ্চর্য্য, কি মূর্খ—কি জ্ঞানশূন্য আমি! গোবিন্দলাল ত পূর্ব্বেই আমাকে তাহার নিরূপিত স্থানে বলিয়া গিয়াছে, আজ আমাকে কোন একটা দৃশ্য দেখাইবে, যথেষ্ট সাবধান করিয়াও দিয়াছে; তাহাতে যেন আমি বিচলিত না হইয়া পড়ি! আরও বলিয়াছে, 'যে দৃশ্য দেখাইব, তাহা প্রকৃত নয়—ভাণমাত্র!' সে ঘটনা—সে দৃশ্য ইহা ভিন্ন আর অন্য কখনই হইতে পারে না।

এতক্ষণের পর দেবীরাণীর একটি কথা ফুটিল "বলি, সারারাত মদ খাবে না কাজ কর্ব্বে?"

মাতাল।—"এর চেয়ে আর অন্য কি কাজ আছে বাবা? তুমি হাতে ক'রে মদ ঢেলে দেবে এতে সারারাত কেন, জীবনটাই কাটিয়ে দিতে পারি। বল্ বল্, শশি, এ আমোদ ত চিরকাল পাব? আজ একবৎসর কাল তোর জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কত কষ্ট দিয়েছিস বল দেখি? ঘুরে ঘুরে হায়রাণ পেরেশান হয়ে আজ তোমার দেখা পেয়েছি; আর কি তোরে ছাড়ব রে? শশিমুখি! শশিবালা! একটা হা,—"একটা হেঁাচট খাইয়া মাতালটা দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেল!

একি কথা শুনিলাম? দেবীকে শশীবালা বলিয়া সম্বোধন করিল কেন? শশীবালা! শশীবালা! কোথায় এ নাম শুনিয়াছি, এ নাম যে আমার বেশ জানিত বলিয়া বোধ হইতেছে, কোথায়? কোন্ চক্রের কোন্ সুত্রের কথা? ওঃ ঠিক ঠিক,—স্মরণ হইল বটে! এঁ্যা দেবীরাণি! কত নাম তোমার? তোমারই নাম শশীবালা? ১০ নং গারদে যে গুপ্ত ছিদ্র আছে, তাহারি উপরে অপরিচ্ছন্ন ভাবে শশীবালার নাম পাঠ করিয়াছি; য়্যাঁ! সেই শশীবালা তুমি? কি জটিল! কি গভীর রহস্য!

ক্রমে ক্রমে মাতালের কথা আরো জড়িত হইয়া আসিতেছে,—সেই জড়ান জড়ান গলায় বলিয়া উঠিল, "শশি! আর এক গ্লাস মদ ঢেলে দে, গলা যে শুকিয়ে উঠল!"

হি হি হি হি রবে অতি সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া শশীবালা কহিলেন, "না, আর মদ দেব না, আজ সেই কথার জবাব দাও।"

মাতাল। "চুপ কর, ক্ষান্ত দাও বাবা, নেশাটা বেশ জমাট বেঁধে আসছে, কেন চটিয়ে দেবে চাঁদ? ও সব কথা ছেড়ে দেও,—যা চল্‌চে চলুক, চালাও চালাও পান্‌সা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

শশীবালা। "অমন চেঁচাও ত আমি উঠলুম।" বলিয়াই ত্রাস্তে উঠিয়া পড়িলেন।

মাতাল। "চটারাম কেন বাবা? বোসে বোসো; ফুরতির দিন ফুরতি কচ্ছি, চটে মার কেন প্রাণ! আর এক গ্লাস মদ দাও ত আমার পুন্নিমের চাঁদ!" তাঁহাকে ধরিয়া বসাইতে যায় দেখিয়া, শশীবালা আপনিই বসিয়া

পড়িলেন এবং নিমেষ মধ্যেই আর এক গ্লাস মদ তাহার মুখে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোমার কথা রাখা, এই বুঝি তোমার শপথ ? যাও যাও বুঝেছি, এমনি করেই তোমরা আমাদের দমে ফেল। জীবনে কখন আমি মদ ছুঁইনি, খালি তোমার খাতিরে, আর সেই কথা শোন্‌বার জন্যই আমার এ গ্রহ, নইলে আমার এ মাথা ব্যথা কেন বল দেখি ? বোল্‌বে না ? বোল্‌বে না ? বুঝেছি, মেয়েমানুষকে কাঁদাবে না ত আর তোমাদের কাজ কি ?"

পলক মধ্যে চক্ষে জল আসিল,—আমরি মরি! এও এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!

মাতাল কহিল, "মাইরি ব'লছি শশি! কাল সব কথাই তোমায় খুলে বোল্‌ব, আজ যেমন চল্‌ছে তেমনি চলুক।"

শশীবালা। "আমি কখনই তা শুন্‌ব না। যদি আমাকে সব কথা খুলে না বল, এখনি রায় মশায়কে ডেকে তোমার রীতের কথা ভাঙ্গব। জোর কোরে আমার সতীত্ব নষ্ট কত্তে এসেছ, তাও কিন্তু ছাপা থাকবে না! বল ব্রজেন্দ্রভূষণ তোমার কে ?"

মাতালটা উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল ঃ—

গীত। *

" যাতেথি মেই জল ভরণে ও রাধাপ্যারি,
কানাইয়া রো'কে ঠারেরে!

দেবীরাণী। 'ওকি! আবার গান ধল্লে যে ?'

মাতাল। হাত মে লোটা শির মে ঝারী পাঁওমে ভারী,
ছোড়দে মেরি কানাইয়া, বেঁইয়া হাঁমারী,—
গোপালা রোকে ঠারে রে!"

উন্মত্তবৎ ধেই ধেই নৃত্য করিতে লাগিল!

---

* টোড়ী—খেম্‌টা।

দেবীরাণী। "ও কি সব মাতলাম হচ্চে ? দেখ, তুমি যাই কর না কেন, কোন রকমেই আমাকে ভোলাতে পাচ্ছ না। বল বল্‌ছি ; তা নইলে এখনি একটা ভয়ানক কাণ্ড বাঁধাব !"

মাতাল। "আমিও কি ভয়ানক কাণ্ড বাঁধাতে পারি না বাবা ? আপোসে মিটিয়ে নাওনা শশি !"

দেবীরাণী। "বল্‌বে না ?"

মাতাল। "ব্রজেন্দ্র কে, আমি কি জানি ? ও তোমায় গোড়ায় দম দিচ্ছিলুম ! নাও—নাও ও সব কথা ছাড়, মদ ঢাল !"

দেখিতে দেখিতে দেবীরাণীর মুখ চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ কি একটা চিন্তা করিয়া স্থির হইয়া আর এক গ্লাস মদ ঢালিলেন। কহিলেন, "ভাল হরিহর বাবু ! যদি নিতান্তই না বলেন, আমি মেয়ে মানুষ, কি কত্তে পারি বলুন ? একখানা নাকি উড়ো চিঠি বড় গোল বাঁধাচ্ছে, সেই বিষয়টা নাকি অমনি অমনি মিট্‌ত !"

এতক্ষণের পর মাতালটার মস্তকের টনক নড়িল, অমন যে দুর্ব্বৃত্ত, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কহিল, "কি কি চিঠি ? কি রকম চিঠি ? কোথা থেকে এসেছে ?"

দেবীরাণী। "কার চিঠি, কোথাকার চিঠি, এ সব কি উড়ো চিঠিতে থাকে ? পেয়েছি কোন চিঠি ; তা থাক, এই নাও গেলো !"

মাতাল। "পথে এস বাবা, মিছে একটা ধোঁকা দিয়ে প্রাণটাকে আড়ষ্ট কর কেন চাঁদ ?"

একটা লোক যেন সিঁড়ি বহিয়া উপরে আসিতেছে ; এতক্ষণের পর আমার যেন হুঁস হইল। নিদারুণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, আমি যে ভয়ানক বিপদ-জালে জড়িত হইয়াছি, এতক্ষণের পর যেন আমার জ্ঞান হইল। চারিদিকে নীরবে ছুটাছুটী করিতেছি, দেখিতে দেখিতে লোকটা একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। আঃ রক্ষা পাই, লোকটি আর কেউ নয় গোবিন্দলাল।

গোবিন্দলাল আমার হাত ধরিয়া চুপি চুপি আমাকে সিঁড়ির কাছে লইয়া

গেল, কহিল, "দেখুন দেখি, কি ভয়ানক ছেলে-মানুষি কাজ করেছেন আপনি? আমি চারিদিক আপনার সন্ধান করে এলুম; কোথাও আপনার দেখা না পেয়ে, একটা বিপদ আশঙ্কা ক'রে দেবীরাণীকে খবর দিতে এসেছি। যাক্ সে কথা; ঘরের ভিতর কে কে আছেন, সব দেখেছেন ত?"

আমি। "সব দেখেছি গোবিন্দলাল, সব দেখেছি। দেখে শুনে আমার মাথা ঘুরে গেছে!"

গোবিন্দলাল। "এই দৃশ্য দেখাব বলেই আপনাকে আন্‌ছিলাম। এখন কত দূর কি বুঝ্‌লেন বলুন দেখি?"

আমি। "আমি কে কি বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য দেবীরাণী ঢের ফিকির কচ্ছেন; কিন্তু লোকটা কিছুতেই কাণ পাতছে না। গোবিন্দলাল! শেষে একটা উড়ো চিঠির কথা শুনে লোকটা অনেক নরমেছে বলে বোধ হচ্চে। সে উড়ো চিঠি সত্য না দম?"

গোবিন্দলাল। "সত্যিও বটে, দমও বটে! তা হ'লে কিছুতেই লোকটা ভাঙ্গছে না কেমন?"

আমি। "না, কিছুতেই নয়।"

গোবিন্দলাল কি ভাবিয়া কহিল, "একি সহজে মেটবার? এক কাজ করুন; আমি এখন ঘরের ভিতর গিয়েই দোর দেব, আপনি যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন। এ মহলের সব দরজা দিয়ে এসেছি, কারুর আসবার আর সম্ভাবনা নাই।"

গোবিন্দলাল অগ্রসর হইল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইলাম। গোবিন্দলাল গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই মাতালটা উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্ট এবং অত্যন্ত জড়িত স্বরে কহিল, "আরে গোবিন্দলাল যে! এস, এস, ব'সে যাও—ব'সে যাও!" বলিয়া দেবীরাণীর সম্মুখ হইতে বোতলটা কাড়িয়া লইল, এবং স্বহস্তে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া গোবিন্দলালের হস্তে দিয়া বলিল, "এস! খালি ফুরতি—খালি ফুরতি লাগাও! গোবিন্দলাল! অনেক কষ্টে অনেক দিনের পর আজ আমার প্রাণের প্রাণ শশীবালাকে পেয়েছিরে! আমি নিজে ঢেলে দিলেম, চুক ক'রে মেরে দাও বন্ধু!"

গোবিন্দলাল যেন কত বিনয়ে কত ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত গ্লাসটি ধরিয়া কহিল, "আজ আমার কি সৌভাগ্য! হরিহরবাবু স্বয়ং আমায় বন্ধু ব'লে খাতির কচ্চেন, নিজে হাতে ক'রে মদ ঢেলে দিলেন; কিন্তু আমার কি এত বড় সাহস, সেই মদ আপনার সুমুখে ব'সে খেতে পারি?" গ্লাসটি নামাইয়া ত্বরিত উঠিয়া গৃহের একটা কোণে পশ্চাৎ ফিরিয়া কি করিল জানি না, কিন্তু গ্লাসে কি একটা যেন মিশাইয়া যথাস্থানে উপবেশন করতঃ গ্লাসটিকে পূর্ণ করিয়া অতি ভক্তির সহিত মাতালটাকে পান করাইল।

দেবীরাণীর চক্ষের সহিত গোবিন্দলালের চক্ষে একটা অপ্রস্ফুটিত বিদ্যুৎ খেলিয়া উঠিল, বুঝিতে পারিলাম না। দেখিতে দেখিতে হরিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ওরফে আমার পিতৃদেবের শিরঃকম্পন আরম্ভ হইল, অস্ফুট বিজড়িত বাক্য ক্রমে নীরব, চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল, যেন কি বলিতে যাইয়া বলিতে পারিল না, সজোরে একবার দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, পারিল না, সটান চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল।

একি! গোবিন্দলাল কি বিষ খাওয়াইল? নচেৎ হঠাৎ ইহার এরূপ ভাবান্তর কেন? একি সর্ব্বনাশ! দেবীরাণী কি সত্য সত্যই নরহত্যার সহকারিণী হইলেন? থাকিতে পারিলাম না, বেগে দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

সহসা আমাকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া, দেবীরাণী অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "এ কি! তুমি আকাশ হ'তে নেমে এলে নাকি? একি ব্যাপার?"

তাঁহার কোন কথার উত্তর না করিয়া, মৃতবৎ শয়িত আমার পিতার পার্শ্বে অতি দ্রুতবেগে উপস্থিত হইলাম; নাসিকা বক্ষঃদেশ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, তিনি মৃত নহেন; বক্ষঃস্থল ধুক্ ধুক্ করিতেছে—নাসিকায় নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। দেবীরাণী উচ্চ-হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই,—তুমি পিতৃহীন হও নাই। গোবিন্দলাল! মায়ার খেলাটা দেখেছ? আহা, হাজার হোক, পিতার পুত্র!" গোবিন্দলাল উচ্চহাস্যে ইহার প্রত্যুত্তর করিল।

আমি বিষম লজ্জিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম।

দেবীরাণী গোবিন্দলালকে কহিলেন, "কোন কথাই ত পেলেম না; এখন গোবিন্দলাল! জামার পকেটগুলি বেশ ক'রে খুঁজে দেখ দেখি, একটা চাবি পাও কি না?"

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের পর গোবিন্দলাল একটা বড় চাবি বাহির করিল; দেবীরাণী সানন্দে কহিয়া উঠিলেন, "জয় জগদীশ্বর! তোমার কৃপায় আজ এত দিনের পর আমাদিগের আশার বস্তু পেলেম! গোবিন্দলাল, এই চাবির ভিতর সমস্ত রহস্য আছে, এই কথা আজ সকালে রায়মোশা'য়ের মুখ থেকে কতকটা শুনেছি।"

গোবিন্দলাল। "সেকি! সে আবার কি?

দেবীরাণী। "তবে সমস্ত কথা শোন; আজ সকালে হরিহরবাবু আর রায়মোশাই কিসের একটা পরামর্শ ক'চ্ছিলেন; আমিও গোপনে থেকে এঁদের সমস্ত কথাই শুনলেম; কিন্তু বুঝ্‌তে পাল্লেম না। কতক সাটে সোঁটে কতক আকার ইঙ্গিতে, কতক চুপি চুপি; এতে সব কথাই বা বুঝ্‌ব কেমন ক'রে? তবে এই চাবির সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা আছে, সে সব কথা তোমার এখন শুনে কাজ নেই। হরিহরবাবুর নিকট রায়মোশাই চাবিটা রাখলেন, তা আমি বেশ দেখলেম। ব্রজেন্দ্রভূষণ গারদ থেকে পালিয়েছেন, সেই তদ্বিরের জন্য তিনি এখন বড়ই ব্যস্ত। রায়মোশায়ের চলে যাবার পর আমি হরিহরবাবুর নিকট ধরা দিলেম। আমাকে পেয়ে ত লাফিয়ে উঠলেন, আমিও এই চাবিটার উপর বিশেষ লক্ষ্য রেখে—গোবিন্দলাল! ছি ছি! আজ আমাকে বেশ্যার অভিনয় কত্তে হ'ল!"

আহা আহা, সেই ডাগর ডাগর সুটানা চক্ষু দুটি জলে ভাসিয়া গেল, লজ্জারক্তিম মুখখানি অবনত হইল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া দেবীরাণী পুনর্ব্বার কহিলেন, "তবে আর দেরী নয়, জয়পালকে ডেকে এখনি হরিহরবাবুর সেবায় নিযুক্ত কর। জয়পালকে বিশেষ রকম সাবধান ক'রে দাও, যেন কিছুতেই জান্‌তে না পারে, যে আমাদের সেই জ্ঞানহরা ঔষধেই ইনি মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, চাবির কথা জিজ্ঞাসা

কল্লে, জয়পাল "আমি জানি না' এই কথাই যেন বলে ; আরো যা যা বলতে হবে, যেন বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তার জবাব দেয় !"

গোবিন্দলাল। "তবে আপনারা কি এখনই রওনা হবেন ?"

দেবীরাণী।—"তার আর ভুল আছে ? ভাল কথা, রায়মোশাই এখন সেইখানেই আছে ঠিক জান ত ?"

গোবিন্দলাল। "হাঁ সেখানেই আছে, সেখানেও এমন ভৈরবীচক্র !"

দেবীরাণী।—"তবে রায়মোশায়ের মুখও এখনি বন্ধ কর্ত্তে হবে! রাত কত হ'ল ?"

গোবিন্দলাল। "আন্দাজ দশটা।"

দেবীরাণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তবে চল, আর দেরী করা হবে না ; আর একটা শোন, তুমি জয়পালকে ডেকে দিয়েই শ্মশানঘাটে নৌকা নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করগে।" গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। অতঃপর আমার প্রতি কহিলেন,—"চলে এস, আর এক মজা দেখাইগে !"

দেবীরাণীর কার্য্যকলাপ, অলৌকিক বুদ্ধিচাতুর্য্য, অভূতপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া আমি ত নির্বাক্ ! আমি অনেকক্ষণ তাঁহার মুখপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলাম। আমি এমন হতবুদ্ধি হইয়াছি যে, আমার চক্ষেও পলক পড়ে না, মুখেও বাক্য সরে না।

বীরজাদেবী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; অতি সুমধুরকণ্ঠে কহিলেন, "উঠে এস, অমন ক'রে ব'সে রইলে যে ?" হস্ত ধরিয়া আমাকে উত্থান করাইলেন। আমি ভাবে গদগদ হইয়াছি, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম ! "কোথায় যাব ? তোমার পায়ের দাগ গুণে গুণে— তোমার পায়ের দাগের উপর দিয়ে আর কত দিন এমনি অন্ধকারে অন্ধকারে বেড়াব ? অনাথ আতুর আমা হেন একটা জন্মান্ধ সংসারভ্রষ্ট কাঙ্গালকে আর কত দিন হাত ধ'রে নিয়ে বেড়াবে ? আমার জন্য—এই অভাগার জন্য কত দিন আর সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে ? আমার চক্ষু খুলে দাও, আমার চক্ষে আলো জেলে দাও, আমায় পথ দেখিয়ে দাও, আমাকে এই অকূল সমুদ্রে কূল দাও ! আর একবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল,—তুমি দেবী না দানবী ?

চতুর্ব্বিংশ চক্র।

ভৈরবী চক্র !!

পিতাপুত্রে একত্রে মিলিত হইয়া নিতান্ত উদ্বেলিত চিত্তে অশুভক্ষণেই যে বাটীতে আমি শ্বশুরবাড়ী ভ্রমে পদার্পণ করিয়াছিলাম, যে বাটী হইতে আমার বিপদময় সংসারের প্রথম চক্র ঘূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যে বাটীতে প্রবেশাবধি আমার ক্ষীণ প্রাণটি ওষ্ঠাগত হইয়া রহিয়াছে, যে আনন্দা-বাস শ্বশুরবাড়ী যমের বাড়ী অপেক্ষাও ভীষণতায় রূপান্তরিত হইয়াছে, জানি না কি অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দেবীরাণীর সহিত পশ্চাৎ দিকের একটা সঙ্কীর্ণ গুপ্ত পথ দিয়া সেই বাটীর অভ্যন্তরে আবার প্রবিষ্ট হইলাম। কষ্টে স্বষ্টে কতক দূর আসিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ির পথে একটা আলো হস্তে গঙ্গাধর দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিলাম। আমরা তিন জনে নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া আসিলাম। গঙ্গাধরের কাণে কাণে দেবীরাণী চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। অতঃপর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এই খানে গঙ্গাধরের সহিত একটু অপেক্ষা কর, ভাবগতিক বুঝে এখনি আমি ফিরে আস্‌ছি।" গঙ্গাধরের নিকট হইতে আলোটি লইয়া দেবীরাণী প্রস্থান করিলেন।

সেই ভয়াবহ নির্জ্জন বাটীতে গঙ্গাধরের সহিত নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ভয়কম্পিত প্রাণে কিছুক্ষণ লুকাইয়া রহিলাম। গঙ্গাধরকে চুপি চুপি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কোন কথার উত্তর করিল না। কেবল বলিল, "আমার মুখ থেকে আর কি শুন্‌বেন? এখনি দেবীরাণী আপনাকে উপস্থিত ঘটনা সব দেখিয়ে দেবেন।"

দেবীরাণীর প্রস্থিত পথাভিমুখে একটি ক্ষুদ্র আলো অন্ধকারের উপর জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আলো হস্তে করিয়া দেবীরাণী আমাদিগের নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গঙ্গাধরকে কহিলেন, "গঙ্গাধর! খুব সাবধান হ'য়ে মাঠের ধারে পাল্কী নিয়ে হাজির থাক গে। এই নাও তোমার আলো।" গঙ্গাধর আলো লইয়া চলিয়া গেল।

দেবীরাণী আমার পথপ্রদর্শক; তাঁহার হাত ধরিয়া কত ঘর কত দালান অতিক্রম করিতে করিতে একটা খোলা ছাদের উপর আসিলাম। এখানে আসিবামাত্র একটা বিকট হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। দেবীরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাচ্ছি? ব্যাপারখানা কি?" দেবীরাণী কহিলেন, "ব্যাপার বড়ই গুরুতর! তোমাকে এত কষ্ট দিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না; একটা বড় মজার কাণ্ড দেখাব ব'লেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" আবার বিকট হাস্যের সহিত উৎকট চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল! আমরা আর তথায় দাঁড়াইলাম না, আর একটা মহল অতিক্রম করিয়া ঘটনাস্থলের প্রায় সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম।

দেবীরাণী কহিলেন, "ঘরের ভিতর কে কে আছে, ঐ জানালার ফাটাল দিয়ে দেখি গে চল।"

অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জানালার ফাটাল দিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে লোকচরিত্রের উপর, বিশেষতঃ মায়াবিনী অধঃপতিতা স্ত্রীলোকের উপর নিদারুণ ঘৃণা জন্মিয়া গেল! কি দেখিলাম!! দেবচরিত্র দেবনারায়ণবাবুর সংসারলক্ষ্মী হৃদয়েশ্বরী পরিণীতা পত্নী শ্রীমতী জয়কালী দেবী রায়মহাশয়ের ক্রোড়ে বীভৎস বেশে বীভৎস ভাবভঙ্গীতে অর্দ্ধশয়িতা! ঘোর রক্তজবাসঙ্কাশ-বহিরাগত মদে মত্ত কুটীল চক্ষুর্দ্বয় তৎপ্রতি কুৎসিত লালসাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া নিপতিত! তদীয়া কণ্ঠ ও কটীদেশ দুরাশয় উভয় হস্তে বেষ্টন করত দোদুল্যমান হইতেছে; সম্মুখে মদের বোতল ও আর আর ঘৃণিত খাদ্য সামগ্রী বিশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে পাপ অনুচর শঙ্কর প্রভৃতি কয়েক জন নরাধম রায় মহাশয়ের চাটুবাদে ও অশ্লীল রহস্যালাপে বিভোর!

দেবীরাণী এ ঘৃণিত দৃশ্য দেখাইয়া আমাকে আস্তে আস্তে কহিলেন,

"পাপিনীর ঘৃণ্য মনের কি জঘন্য নারকীয় পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছ ত? দেববাবুর গৃহলক্ষ্মী আজ দস্যুদলের বিলাসিনী! ছি ছি! কি ঘৃণার কথা!"

এড়ান এড়ান স্বরে জয়কালী কি একটা কথা কহিল, গৃহ মধ্যে একটা হাস্যরোল উঠিল, আমাদের কর্ণে যেন তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

মদমত্ত রায়মহাশয় জড়িতকণ্ঠে কহিল, "বুঝ্‌লি পাগ্‌লি! আজকের রাতটা চুপ ক'রে থাক্; যে ব্রহ্মঅস্ত্র ঝেড়েছি, এতে সবাইকে প'ড়তে হবে। দেবা'র ভয় কচ্ছিস্ কি? আজকের রাতটা চুপ ক'রে থাক্ না। কাল সকালে তার মরা-মুখ তোকে দেখাবই দেখাব। ক'দিন যে আমি তোর জন্যে তার কাছে যেতে পার্‌ছিনে,—তা নইলে কোন্ দিন কাজ সাবাড় ক'ত্তেম। তারপর যা হবে বুঝ্‌লি ত ক্ষেপি?"

পাপিনী রায়মহাশয়ের সোহাগে গলিয়া আধ আধ স্বরে কহিল, "তুমি রোজ রোজ ঐ এক কথাই কচ্ছ! উঁ উঁ! এই কাজটা আর কত্তে পাল্লে না? উঁ উঁ! আমার ভয় করে না বুঝি? আমার ভাতারকে আমি বিষ খাওয়ালুম, কারা বাঁচালে বল দিকিন্? সে পোড়ারমুখো বুড়ো মড়া কেমন ক'রে ঘাট থেকে ফির্‌ল বল দিকিন? এতে নিশ্চয়ই সেই ছোঁড়ার কারচুপি আছে! তোমরা ত গরুর চেয়েও অধম! একটা ছোঁড়াকে আর মেরে ফেল্‌তে পাল্লে না? তারপর দেখ দিকিন, সেই নেম্‌লা ছোঁড়াটাকে বেশ ক'রে বুদ্ধি খাটিয়ে হাতে আনলুম, আমি তার বুকে বসেছি আর শঙ্কর তার মাথার ওপর লাঠি উঁচিয়েছে, মারি আর কি! এমন সময় কোত্থেকে কারা এসে বন্দুকের আওয়াজ ক'রে আমাদের মেরে ধ'রে অজ্ঞান ক'রে তাকে সরিয়ে দিলে বল দিকিন্? তোমাদের ঐ যে শশী বোলে ছুঁড়িটি, ওকে তোমরা সামান্যি ভেব না! ও এর ভেতর আছেই আছে! তোমরা ধর্‌তে ছুঁতে পার না, ও ভয়ানক খলিপে! ওর পেটে পেটে হারামজাদকী বুদ্ধি! ওকেও ত সরাতে পাচ্ছ না! যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে নেই!" মায়াবিনী মায়া কান্না আরম্ভ করিল।

রায়মহাশয় পাপীয়সীর চিবুক ধরিয়া পাপপূর্ণ পাপ-গণ্ডে বিশ পঁচিশটি চুম্বনের পর সমাদরে কহিল, "আজ রাতটায় মত যা যা বল্‌বার ব'লে নেও

চাঁদ, কাল আর এ চাঁদমুখ থেকে এ বুলি বেরুবে না, তুবড়ীর মতন খালি ফুর্‌তির ফোয়ারা ছুট্‌বে! বুঝ্‌লে প্রাণ! বেজাটাকে কি মারতে পারি না? সে ত পিঁপড়ে, এক টিপনীতে কবে পঞ্চত্ব পেত; খালি হরিহরবাবুর কথাতেই না এতদিন প্রাণে মারিনি? কোন একটা কারণেই না তাকে প্রাণে মারা হচ্ছে না? তার ভয় তোকে আর কত্তে হ'বে না! এবার সে জালে পড়েছে, অনেকবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, এবার তাকে যখন গারদে পুরিছি, তখন কার্য্যোদ্ধার না ক'রে আর তাকে ছাড়ছিনি। এবার যে কথা সেই কাজ; আর শশীর কথা বলছিস্? কি কর্‌ব বল্‌না, তোর বোন-শালীই যে সব মাটী ক'রে দিলে! শালীর আব্দারেই ত সব খারাবী হ'ল!"

রায়মহাশয়ের মুখে ভগ্নীর কথা শুনিয়া জয়কালীর যেন শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল! ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রন্দনস্বরে কহিল, "যেখান থেকে পার আমার বোনকে এনে দাও বল্‌ছি, তাকে তোমরাই কোথায় সরিয়ে রেখেছ। রোজ রোজ বল্‌ছ 'কাল আস্‌বে'; আমার সন্দ হচ্ছে, সে প্রাণে বেঁচে আছে ত?"

রায়মহাশয় কহিল, "কি বলিস্ পাগ্‌লি! ও সব কি অলক্ষণের কথা ক'স? যা বল্‌ছি শোন্; অনেক যত্নের বিশেষ গোপনের, এমন কি যার ভেতোর আমাদের সবাইকার মরণকাটি জীবনকাটি লুকান আছে, এমনি একটা পুঁটুলী, যার ভেতর অত্যন্ত দরকারী কাগজপত্র আছে, কোন একটা কাজের জন্যে আমি একবার বার ক'রেছিলুম। তোর বোনশালী হঠাৎ সেই ঘরের ভেতর এসে পড়ল, কিছুতেই আর তার চোক থেকে লুকুতে পাল্লেম না! কি রকম সে না-ছোড়-বান্দা ছিনেজোঁক জানিস ত? পুঁটুলীর ভেতর কি আছে জানবার জন্য ভয়ানক পেড়াপীড়ি আরম্ভ করলে। আমিও দেব-না,—সেও ছাড়বে না; টানাটানি ধস্তাধস্তি! শেষে একখানা থান ইট নিয়ে আমায় মারে আর কি? কি করি, তোদের দু'বোনকে কত ভাল-বাসি জানিস ত? তাকে অনেক দিব্যি দিলেসা করিয়ে, আমার পা ছুঁইয়ে পুঁটুলীর ভেতর কাগজ পত্র সবই দেখাতে হ'ল। দেখা শুনা শেষ ক'রে পুলিন্দাটা বেঁধে ছেঁদে গুপ্ত স্থানে রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় ফকিরচাঁদ দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, "শীঘ্র আসুন শীঘ্র আসুন, বড় ভয়ানক

কাণ্ড বেঁধেছে ! দেবনারায়ণ মুকুজ্জে জয়কালীকে বাজারের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়ে যাবে, লুটের মাল, যার ইচ্ছে সে নিয়ে যেতে পারে ।” তোকে বাজারের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে যাবে, আর কোন্ বেটা তোকে নেবে, আর কি আমি তিলার্দ্ধ দাঁড়াতে পারি ? দেয়ালের মধ্যে একটা গুপ্ত সিন্দুক আছে, তার ভেতর পুঁটুলিটা থাকে ; এমনি গ্রহের ফের, আর তাড়াতাড়ির কর্ম্ম কি না, ডালাটা এমনি চেপে পড়েচে কিছুতেই আর খোলা গেল না ! কি করি, কাজেই তোর বোনের হাতে পুঁটুলীটে তখনকার মতন রেখে তোকে লুটে আনবার জন্যে বাজারে যেতে হ’ল, তারপর যা যা হ’ল সবত তুই জানিস !”

রায় মহাশয়ের কথাগুলি শুনিয়া পুঁটুলীর মর্ম্ম কতকটা বুঝিলাম, আর পুঁটুলীটা যে বিশেষ দরকারি, তাহাও বুঝিলাম ; তবে কথা এই যে, সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে ভগ্নগৃহে মেজের নিম্ন ভাগে যে পুঁটুলী পাইয়াছিলাম, সেইটিই কি রায়মহাশয়ের কথিত পুঁটুলী ? রায়মহাশয়ের বাক্যে ইহার ত কিছুই প্রমাণ হয় না ? দস্যুর আড্ডায় দস্যুর গহ্বরে কতবিধ রহস্যময় বস্তুই লুক্কায়িত থাকে, তাহার ইয়ত্তা কি ? তবে একটা গুপ্ত সংবাদের সন্ধান ঘটনাক্রমে আমি পাইয়াছি। ইহাদের বাক্যে বুঝিতেছি যে, জয়কালীর ভগ্নী নিরুদ্দিষ্টা ; কিন্তু আমি বলিয়া দিতে পারি, জয়কালীর আদরিণী ভগ্নী অনন্ত-শয়নের সঙ্গিগণের সহিত কবর মধ্যে চিরনিদ্রায় মগ্না। এ সংবাদ হয়ত ইহারা কেহই জানে না ! দেবীরাণীকে এই সমস্ত কথা কোন স্থলে বলিবার জন্য প্রয়াস পাইলাম ; কিন্তু তিনি আমাকে স্থির নীরবে থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন ।

আর একবার সুরার স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া গেল ! সেই ভৈরবী-চক্রের ভৈরবী স্বরূপিণী শক্তি জলকালীর প্রসাদী সুরা, রায়মহাশয় হইতে পর পর সকলেই সানন্দে পান করিতে লাগিল। গণ্ডগোল, উত্থান, পতন, শয়ন প্রভৃতির জঘন্য মাতলামী কাণ্ডের কথা মাথা-মুণ্ড আর কি বলিব ! আমার আর তিলার্দ্ধ থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না ; দেবীরাণীর কিন্তু কি ধৈর্য্য-গুণ ! পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় অবিচলিতচিত্তে জানালার ফাটাল মধ্যে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন ।

এ দিকে গৃহ মধ্যে প্রায় সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিল, যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে তাহাই করিতে লাগিল। সহসা দেখিলাম, ইহাদের মধ্যে একটি ভদ্রবেশধারী যুবক, আমরা যে জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, সেই জানালার দিকে ঘন ঘন সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছে। গৃহ মধ্যস্থিত কয়েকটি প্রজ্জলিত আলোকের কতিপয় শিখা, জানালা দরজার ফাটাল ভেদ করিয়া আসিয়া আমরা যে স্থানে দণ্ডায়মান আছি, সেই স্থানটির অনেকটা অন্ধকার নষ্ট করিয়াছে। সেই ছায়া আবছায়ার মধ্যে দেবীরাণীর মুখ চক্ষু দেখিয়া বুঝিলাম যে, গৃহস্থিত যুবকের চাহনীতে যেন ইনিও উপস্থিত বিচলিত হইয়াছেন, পাষাণপ্রতিমা যেন ইতস্তত: করিতেছেন! মনে মনে ভাবিলাম, দেবীরাণীর কোনরূপ উদ্দেশ্য আছে। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া শুধুই একটা ঘৃণিত মাতলামী কাণ্ড দেখিবার পাত্রী কখনই ইনি নহেন।

ভিতরে আর একটা উৎকট হাস্য কল্লোল উঠিল! জয়কালীকে লইয়া নাচাশয় রায়মহাশয় উন্মত্তপ্রায়, পারিষদবর্গও ক্রমে বিভোর! ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে দেখিলাম, দরজাটি খুট করিয়া খুলিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে ভদ্রবেশধারী সেই যুবকটি দেবীরাণীর সম্মুখে আবির্ভাব! একি আশ্চর্য্য কাণ্ড! ভয়বিস্ময় যুগপৎ আমার প্রাণের মধ্যে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল!

সেই যুবকটি দেবীরাণীর কর্ণে কি চুপি চুপি কথা বলিল, তাড়াতাড়ি সব শুনিতে পাইলাম না, তবে দেবীরাণীর এই একটি মাত্র অস্ফুট ধ্বনি শ্রুত হইলাম। "হাঁ বিজয়, এই সময়" বলিয়া তাহার হস্তে কি পদার্থ দিলেন। লোকটিও ধাঁ করিয়া যেন হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া গৃহ মধ্যে ঠিক পূর্ব্ব ভাবে আবির্ভূত হইলেন।

দেবীরাণী বড়ই বিচঞ্চলা,—যেন কি একটা ভয়ানক কার্য্যের সহায়তা করিলেন! যুবকটি অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে সবার অবস্থা মানসচক্ষে একবার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল। বিশ্বোন্মাদকারিণী সুরাদেবীকে বক্ষে ধারণ করত: বোতলটি ঠিক রায়মহাশয়ের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত। যুবক ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। বেশ গাম্ভীর্য্য সহকারে অম্লানবদনে

বোতলটি একবার আলোকের নিকট লইয়া গিয়া সকলকার ভাগ্যে প্রসাদিত হইবে কি না নাড়িয়া চাড়িয়া যেন পরীক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অতি সুকৌশলে বেশ দক্ষতার সহিত কি একটা (বোধ হয় দেবীদত্ত) পদার্থ ঢালিয়া দিল। তাহার পর কাহাকেও বলিতে হইল না, সাধিতে হইল না, রায়মহাশয় ও জয়কালী হইতে সকলেই এক এক পাত্র পান করিতে লাগিল। সকলেই স্ফূর্ত্তিমান এবং আনন্দময়, কেহ আপত্তি করিল না, পরম তৃপ্তির সহিত সকলেই উদরস্থ করিয়া ফেলিল।

ইহার পর ইহাদিগের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, বুঝিতে বড় আর বাকী রহিল না। যথায় মদোন্মাদ ব্যক্তিগণ মদ্যপানে গাঢ় নিবিষ্ট, যথায় দেবীরাণীর গুপ্ত-পদসঞ্চালন, যথায় কোন গুপ্ত ব্যক্তির কোন এক অদৃশ্য দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ, তথায় যে মুহূর্ত্ত ভবিষ্যতের কি পরিণাম, তাহা আমার স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে আর বড় বিলম্ব হইল না।

যাহা ভাবিলাম, ঠিক তাহাই হইল; রায়মহাশয়ের কুটীল চক্ষুর্দ্বয় ক্রমেই শিব-নেত্রে পরিণত হইল, দেহদোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কি করিতে যায় পারে না, একটা গোঁয়ানি শব্দে কি বলিতে গেল বুঝিতে পারা গেল না। দেহ যেন মস্তকের গুরুভার আর ধারণ করিতে পারে না, ঢুলিতে ঢুলিতে জয়কালীর সহিত শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

জয়কালীর ঠিক সেই দশা; নিস্পন্দ চেতনহীনা মৃতার ন্যায় রায়মহাশয়ের পার্শ্বে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে শয়িতা! দেখিতে দেখিতে গৃহস্থ সকলেই কে কার ঘাড়ে শুইয়া পড়িতে লাগিল। এত যে হাস্যরোল—এত যে আমোদ কল্লোল—এমন যে রায়মহাশয়ের স্বভাব, দেবীরাণীর যেন একটি ইঙ্গিতেই সব জুড়াইয়া গেল! সকলেই নিপতিত, কেবল সেই যুবকটিই জাগ্রত জীবন্ত, অতুল উল্লাসে উল্লসিত।

আমাদের দিকে চাহিয়া যুবকটি বলিয়া উঠিল, "আর কি? সব জুড়িয়ে গেছে, আসুন।"

দেবীরাণী ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

আর এক মুহূর্ত্তও কাল বিলম্ব না করিয়া, যুবকটি রায়মহাশয়ের পরিচ্ছদ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যেন কোন দ্রব্যের আশায় বিশিষ্ট বিধানে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। দেবীরাণীও নীরব নিশ্চল ন'ন, জয়কালীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবকটি বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল। পত্রখানা আজ বৈকালে রায়মহাশয়ের কাছে ছিল, আমি বেশ দেখেছি; তবে এর মধ্যে কি আর কোথাও সরিয়ে ফেল্লে? দেখুন—দেখুন,—জয়কালীর কাছে থাকলেও থাকতে পারে! ও আজ সকাল থেকে পত্রখানার জন্যে রায়মহাশয়কে ত্যক্ত কচ্ছিল!"

তাহাই বটে, যুবকের কল্পনাই স্থির বটে! অনেক অনুসন্ধানের পর, জয়কালীর কোমরের ভিতর হইতে দেবীরাণী একখানি কাগজ বাহির করিলেন। যুবককে দেখাইয়া কহিলেন, "কেমন, এই কি?" যুবকটি আহ্লাদে কহিয়া উঠিলেন, "হাঁ ত—হাঁ ত—ওই ত বটে!" দেবীরাণী আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ওই আলোর কাছে গিয়ে একটু আস্তে প'ড়ে আমাকে শোনাও দেখি?"

গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সেই প্রদীপের আলোতে ঈষচ্ছে আমি পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম।

পত্রটি এইরূপ ;—

শ্রীঃ—

প্রিয় রামচাঁদবাবু,—

অদ্যাবধি এমন কোন উপায় করিতে পারিলেন না, যাহাতে চির-নির্ব্বাসিত হইতে পারে? একটা বালক আপনার মত উপযুক্ত ব্যক্তির চক্ষে এমন ভাবে ধূলি দিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। তাহাকে প্রাণে মারিবার এখনও বিশেষ আবশ্যক হয় নাই, সেই বিষয়টা চিরকালের মত নিষ্পত্তি হইয়া যাইলে, তবে যাহা হয় করা যাইবে। এখন তাহাকে অবরুদ্ধ করাই আমাদিগের প্রধান কার্য্য। চাবিটা উপস্থিত এখন আমার কাছেই রহিল; আর সেই দলিল পত্র চাহিয়াছিলেন, এখন দুই এক দিনের মধ্যে আমি তাহা দিতে পারিব না। সে সমস্ত আমার কলিকাতার বাটীতে আছে।

কোথায় কি ভাবে আছে, এই আমার পরম বিশ্বাসী পত্রবাহকের মুখে সমস্ত শুনিবেন। আর একটি আমার উপরোধ, কথাটি সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। শশীকে স্থানান্তরিত করা, অথবা তাহাকে বিশেষরূপে চক্ষে চক্ষে রাখা, কিম্বা আমার হস্তে কিছুদিনের জন্য তাহাকে সমর্পণ করা বোধ হয় মন্দ পরামর্শ নয়; কারণ কি, তাহা বোধ হয় আপনাকে আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। আর অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি—

আপনার একান্ত বশম্বদ,

শ্রীঃ

পুঃ—

দেববাবু নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। নির্ম্মলকুমারই এখন তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী জানিবেন। সত্বর প্রত্যুত্তর দিবেন। ইতি—

শ্রীঃ—

পত্রখানিতে লেখকের নাম নাই, কবে লিখিয়াছেন, তারিখ নাই। তবে অনুমান করিলাম, হরিহরবাবুর লিখিত হইলেও হইতে পারে।

দেবীরাণী আমাকে কহিলেন, "পত্রখানার মর্ম্ম কিছু বুঝ্তে পাল্লে?" আমি কহিলাম, "না সব বুঝ্তে পাল্লেম না। কে লিখেছে, কা'কে লিখেছে, কারওত নাম নাই, রামচাঁদবাবু কে?"

দেবীরাণী। "ঐ রায়মশাই হচ্ছেন রামচাঁদ বাবু,—আর লিখেছেন তোমার গুণধর বাবা। তোমার ওপর কত জোরজবরদস্তী দেখেছত? তোমার বাপ, শ্বশুর অনুগ্রহ ক'রে তোমাকে এখন প্রাণে মারবেন না। আমাকে তোমার বাপের বড্ড দরকার, বুঝতে পেরেছ?"

আমি লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলাম না, হেঁটমুণ্ডে দণ্ডায়মান রহিলাম। অঞ্চলের কোণ হইতে ত্রস্তে দেবীরাণী (জয়কালীর নিকট হইতে প্রাপ্তপত্রের আকারের ন্যায়) আর একখানি পত্র জয়কালীর কোমরে

পূর্ব্বপত্রের মত রাখিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য বলুন—ভাবার্থ বলুন,—আমার বুঝিবার সাধ্য কি ?

দেবীরাণী সেই যুবকটিকে কহিলেন, "বিজয়, রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে, আর আমরা দেরী কত্তে পাচ্ছিনি। তুমিও মড়ার মত ঐ কোণটায় প'ড়ে থাক। এরাও যেমন উঠ্‌বে—তুমিও তেমনি উঠ্‌বে, এরাও যা করবে—তুমিও তাই করবে।"

আর তথায় দাঁড়াইলেন না ; পত্রখানা সযত্নে নিকটে রাখিয়া আমার পথপ্রদর্শনীরূপে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্ধকারে অতি কষ্টে কত ঘর দ্বার দালান পার হইয়া আমরা সেই সিঁড়ির নিকট আসিলাম। ক্রমে সিঁড়ি বহিয়া ধীরে ধীরে আমরা নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা বাধা বিঘ্নে আমরা কাননপথ সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম।

কোথা হইতে অন্ধকার ভেদ করিয়া গঙ্গাধর আসিয়া দেবীরাণীকে প্রণাম করিল। দেবীরাণী গঙ্গাধরকে কহিলেন, "গঙ্গাধর ! যে কাজের জন্য এসেছিলেম, ভগবানের কৃপায় সে কাজে সফল হয়েছি। তোমার পাল্কী কোথা ?"

গঙ্গাধর। "আজ্ঞে—ঐ গাবগাছের তলায় একটা ঝোপের ভিতর।"

দেবীরাণী। "তবে আমাদের নিয়ে চল।"

অতি সন্তর্পণে যথা সম্ভব দ্রুতগতিতে আমরা তিন জনে বনপথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। বনপথিমধ্যে একবার দেবীরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমাদের এখন কোথায় যেতে হ'বে ?"

দেবীরাণী। "কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসা কচ্ছ ? এখন তার উত্তর পাবে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা করি, তবে বোধ হয় সময় মত শুনতে পেলেও পেতে পার।"

গঙ্গাধর সর্ব্বাগ্রে, মধ্যে দেবীরাণী, পশ্চাতে আমি, এইরূপ ভাবেই আমরা বনপথ অতিক্রম করিতেছি। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া গঙ্গাধর হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। গঙ্গাধর কহিল, "ঐ ঝোপের মধ্যে পাল্কী আছে ; তবে কি এখনি বেহারাদের ডাক্‌তে হবে ?" দেবীরাণী কহিলেন, "হাঁ ; আর দেরী কল্লে চলে ? অনেক কাজ এখনো হাতে।"

দূরে অন্ধকার মধ্যে গঙ্গাধর মিলাইয়া গেল; কিয়ৎক্ষণ পরে পাল্কীস্কন্ধে চারিজন বেহারা সমেত পুনশ্চ আমাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত হইল।

দেবীরাণী কহিলেন, "গঙ্গাধর, যা যা বলে দিয়েছি,—যা যা কর্ত্তে হ'বে, সব ঠিক ঠিক মনে আছে ত?"

গঙ্গাধর। "আজ্ঞে, তার এক বর্ণও ভুল হবে না!"

দেবীরাণী। "তবে আমরা যাই?"

গঙ্গাধর। "আজ্ঞে আসুন!"

দেবীরাণীর ইচ্ছাক্রমে আমরা উভয়েই পাল্কীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইলাম। পাল্কীর সহিত আমরা বেহারাদিগের স্কন্ধে উঠিলাম! অতি দ্রুত অথচ নিঃশব্দে আমরা যেন উড়িয়া যাইতে লাগিলাম।

কত কথাই আমার মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল! উঃ কি বীভৎস কাণ্ড! কি ভয়ঙ্করী-ভৈরবী-চক্র!!

পঞ্চবিংশ চক্র।

নৌকারোহণে।

ঘোরা গভীরা যামিনী, সমস্ত জগৎ সুষুপ্ত, নৈশান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন। সাগরবাহিনী জাহ্নবী কুল কুল তানে লহরীলীলায় নাচিতে নাচিতে সাগর-সঙ্গমে প্রবাহিতা। আমি দেবীরাণীর সহিত একখানি পাল্কীর ভিতর গঙ্গার উপরে ভাসমান। একটিমাত্র মাঝি কর্ত্তৃক নৌকা খানি পরিচালিত হইতেছে! অন্ধকারে দিক্ নির্ণয় হয় না, আমিও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছি, সুতরাং স্থির করিতে পারিতেছি না।

দাঁড়ের ছল ছল শব্দ, লহরীর তর তর ধ্বনি, গভীর রাত্রি; দেবীরাণীর সম্মুখে বসিয়া গঙ্গার উপর নৌকারোহণ যে কত আনন্দের—কত সুখের, আমি বর্ণনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

নৌকার ভিতরে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ক্ষুদ্র বিছানা, সেই বিছানায় দেবীরাণী শয়ন করিয়া আছেন; তাঁহার শিরোভাগে এক হাত তফাতে আমিও অর্দ্ধশয়িত। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যদিও সে কথার ঠিক উত্তর পাই নাই বটে, কিন্তু গভীর রহস্যের স্থূল মর্ম্ম কতকটা বুঝাইয়াছেন, সময় মত অবশ্যই পাঠকগণ তাহা শুনিতে পাইবেন।

আমি কহিলাম, "আজ রাত্রেই কি ফিবতে পারব বোধহয়?"

দেবীরাণী। "তা এখন ঠিক কেমন ক'রে বল্‌ব?"

আমি। "নৌকায় উঠবার সময় কি সব শিখিযে দেবে বলেছিলে, এখন কেন বলনা?"

দেবীরাণী। "সব বল্‌ছি। আচ্ছা, একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি; আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ত একদিনও তুমি তোমার বাপ মার কোল ছাড়া হও নাই, এর মধ্যে কি কখনও ঘুণাক্ষরে কোন বিষয় সন্দেহ কর নি?"

আমি বলিলাম, "একদিনও না, কেমন ক'রে সন্দেহ হ'বে বলনা? আদর যত্নের কোন অংশে ক্রটী নেই, রাজার হালে থাক্‌তেম। বাপ মা সর্ব্বদাই আমায় চোখে চোখে রাখত, কোথাও একলা ছেড়ে দিত না, পাড়ার কোন লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে দিত না। পাঠশালে কি স্কুলে এক দিনের জন্যও ভর্ত্তি ক'রে দেয়নি, মাষ্টার এসে পড়িয়ে যেত। এমনিই আশ্চর্য্য কাণ্ড, সেই মাষ্টারকে পর্য্যন্ত চক্ষের আড়াল কর্ত্ত না।"

দেবীরাণী। "আচ্ছা, সেই মাষ্টারের বাড়ী কোথায় তা কি কখন জান্‌তে পেরেছিলে?"

আমি। "না, তা কৈ কখন জিজ্ঞাসাও করিনি—ঠিকানাও পাইনি।"

দেবীরাণী। "ভাল, তোমাদের বাড়ীতে কি কখন জ্ঞাতি, কুটুম্ব কি আত্মীয় কেহই আসত না?"

আমি। "তা ঢের ; বাড়ীতে অমন বাজে লোক অনেক ছিল ;—কত লোকই আসত যেত,—এই পর্য্যন্ত ; আমার সঙ্গে কিন্তু বড় একটা কেউ মিশত না, আর আমাকেও আমার বাপ মা তাদের কাছে থাক্‌তে দিত না।"

দেবীরাণী। "আচ্ছা, তোমার পূর্ব্বপুরুষের নাম, বংশ মর্য্যাদা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় কখন কি তোমায় শিক্ষা দিত না ?"

আমি। "কৈ, তাওত কখন বলেনি, আমি ও সব কথা কখনও জিজ্ঞাসা করিনি।"

দেবীরাণী। "হরিহরবাবুর নামেই কি চিঠিপত্র আস্‌ত ?"

আমি। "হাঁ।"

দেবীরাণী। "বেশ ক'রে মনে কর দেখি, তোমার নামে কখনও কি একখানি চিঠি আসেনি ?"

আমি বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া কহিলাম, "হাঁ, মনে হচ্ছে বটে ; একখানি কেন, মাঝে মাঝে বোধহয় আমার নামে রেজেষ্টরি চিঠি আস্‌ত।"

দেবীরাণী উঠিয়া বসিলেন, কৌতূহলী হইয়া কহিলেন, "হাঁ ? কেমন ক'রে জান্‌লে ? বেশ মনে ক'রে সব বল দেখি ?"

আমিও উঠিয়া বসিলাম, স্থিরচিত্তে আগা গোড়া বেশ স্মরণ করিয়া কহিলাম, "আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা, বাবার বৈঠকখানার পাশের একটি ছোট ঘরে, বাবা কার সঙ্গে রেগে কথা কচ্ছিলেন। ঘটনা ক্রমে আমি সেই বৈঠকখানায় এসে পড়েছিলেম। তাঁদের কথা বার্ত্তার মধ্যে আমার নাম যেন শুনতে পেলেম। আমিও একটু কাণ খাড়া ক'রে চুপি চুপি শুনলেম। বাবা বল্‌ছেন, 'তুমি কিসের ভয় দেখাও হে ? যেমন বুঝ্‌ব সেই রকম করব। এ রেজেষ্ট্রী চিঠি ব্রজর হাতে কখনই পড়তে দিব না। যেমন আমি সই ক'রে নিচ্ছি, তেমনিই চল্‌বে। কেন আর মোচড় দাও দেখি ? আর গোলমাল ক'র না, তোমার বন্দোবস্তর ওপর আরো না হয় কিছু বাড়িয়ে দেব'—খুট্‌ ক'রে যেন খিল খোলার শব্দ শুন্‌তে পেলেম,—আমিও ধাঁ করে সেখান থেকে স'রে পড়লেম। চিঠি পত্র সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত জানি।"——

দেবীরাণী। "যে লোকটির সঙ্গে তোমার বাপের কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তাকে চেন ত?"

আমি। "না, গলার আওয়াজে ত চিন্‌তে পাল্লেম না, চক্ষে দেখ্‌লেও নিশ্চয় বল্‌তে পারি না।"

দেবীরাণী। "ভাল, তোমার বাপ চিঠিপত্র দলীল দস্তাবেজ প্রভৃতি কোথায় রাখে, তা জান কি?"

আমি। "না, কখনই দেখিনি, কেমন ক'রে জানব?'

দেবীরাণী আবার শয়ন করিলেন। আমরা কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছি; নৌকাখানি বিষম দুলিয়া উঠিল। আমি জানালা খুলিয়া দেখিলাম, আমরা বাগবাজার ছাড়াইয়া আসিলাম।

দেবীরাণী মাঝীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "গোবিন্দলাল! একটু জোরে বেয়ে চল, কটা বাজ্‌ল?"

মাঝী আর কেহ নহে; দেবীরাণীর পরম বিশ্বস্ত অনুচর সেই গোবিন্দলাল।

গোবিন্দলাল কহিল, "তিনটের আমল হয়ে এল।"

দেবীরাণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিয়া উঠিলেন "তবে দেখ্‌ছি নৌকা আর চল্‌বে না। ইস্‌ এত রাত হয়ে গেল? নৌকা বাঁধ। আমায় শীঘ্র সাজিয়ে দাও।"

আদেশ হইবামাত্রই গোবিন্দলাল কিনারায় নৌকা লাগাইল। ছতরীর ভিতর হইতে একটা খুব বড় পুঁটুলী আনয়ন করিল। তাহার ভিতর হইতে সাজ সরঞ্জামাদি বাহির করিয়া,—আহা আহা, যে রূপ প্রথমে দেখিয়া আমি যম যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে রূপ দেখিয়া কারাগার আমার সুখৈশ্বর্য্য-পরিপূরিত ইন্দ্রালয়ে পরিণত হইয়াছিল, যে রূপ আমার নয়নের আনন্দ—প্রাণের আনন্দ—আমার সংসারের আনন্দ, সেই জগন্মোহন অনুপম স্বর্গীয় বালকবেশে দেবীরাণীকে রূপান্তরিত করিল।

কি সুদক্ষ গোবিন্দলাল! গোবিন্দলালের কি অদ্ভুত কি অপূর্ব্ব বেশ-নিপুণতা! অতুলরূপযৌবনসম্পন্নাষোড়শীকে একটি যুবতী-মনোরঞ্জন

নিখুঁত যুবকে পরিণত করিল। আরে,—যেন কি অলৌকিক ইন্দ্রজাল শক্তিতে ভগবানের সৃষ্টি ফিরাইয়া দিল! কাহার সাধ্য আর দেবীরাণীকে চিনিতে পারে! কোন অংশে আমিই তাঁহার ছদ্মবেশ ধরিতে পারিলাম না, অন্যে পরে কা কথা!

ছদ্মবেশী বালক কহিল, "এই বাঘবাজারের ঘাট থেকে আমরা গাড়ী করি! তুমি তোমার নিরূপিত স্থানে নৌকা ভিড়িয়ে রাখ গে। তার পর কোথায় যেতে হবে, ঠিকানা তোমার মনে আছে ত?"

গোবিন্দলাল। "আজ্ঞে হাঁ, মনে আছে বৈকি!"

দেবীরাণী। "কাল বেলা আটটার মধ্যে যেন তোমাকে দেখ্‌তে পাই। যেখানেই থাক না কেন, আটটার মধ্যে আসতে কোন ক্রমেই ভুলো না।" গোবিন্দলাল নৌকা লইয়া প্রস্থান করিল।

সৌভাগ্যক্রমে রাস্তার উপরে আসিয়াই দেখিলাম, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। দিনের দুরন্ত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া আহা সেই দুর্ব্বল অশ্ব দু'টি সজ্জিত দণ্ডায়মান অবস্থাতেই নিদ্রিত। ধড়টি কোচবাক্সের উপর এবং মস্তকটি গাড়ীর ছাদের উপর রাখিয়া গাড়োয়ানটি একটা দুর্গন্ধময় অপরিষ্কার কাল মোটা কাপড়ে আপনাকে আবরিত রাখিয়া নিদ্রিত। আমাদের সজোর ডাক হাঁকে গাড়োয়ান চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। প্রথমে ভাড়ার কথাটা কাণে তুলিল না; আমাদের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে সে যেন বিরক্ত হইয়া একটা অসম্ভব দর বলিল। সে অসম্ভাবনা তখন আমাদের অতিশয় সম্ভবপর, সুতরাং আমরা তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। সে ভাবিয়াছিল, আমরা দর শুনিয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমাদের সে উদ্দেশ্য নয়; তাহার কথাতে স্বীকৃত হইয়াই আমরা একেবারে গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া বসিলাম। বরঞ্চ আরো কথা রহিল, যদি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দিতে পারে, তাহাহইলে আরো কিছু বকসিস্ পাইবে। গাড়োয়ানের তাহাতে আহ্লাদ হইল কি না জানি না, সে সজোরে ঘোড়া দুটিকে একবার চাবুক মারিল, ঝুমুঝুমু ভাবে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। প্রাণে অতুল আনন্দ, দেবীরাণীর

সঙ্গী হইয়া ভাববিভোরে এখন চলিলাম যানারোহণে ;—ছিলাম নৌকারোহণে !!

ষড়বিংশ চক্র।

পিত্রালয়ে।

পাঠক মহাশয়! বলিতে পারেন আমি কোথায় আসিলাম? ভয়াবহ দুর্ব্বিষহ বিপদক্লেশসঙ্কুলভ্রাম্যমানসংসারচক্রের বজ্র-নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া একবার মনে মনে কি কল্পনা করিতে পারেন, আমি কোথায় আসিলাম? আজি দুই বৎসরের পর আমার প্রাণদায়িনী মহাপ্রাণ বীরজাদেবীর সহিত এ কোন্ অট্টালিকার গুপ্তদ্বারদেশে মহান্ কৌতূহলী হইয়া দণ্ডায়মান আছি, আমার সহৃদয়া পাঠিকা ঠাকুরাণি! একটু স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বলিতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া এই অভাগার মর্ম্মভেদী কথা গুলি আপনার কায়মনপ্রাণশ্রবণে ধারণ করুন; এ জগতে 'আমার' বলিতে আর কেউ নাই! তবে একবার 'আমার' হইয়া আপনি আমার দুঃখে 'আহা' বলুন!

কোথায় আসিলাম? যে অভয় দুর্গমধ্যে থাকিয়া পতিতমান বজ্রাস্ত্রকেও লক্ষ্যচ্যুত করিয়াছি, যাহার একটি মাত্র ক্ষুদ্রগৃহে বসিয়া অনন্ত জগতের পরিমাণ তুচ্ছ করিয়াছি, যে শয়নগৃহে শয়ন করিয়া ইন্দ্রালয়ের শোভা সৌন্দর্য্যের কল্পনা আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে স্থান পাইত, যে অট্টালিকার গৃহস্থগণের উপর একদিন সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য করিয়াছি, সেই গৃহে সেই আমার আমরণ উচ্চআশাসম্বলিত পিতৃনিকেতনে অতি ধীরে ধীরে প্রাণভয়ে কম্পিত হইয়া প্রবিষ্ট হইতেছি।

আমাদের বাটীর সর্ব্ব পশ্চাতে নর্দ্দামা বুজাইয়া একটা ক্ষুদ্র অপরিষ্কার রাস্তা আছে, সেই রাস্তার উপর অতি গুপ্তভাবে একটা দরজা খুব সুদৃঢ় তালা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া কোথা হইতে ঘটিকা-যন্ত্র ৪টা বাজাইয়া ঘোষণা করিল। দেবীরাণী নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "কেমন, এই ত সেই গুপ্ত দরজা?" আমি কহিলাম "হঁ।।"

দেবীরাণী। "এই চাবি নাও, শীগ্‌গির দরজা খুলে ফেল।" যদিও সে স্থান অন্ধকার, তত্রাচ আকাশের আলোকে আমাদের অনেকটা সাহায্য করিল, তালা খুলিতে কোনই কষ্ট হইল না। আমরা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াই দরজায় খিল দিলাম, তালাটিও ভিতরে আনিয়া একস্থলে রাখিয়া দিলাম। জামার পকেট হইতে নীরজাদেবী একটা বাতি ও বিলাতী দীপশলাকা বাহির করিয়া নিজ হস্তে বাতিটা প্রজ্জ্বলিত করিলেন। সেই আলোক সাহায্যে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম।

অট্টালিকা নির্জ্জন কি নিভৃত, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেবী-রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝিলাম, এককালীন নির্জ্জন! বাড়ীর চাবি বন্ধ করিয়া সকলেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

আমার বাটী আমার ঘর, কোন স্থান আমার অজানিত নয়; সম্পূর্ণরূপে সুপরিচিত। দেবীর ইঙ্গিতে প্রথমেই আমরা পিতার শয়নাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। দরজা কিন্তু উত্তমরূপে তালা দ্বারা আবদ্ধ; যেমন করিয়াই হউক, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দেবী কহিলেন, "আর ভাব্‌লে কি হবে? যেমন করে পার তালা ভাঙ্গ, তা নইলে সব কাজই পণ্ড হ'ল। কোথায় কি আছে, তোমার ত কিছুই অজানিত নেই। যেখান থেকে পার একটা উকো, হাতুড়ী কি ভারী লোহা টোহা নিয়ে এস; বাতী দিয়াশলাই সঙ্গে নাও; আমি অন্ধকারে থাক্‌ব তা'তে ভয় নেই! তুমি যাও, রাত চারটে হয়ে গেল।"

দেবীরাণী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, "আমি আলো লইয়া নিম্নে নামিয়া আসিলাম। পূর্ব্ব হইতে বরাবর জানিতাম, বাটির সর্ব্ব পশ্চাতে এঁদো জন-মানব সমাগম শূন্য দুর্গন্ধময় জঘন্য একটা ঘর আছে, তথায় ইট কাট ভাঙ্গা

লোহা প্রভৃতি এমনি অনেক বস্তু অব্যবহৃত ভাবে পড়িয়া থাকিত। সেই গৃহে আসিয়া বিশেষ বিধানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় চাবী তালা ভাঙ্গিবার উপযোগী এমন কোন সামগ্রীই পাইলাম না। অবশেষে অনেক সন্ধানের পর একটা কাষ্ঠের হাতলশূন্য খুব ভারী কাটারী ইটের গাদার ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখিলাম; ইট পাটকেল সরাইয়া কাটারী খানা সংগ্রহ করিলাম। দেখিলাম মন্দ নহে, চলিতে পারে। তবু আর একবার দেখি, যদি আরও কোন অস্ত্র পাই। জয় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবন্! একটা হাতল ভাঙ্গা উকা পাইলাম। যদিও পুরাতন, তত্রাচ কাটারী ও উকা সংমিলনে নিশ্চয়ই তালা ভঙ্গ হইতে পারে। আর কাল বিলম্ব না করিয়া কাটারী ও উকা লইয়া তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিয়া আসিলাম। বীরবাহু বেশে বীরজাদেবী অন্ধকারে তেমনি ভাবে দাড়াইয়া আছেন, আমার হস্তে উকা ও কাটারী দেখিয়া তিনি সংগরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "বেশ, ঠিক হ'বে, এইতেই কার্য্য উদ্ধার হ'বে।"

আমি কাটারীর বাটের দ্বারা ওরসাটা চাড়া দিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, বীরবাহু উকার দ্বারা শিকলিটা খুলিতে আরম্ভ করিলেন, বেশী আর কষ্ট করিতে হইল না, কিছুক্ষণ অবিরাম পরিশ্রমের পর শিকলটা আবদ্ধ তালার সহিত খুলিয়া পড়িল। আমরা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

পিতার শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াই দেবীরাণী আমাকে কহিলেন, "তোমার বাপ দলীল দস্তাবেজ, চিঠি পত্র, টাকা কড়ি কোথায় কোন্ বাক্সে রাখে, এ ত জান?"

আমি কহিলাম, "আজ দু'বছর আমি বাড়ী ছাড়া, এখন কোথায় এ সব রাখে, তা ত জানি না; তবে ঐ লোহার সিন্দুকে, আলমারীতে যেন টাকাকড়ি রাখ্‌ত, এই পর্য্যন্ত জানি।"

ছোট বড়, সরু মোটা, একমুখ দুইমুখ নানাপ্রকারের একটা বড় চাবীর গোছা বাহির করিয়া দেবীরাণী গৃহকোণস্থিত একটা লোহার সিন্দুকের নিকট যাইয়া কহিলেন, "ভাল ক'রে আলোটা ধর দেখি, এতগুলো চাবীর মধ্যে কি একটা চাবীও লাগবে না? দেখি ভগবান্ কি করেন!"

বিশেষ মনোযোগের সহিত বীরজাদেবী সেই লোহার সিন্দুকে চাবী ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন; একটির পর দুইটি, এইরূপ ১০।১২টি চাবী ঘুরাই-বার পর একটা চাবীতে কড়াৎ করিয়া কলখানা সরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আমরা উভয়ে একযোগে নিতান্ত বলপূর্ব্বক ডালাটি খুলিয়া ফেলিলাম।

দেখিলাম, সিন্দুকের ভিতর প্রচুর পরিমাণে টাকা ও নোট রহিয়াছে। বীরজা কহিলেন, "দুরাত্মাদের সর্ব্বতোভাবে মুখ বন্ধ করা উচিত। যদিও উপস্থিত এ টাকায় আমার কোনই উপকার করিবে না, তত্রাচ এ পাপলব্ধ টাকায় তোমার বাপের অনেক কাজ হইবে; এ সমস্ত টাকাকড়ি এই বাড়ীর মধ্যে লুক্কায়িত স্থানে পুতে রাখা উচিত, কি বল?"

আমি কহিলাম, "যা তোমার অভিরুচি।"

লৌহসিন্দুকের মধ্যে নিম্নভাবে আর দুইটি টানা রহিয়াছে দেখিলাম; তৎক্ষণাৎ আমরা দুজনে দুটী টানাই এক সঙ্গে খুলিয়া ফেলিলাম। আমি পাইলাম রাশীকৃত চিঠি; দেবীরাণী পাইলেন কাপড়ে জড়ান একটা সরু পুলিন্দা। দেবীরাণী কহিলেন, "এ সব খুলে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁটিয়ে জানা এখনকার কাজ নয়। এ সমস্তই বেশ ক'রে তোমার চাদরে জড়িয়ে বেঁধে রাখ। এস ঐ আলমারীর ভিতর কি আছে দেখি।"

আলমারীটা খুলিতে আর বড় বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। ৩।৪টা চাবী ঘুরাইবার পর খুট করিয়া খুলিয়া গেল। ভিতরে দেখিলাম, রাশীকৃত নানাপ্রকারের নানাজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র। দেখিবামাত্র আমরা উভয়ে কম্পিত হইলাম! আমরা বিশেষরূপে অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্য হইতে দুই খানি সুশাণিত ছুরিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।

দেবী কহিলেন, "বোধ হয় আর কোন আবশ্যকীয় বস্তু পাওয়া যাইবে না, এদিকেও রাত পুইয়ে এলো। লোহার সিন্দুকের ভিতর থেকে যা যা পেলেম, বোধ হয় এতেই অনেক কাজ হ'তে পারবে।"

আমি কহিলাম, "টাকা কড়ি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়?"

দেবী। "সেটাই দেখছি বেশীর ভাগ, পুতে রাখলে ত চ'লবে না? তোমার এমন কোন লুকান স্থান নেই?"

অনেক ভাবিয়া শেষে এই স্থির করিলাম। কহিলাম, "আমার পাঠাগারের মধ্যে একটা গুপ্ত স্থান আছে, বোধ হয় সেখানে রাখলে কেউ খুঁজে বার কত্তে পারবে না; তাই করব কি?"

"তাই ভাল।" আর কাল বিলম্ব না করিয়া পূর্ব্ববৎ শিকলীর ভরসা যথাস্থানে প্রোথিত করিয়া বরাবর আমার পাঠাগারে চলিয়া আসিলাম; পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, কোন দরজা তালাবদ্ধ ছিল না।

আমার পাঠাগারের দেয়ালের সহিত গাঁথা একখানি কৌচ আছে; তাহা এমনি ভাবে নির্ম্মিত যে, তৎপশ্চাতে কোন বৃহদাকার বস্তু অনায়াসে লুক্কায়িত রাখা যাইতে পারে। কৌচখানি ভাঙ্গিয়া না বাহির করিলে সে গুপ্তস্থান কোন প্রকারেই নয়নগোচর হইতে পারে না। সেই গুপ্তস্থানে টাকা নোট সমস্তই বিশেষ যত্নের সহিত লুক্কায়িত রাখিলাম।

উপস্থিত কার্য্য আমাদের শেষ হইল। এ দিকেও ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া দেবীরাণী ত্রস্তে কহিয়া উঠিলেন, "অন্ধকার থাকতে থাকতেই এই বাড়ী থেকে পালাতে হবে। চল, যে দিক দিয়ে এসেছি, সেই দিক দিয়েই পলায়ন করি।"

আমরা দ্রুতপদে বাটীর পশ্চাতের গুপ্ত দরজার নিকট আসিলাম; বহির্দ্দরজায় তালা বন্ধ করিয়া সবে মাত্র আমরা বড় রাস্তায় আসিয়াছি, (এখনও অন্ধকার, এখনও কোলের মানুষ দেখা যায় না) একটা লোক যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদিগের দিকে দ্রুতপদে আসিতেছে, সন্দেহের সহিত মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। দেবী কহিলেন, "পালাবার কোন আবশ্যক নাই; বোধ হয় অপর কেউ নয়, আমারই অনুচর। ভয় কি! কাছেই আসতে দাও না।"

দুর্গা দুর্গা, রক্ষা পাই! লোকটি অপর কেউ নয়, দেবীরাণীর অনুচর বটে। গোবিন্দলাল হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিল, "ভারী খারাব! বিপদের সম্ভাবনা। বলবার—দাঁড়াবার একেবারেই সময় নাই। ঐ মোড়ের মাথায় গাড়ী এনে রেখেছি, গাড়ীর ভিতর সব কথাই শুনবেন! আসুন—শীগগির

আসুন!" কোথায় যাইতেছি, তাহা জানি না; কিন্তু ছিলাম আমি আমার সেই বাল্যকালের পিত্রালয়ে!

সপ্তবিংশ চক্র।

যে বিপদ—সেই বিপদ!

শীতকালের ঘুমন্ত রজনীর অতি ক্ষীণ প্রকম্পিত নিদারুণ প্রভাত। ঘোরতর কোয়াসাজালে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, কেবল পশ্চিমাচলের বালসূর্য্যের ঈষৎ রক্তিমাভায় প্রাচীদিক্ জাগ্রত। ফলতঃ এখনও রাত্র্যন্ধকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শীতের প্রাবল্য বশতঃ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছি, তাহার উপর ভয় উচ্ছ্বাস উৎকণ্ঠ, ইত্যাকার নানাবিধ কারণে অত্যন্ত প্রকম্পিত প্রাণে অন্ধকারাচ্ছন্ন একখানি গাড়ীর ভিতর আমরা উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখাসনে দেবীরাণী, পশ্চাৎ আসনে আমি এবং গোবিন্দলাল,—বিনা ঈঙ্গিত ইশারায় আমাদিগকে লইয়া গাড়ীখানি অতি দ্রুত বেগে ছুটিল। যাইতে যাইতে গোবিন্দলাল সোৎকর্ণে বিশেষ সাবধানে গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া পশ্চাৎ দিকে লক্ষ্য করিতে থাকে, কেহ আমাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে কিনা। দেবীরাণী কিন্তু নির্ব্বাক্ নিশ্চল স্থির গম্ভীর; অমানুষিক বুদ্ধিসাগরে যেন নিমগ্ন। এইরূপে অনেক দূর চলিয়া আসিবার পর দেবীরাণী প্রথম কথা কহিলেন, "গোবিন্দলাল! অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গেছে, যদি আজকার দিনটা কাটাতে পারি, আর সেই পুলিন্দাটা হস্তগত ক'রতে পারি, তবেই জান্‌বে আমার সমস্ত সার্থক হ'ল। আমার চক্র চাতুরী এতদিনের পর প্রকাশ পেয়েছে!

তিনটি প্রাণই একখানি তরবারিতে আবদ্ধ। ভাগ্যে আমরা জয়কালীর ভগ্নীকে হাতে পেয়েছিলেম, তাতেই সেই পুঁটুলির রহস্য বুঝ্‌তে পেরেছি।” আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমি নাকি এ রহস্য সমস্তই জানি, তাই আমার জিহ্বা যেন আপনা আপনি কহিয়া উঠিল, “গোবিন্দলাল ! এ কোন পুঁটুলির কথা হচ্চে ? এ জয়কালীর কোন্ ভগ্নী ?”

গোবিন্দলাল সোৎকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আহা হা, এ কি করেন ? এসব কথার মানে আপনি কি বুঝ্‌বেন ? যেমন আছেন তেমনি ছেলেমানুষের মত চুপ ক’রে ব’সে থাকুন।” এতক্ষণের পর দেবীরাণীর গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হইল, ঈষৎ উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, “কি বল্লে—কি বল্লে ? পুঁটুলির সম্বন্ধে কি জান বল দেখি ?” আমিও সহাস্যে কহিলাম, “আমি ছেলেমানুষ—চুপ ক’রে থাকাই ভাল !” দেবীরাণী কহিলেন, “না না না ও কথা কিছু মনে ক’র না, আমার বেশ বোধ হচ্চে, তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান।” আমি কহিলাম, “বোধ হয় কিছু কিছু জানি, জানি কেন, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু সহায়তাও কত্তে পারি।” গোবিন্দলাল নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, “কি রকম—কি রকম ?”

দেবীরাণী কহিলেন, “আঃ স্থির হও গোবিন্দলাল। আচ্ছা, যখন তুমি সেই ভাঙ্গা ঘরটার মধ্যে ছিলে, তখন কি কোন প্রকারে সেই পুঁটুলির বিষয় জান্‌তে পেরেছ ? বেশ স্থির হ’য়ে সব আনুপূর্ব্বিক বল দেখি ?”

আমি। “এ গাড়ীর ভিতর ব’সে সব বলা হবেনা। গাড়োয়ানকে এখনি সেখানে যেতে বল ; মুখে শুনে আর কি হ’বে, একেবারে সব দেখিয়ে দিব।”

গোবিন্দলাল। “সে যে অনেক দূর, ঘোড়া বদলান না হ’লে ত চল্‌বে না !—(দেবীরাণীর প্রতি) তবে কি আজ্ঞা করেন ? এখনি সেখানে যাওয়া উচিত বোধ হচ্চে কি ?” কি ভাবিয়া দেবীরাণী কহিলেন, “তার আর সন্দেহ আছে ? তুমি গাড়ী থেকে নেবে যাও, দেখ কেউ পেছু নিয়েছে কিনা। যদি কোন রকম দেখ—বুঝ্‌তে পেরেছ ? হাতীয়ার সঙ্গে আছে ত ?”

গোবিন্দলাল। "আজ্ঞা হাঁ, আমি সর্ব্বদাই সশস্ত্র আছি।" নিমেষ মধ্যে গোবিন্দলাল গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল, গাড়ীচালককে স্থান-নির্দ্দেশক ইঙ্গিত করিয়া পশ্চাতে মিশাইয়া গেল।

একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার চাদরে জড়ান রাশীকৃত চিঠি পত্রাদি সমস্তই ইতিমধ্যে দেবীরাণী চাহিয়া লইয়াছেন।

পশ্চিম দিকের পথ ধরিয়া গাড়ীখানি অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটিল। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে আমরা যথাস্থানে আসিয়া পঁহুছিলাম; আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পুলিন্দাটি বাহির করিয়া দেবীরাণীকে দিলাম। দেবীরাণী সানন্দে কহিয়া উঠিলেন,—"মাগো পতিতপাবনি! নিস্তারিণি মহামায়া! এতদিনের পর কি মুখ তুলে চাইলি মা? দেখিস্ মা শেষ রাখিস্। কুলকুণ্ডলিনি! ভরা তরী যেন কূলে এসে না ডুবে যায়! গোবিন্দলাল! আর কি, সব কাজ ত শেষ হয়ে গেল, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়তম বন্ধু ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহে আমার জীবনাশার বস্তু সমস্ত জীবনের প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল এই মহামূল্য পুলিন্দা যা রাজ্য বিনিময়েও পাওয়া যায় না, অনায়াসে এত দিনে হস্তগত হ'ল! ব্রজেন্দ্রবাবু, এ ঋণ আমি কখনই পরিশোধ কত্তে পারব না; আমি স্ত্রীলোক বালিকামাত্র, কথায় আপনাকে কি বোলে সম্ভাষণ কর্ব, কি বোলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, জানিনা, আপনার চরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি!"

আমি কহিলাম "একি একি! মহান্‌মহিমাময়ী দেবীরাণি! কি করেন কি করেন? আমার এই অধম চরণে আপনার প্রণাম? হে আমার সংসার-সারসর্ব্বস্ব্যাপূজনীয়া মহাদেবি! আমিই আপনার দাসানুদাস, অতি ক্ষুদ্র-কীটানুকীট, আমাকে প্রণাম? আমার কাছে আপনার কৃতজ্ঞতা? আমার অতি অসার জীবন আপনার ওই বিরাট বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত একটি কটাক্ষের উপর চিরনির্ভর! আমাকে প্রণাম? এই দীন দরিদ্রের অতি নিকৃষ্টচরণে হীরকমণিমণ্ডিত রাজরাজেশ্বরীবিনিন্দিত আপনার ওই মুকুটময়ীমস্তক অবনত? এই অকল্যাণ—এই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাৎ আমার উপর কেন দেবীরাণি? আমি অজ্ঞান পথের ভিখারী, সংসারচক্রের

প্রত্যেক বিবর্ত্তনে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত, সর্ব্বদাই বহির্গমনোন্মুখ, আপনার কৃপাকটাক্ষেই এখনও এই দীনদাস পৃথিবীর আলো দেখ্‌তে পাচ্ছে! ঘটনাক্রমে পুলিন্দাটা আমার হাতে এসে পড়েছে—আমি আপনার কোন উপকার করিনি, দেবীরাণি! আর আমাকে লজ্জা দিবেন না।” আমি আনন্দে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না, উন্মাদ মনে কত কথাই কহিয়া ফেলিলাম !

দেবীরাণী আর কোন কথাই না কহিয়া পুলিন্দার প্রতি মনোযোগ করিলেন।

কিন্তু হইলে কি হয়, পুলিন্দাটি বড়ই শক্ত, খুব শক্ত চামড়ার দ্বারা দৃঢ়রূপে আবরিত। তাহা বলিয়া কি দেবীরাণীর কার্য্য বন্ধ হইবে? তখনি একখানি শাণিত ছুরিকা (যাহা আমার পিত্রালয়ে পাওয়া গিয়াছিল) দ্বারা চামড়ার আবরণ কাটিয়া ফেলিলাম! অমনি ভিতরের রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। দেবীরাণী জয়োল্লাসে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন! হর্ষোন্মাদে গোবিন্দলাল উন্মত্ত, দেবীরাণীর সহায়তা করিতে লাগিল! ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে একটা গভীর চীৎকার ধ্বনি ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ বনপ্রদেশটি কম্পিত করিয়া তুলিল! উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করিয়া দূরে জয়পালকে দেখা গেল, কম্পিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ প্রস্থানের একটা বিরাট ইঙ্গিত করিল!

“গোবিন্দলাল! বুঝি শেষ রাখ্‌তে পাল্লেম না!” দেবীরাণীর কণ্ঠ হইতে এই কথাটির অতি ক্ষীণ মূর্চ্ছনা আমার কর্ণপটাহে ঝঙ্কারিত হইতে না হইতে চতুর্দ্দিকে চাহিলাম, কেহই নাই! আমি যে একা—সেই একা! কি সর্ব্বনাশ! আবার আমি একা! দেবীরাণী কোথায় গেলেন? গোবিন্দলাল কোথায় গেল! উঃ একটা যেন ভয়ঙ্কর বিপদের স্রোতঃ উথলিয়া আসিতেছে!—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ভাঙ্গা ঘরটার অভিমুখে ছুটিলাম! ওহো হোঃ কিছুতেই রক্ষা পাইলাম না—কিছুতেই নিস্তার পাইলাম না! নক্ষত্র গতিতে সেই সেই প্রকার অর্দ্ধহস্তপরিমিত একটা লাঠি সবেগে আমার পায়ের গোছে আসিয়া লাগিল! চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া অন্তিম চীৎকারে ধরাশায়ী হইলাম! আমার যে বিপদ—সেই বিপদ!

অষ্টবিংশ চক্র।

আমার দ্বীপান্তর।

একি স্বপ্ন—না কুহক? স্রোতস্বতীর কল কল ধ্বনি!—দাঁড়ের ছল ছল শব্দ! উন্মাদ তরঙ্গ-নর্ত্তনে সমস্ত দেহ আন্দোলিত! আমি কোথায়? আবার একি? এখনো চক্ষু চাহিতে পারিতেছি না, সত্য সত্য একি স্বপ্ন? না কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে আমি এরূপ জ্ঞানশূন্য! ভয়ে ভয়ে চক্ষু চাহিলাম, ওহো হোঃ ভীষণাকার যমোপম সেই সেই রায়মহাশয় আমার মুখের প্রতি কটমট চক্ষে চাহিয়া আছে! কথা কহিতে পারিলাম না, স্থির নিস্পন্দ হইয়া ঐকান্তিক ভাবে কাতর-নয়নে তাহার প্রতি যোড়হস্তে চাহিয়া রহিলাম! ধীরে ধীরে কহিলাম, "দয়া কর, ক্ষমা দাও, একবার ব'ল তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" উঃ কি গভীর অট্টহাস! কর্ণকুহর যেন বধির হইয়া গেল!

বিকট তর্জ্জন গর্জ্জনে নরাধমটা কহিয়া উঠিল, "এবার কে তোকে রক্ষা কর্ব্বে রে পাজী? বারবার আমার চক্ষে ধূলি? জানিস্‌নি, তোর যম মাথার শিয়রে?" আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, "তা অনেক দিন হতেই জানি, যে দিন তুমি আমাকে প্রথমে জামাতা ব'লে আদর ক'রেছ সেই দিন থেকেই জানি! আর আমায় কিছু বলোনা,—যদি বড় দয়া কর, তা'হলে বল আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

রায়মহাশয়। "নিয়ে যাচ্ছি কোথায় তা জানিস্? যমালয়ে! বুঝ্‌লি নেমকহারাম বদমাস্! এবার তোর কোন রকমে নিস্তার নাই,—এবার তোকে দ্বীপান্তরে নিয়ে যাচ্ছি,—সেখানে কে তোকে সাহায্য করে দেখ্‌ব—কেমন ক'রে এবার তুই পালাস্,——এইবার দেখ্‌ছি আমি!"

একি শুনিলাম! দ্বীপান্তর! আমাকে এরা দ্বীপান্তরে লইয়া যাইতেছে? হা! সত্য সত্যই এবার আর আমার নিস্তার নাই! হায় হায়, দেবীরাণীর সমস্ত চাতুরীচক্র বুঝি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; হয়ত দেবীরাণীও ধরা পড়িয়াছেন! হা অদৃষ্ট! অপার সমুদ্র এত কষ্টে পার হইয়া শেষে কূলে আসিয়া নিমগ্ন হইলাম? উঃ নিদারুণ নিদারুণ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা! নরাধমটা ঠিক্ কথাই বলিয়াছে,—এবার আর আমার নিস্তার নাই!

ভয়ে ভয়ে চক্ষু চাহিলাম, রায়মহাশয় চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত নাই; চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, একটি ছোট কামরা; বোধ হয় একটা বজরার ভিতর শায়িত আছি। একটিও জানালা নাই,—রুদ্ধগৃহে রুদ্ধ ক্ষীণ বাষ্পের মত আমার ক্ষীণ প্রাণ বহির্বাতাসে মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে! বেশ বোধ হইতেছে ক্রমেই বজরার গতি বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিতেছি, চক্ষুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। আর দেবীরাণীর সাক্ষাৎ পাইব না, এবার আর রক্ষা পাইবার কোন আশাই নাই! জীবনের আদ্যন্ত বিষয় একে একে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখি, রায়মহাশয় আস্তে আস্তে দরজাটি ফাঁক করিয়া আমার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা মুখ (অতি বিকট মুখ!!) আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহারা যেন পরস্পরে কি বলাবলি কি একটা ইঙ্গিত করিতেছে! একবার হাসি একবার ক্রোধ সেই মুখদ্বয়ে যেন যুগপৎ মূর্ত্তিমান! সে দিকে আর চাহিতে পারিলাম না, মুদ্রিত চক্ষে নিরাশহৃদয়ে মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। যাহা হয় হউক, যতক্ষণ প্রাণ থাকে একমনে ভগবানকে ডাকি, কাকুতি মিনতিতে এই নরঘাতী পিশাচদের প্রাণ ভুলিবে না। অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছি, যে দিকে হয় ভাসিয়া যাই, আর বৃথা যুদ্ধ করিয়া কি করিব?

জানি না কোথায় যাইতেছি, কোথায় গিয়া বজরা থামিবে তাহাও জানিনা, অন্ধকার রুদ্ধগৃহে শুইয়া আছি, এ বজরার গতি কি তাহাও জানিনা। বিশেষরূপে কাণ পাতিয়া শুনিলাম, বাহিরে যেন একটা কিসের গোলমাল হইতেছে, চড়চড় মড়মড় হৈহৈ শব্দ! বেশ বুঝিতে পারিতেছি বজরা খানা যেন এক পেশে হইয়া ঘুরিতেছে! অনেক গোলমালের পর

বজরা খানা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আমিও বুঝিলাম, রুদ্ধশ্বাস কতকটা মুক্ত হইবে, দিবালোক দেখিয়াও অন্ততঃ চক্ষু জুড়াইবে। বাহিরে গুরুতর পদ-ধ্বনির সঙ্গে সজোরে দরজা খুলিয়া গেল, সদম্ভে রায় মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে আর দুই জন যমদূতাকৃতি লাঠিয়াল! কোন কথা না কহিয়া সজোরে আমার হস্তপদ মুখ চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিল। আমি চীৎকার করিলাম না, স্থির হইয়া রহিলাম, বিহিত বিধানে তাহাদের কার্য্য শেষ হইল। রায় মহাশয় কহিল, "খবরদার, যদি কোন কথা ক'স কি জোর দেখাস্ কি পলাবার চেষ্টা করিস্, তাহ'লে নিশ্চয় জান্‌বি তোকে এই হাত পা বেঁধে মাঝ মধ্যি থানে ফেলে দেব। ওরে দ্যাখ, তোরা দু'জনেই দু'হাত ধরে একে নিয়ে আয়!"

ওহো সত্য সত্যই আমার দ্বীপান্তর!

উনত্রিংশ চক্র।

নরকে নন্দন।

পাঠক মহাশয়! বলিতে পারেন এখন আমি কোথায়? আমার এই ক্ষীণ অতি দুর্ব্বল প্রাণ কোন্ অন্ধতম অন্ধকূপে নিস্তেজ পতিত? একবার বেলাময় সমুদ্রে—পুনশ্চ বালুময় তীরে, একবার ঘোরতর বিপদে—পুনশ্চ কথঞ্চিৎ সুখে, এইরূপ ক্রমাগত ঘোরতর সংসারচক্রের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে নিষ্পেষিত হইয়া কোন্ স্থানে—পৃথিবীর কোন্ দুর্গম কোণে পতিত আছি, আমার সহৃদয় পাঠক! অভাগার কথা কি শুনিবেন? সেই সেই যমালয়াধিক আমার শ্বশুর ওরফে রায়মহাশয়ের অতি দুর্গম অতি দারুণ প্রহরী বেষ্টিত গারদে! ওঃ আবার আমি গারদে!

হস্তপদ মুখ চক্ষু বন্ধিতাবস্থায় পরম যত্নে পরম সমাদরে আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহার অট্টালিকায় আনিয়া (অর্থাৎ আমার শ্বশুর বাড়ীতে) পরম সুখ ভোগে রাখিয়াছেন। নিদারুণ মনোবেদনায় ধারাবাহিক অশ্রুধারায় ভগবানের স্মরণ লইয়া আজ আমার একটি রাত্রি কাটিল। আহার, শয়ন, বসন প্রভৃতির ব্যবস্থাও সেইরূপ; গত সন্ধ্যার সময় এই গৃহের দ্বারের সম্মুখে আমার বন্ধন মোচন করিয়া এই ঘরে ফেলিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া কি হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, যেমন অন্ধ তেমন অন্ধকারেই রহিলাম। সমস্ত রাত্রের মধ্যে একবার মাত্র একটি লোক সেই রূপ বোবা এবং কালা আমাকে আহার করাইয়া গিয়াছে, তাহাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, বলাই বাহুল্য যে কোনরূপ উত্তর পাই নাই। সেইরূপ একাসনে কায়মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া একটি মুহূর্ত্ত একটি দিনের মত নিদারুণ উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করিতেছি। এমন সময় কোথা হইতে এ কি! একটি ক্ষীণকণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল। যখন এই ঘরে প্রথম প্রবেশ করি, তখনও ঐরূপ একটি ক্ষীণবিকৃত স্বর শুনিয়াছিলাম। ঐ শুন আবার সেইরূপ অতি ধীরে ধীরে যেন দেয়াল ভেদ করিয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিক নিরুদ্ধশ্বাসে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, কড়ির নিম্নদেশের ছোট ঘুলঘুলির মধ্য দিয়া তরুণ সূর্য্যালোক আসিতেছে। একটু বেলা হইলে যখন আমার দেহ আমি দেখিতে পাইলাম, চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ঐ শুন আবার সেই কাতরতা! উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে যে দিকে কাণ পাতি, সেই দিকেই সেই শব্দ যেন মলিন আবছায়ার মত ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একি আশ্চর্য্য! যেমন করিয়াই হউক, আমাকে এই রহস্য আবিষ্কার করিতেই হইবে। এবার এক এক দিকের দেওয়ালে অনেক ক্ষণ কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিন দিককার দেওয়ালে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; এবার পশ্চিম দিকে আমার একটু সন্দেহ হইল, বিশেষ চেষ্টায় বিশেষ পরীক্ষার পর, হাঁ, এই যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট

ক্ষীণ কণ্ঠ! অনেক কষ্টে যেন কথা বুঝিতে পারিলাম, "ভগবন্! আর কত দিন!" একি কথা! নিশ্চয় আমার মত কোন হতভাগ্য এই পাশের ঘরে বন্দী আছে। কতকটা স্থির হইলাম।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, যে লোক রাত্রে আহার করাইতে আসিয়াছিল, বিকট শব্দে লৌহ দরজা উন্মুক্ত করিয়া আহারাদি লইয়া সেই লোক প্রবেশ করিল। কত কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কাতরে, বিনয়ে, হাতে ধরিয়া, পায়ে ধরিয়া আমার দারুণ মনোবেদনা তাহাকে জানাইলাম, কোন ফল হইল না। সে কেবল ইঙ্গিতে আমাকে আহার করিতে বলে। আহার করিব কি, দুর্ব্বিসহ উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ভরিয়া রহিয়াছে, জল-স্পর্শ করিতে ইচ্ছা নাই। কি করিব, তাহার মর্ম্মভেদী তীব্রকটাক্ষে কঠোর আদেশ অপেক্ষাও ভয়ে ভয়ে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম। অতঃপর সে থালা ঘটী প্রভৃতি লইয়া লৌহ দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল, আমার গৃহ বন্ধ হইল; তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিকট ঝন্ ঝন্ শব্দে নিকটেই কোন গৃহের লৌহ দরজা উৎঘাটিত হইল। অতি সন্তর্পণে পশ্চিমদিক্‌কার দেওয়ালে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম; ক্ষীণ কণ্ঠের তীব্র তিরস্কারের মত আরও যেন কতকটা স্বর পরিষ্কাররূপে শ্রুত হইলাম, "ওরে, কতদিনে আমাকে তোরা অব্যাহতি দিবি?" আর একটা বজ্রকণ্ঠে যেন ইহার উত্তর হইল, "আমাদের যে কথা সে কাজ, এতদিন যে কোনকালে মুক্তি পেতে, আপনার দোষে আপনিই কষ্ট পাচ্ছ।" সেই ক্ষীণকণ্ঠ কাঁদিয়া উঠিল, "আর জ্বালা সহ্য হয় না রে! আমায় বিষ এনে দে, না হয় এক কোপে কেটে ফেল, তোরা না নিলে এ প্রাণ আপনা আপনি যাবার নয়।" তার পর আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না, কেবল দরজা বন্ধের বিকট ঝন্ ঝন্ শব্দ। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, এ পাশের গৃহে কোন মন্দভাগ্য বৃদ্ধ আমার মত বন্দী। কিন্তু কেন? কারণ কি? কেমন করিয়া বলিব, উহাদের দুরভিসন্ধি অভেদ্য ষড়যন্ত্র আমি বালক কি প্রকারে বুঝিব?

কিন্তু যাহাই হউক, ইঁহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই আকুল

হইয়া উঠিল। উপায় কি? আহা, এ সময়ে যদি একবার দেবীরাণীকে দেখিতে পাইতাম, এ অন্ধকার যমালয়েও আলো ফুটিত, ঐ বন্দীর সহিত মিলিত হইবারও বোধ হয় আশ্চর্য্য ছিল না। একবার কেন উচ্চস্বরে ইঁহাকে আহ্বান করি না? উভয়ে উভয়ের পরিচিত হইলেও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারি। কিন্তু যদি কেহ শুনিয়া ফেলে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও বিপদে পড়িতে হইবে। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় দিনটি কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর আবার সেই লোক আহার করাইতে আসিল, সেইরূপ কত কথাই কহিলাম, কোনই ফল হইল না। তাহার পর আমার পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিকেও আহার করাইয়া গেল। এইরূপে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। প্রত্যহই মনে করি ইঁহার উদ্দেশ লইব, কিন্তু বলি বলি করিয়া বলিতে পারি না, মুখে আসে,—কিন্তু কেমন একটা আতঙ্কে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে, সেই পার্শ্বস্থিত বন্দীর গৃহ হইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্ষীণ কম্পিত স্বর আমাকে আহ্বান করিল, আমি থাকিতে পারিলাম না, আমিও অতি সাবধানে উত্তর দিলাম। তিনি আবার কথা কহিলেন, "আমার মত মন্দভাগ্য কে তুমি? উত্তর দাও, ওরে অনেক দিন ভালমানুষের কথা শুনি নাই!" আমি কহিলাম, "আমিও অতিশয় মন্দভাগ্য, আমার পরিচয় এক কথায় বলবার নয়। আপনি কে? কতদিন এখানে আছেন?" উত্তর হইল, "কত দিন, কত দিন, হাঃ অনেক দিন! তুমিই কি সম্প্রতি এখানে এসেছ?" আমি বলিলাম, "হাঁ আজ এক সপ্তাহ হ'ল আমি এসেছি।" উত্তর হইল, "তবে তুমিও আমার মত দুরাত্মাদের জালে জড়িয়ে পড়েছ কেমন?" আমি কহিলাম, "আমিও আজ দুই বৎসর এদের খর্পরে পড়িছি, এর চেয়েও কত কত বিপদ আমার উপর দিয়ে কেটে গেছে; কিন্তু কারণ যে কি, কেন যে এরা আমাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে, তার কিছুই জান্‌তে পারি নি।" হঠাৎ তিনি বলিলেন, "চুপ কর, আজ এই পর্য্যন্ত, তুমি নূতন এসেছ এদের গতি বিধি এখনো জান্‌তে পার নাই, আমি অনেক দিন এসেছি আমি সব জানি; আমি প্রথমে কথা না কইলে তুমি কথা কয়ো না;—বস্ আজ এই পর্য্যন্ত।"

এইরূপে মধ্যে মধ্যে অতি সাবধানে আমাদের কথাবার্ত্তা হয়। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কেবল রোদন করেন, আর কোন কথা কহিতে পারেন না; সুতরাং আমরা উভয়ে উভয়ের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। উভয়ের মিলিত হইবার জন্য বড়ই ব্যগ্রতা হইয়াছে; কিন্তু কেমন করিয়া দেয়াল ভেদ করি? পাথরের মত গাঁথনি, এ গাঁথনি ভেদ করা কি আমার মত বালকের কাজ?

এখন বেলা দ্বিপ্রহর, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া দেয়ালের দিকে চাহিয়া আছি; অদ্য সকাল হইতে সেই পার্শ্বস্থিত বন্দীর সহিত একবারও কথা হয় নাই, আমিও সাহস করিয়া অগ্রে কোন কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। এখনও পর্য্যন্ত অনাহার, একবার বসি একবার উঠি— বড়ই অস্থির চিত্তে সময় অতিবাহিত করিতেছি। ঝন্‌ঝন্ শব্দে লৌহ দরজা উন্মুক্ত হইল, আমার আহার আসিল। যে লোক আইসে, সেই লোক,— তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। বেশ জানি, সে জানিয়াও জানিবেনা শুনিয়াও শুনিবেনা; সুতরাং ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য আমি আহারে বসিলাম। অন্নের ভাব কিন্তু আজ কিছু পৃথক দেখিলাম, বেশ পরিষ্কার গোছান মন্দিরের মত চূড়া তোলা; একটু সন্দিগ্ধ হইয়া অন্নচূড় ভগ্ন করিলাম, ভগ্ন করিয়া দেখি অন্নরাশির ভিতর অতি ক্ষুদ্রাকারে একখানি চিঠির মত এক টুক্‌রা কাগজ লুক্কায়িত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পত্রখানি অতি সঙ্গোপনে সেই লোকটির অসাক্ষাতে লুকাইয়া রাখিলাম; যতদূর পারিলাম অন্ন ব্যঞ্জন উদরস্থ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলাম। নিয়মিত রূপে সেই লোকটি থালা ঘটি প্রভৃতি লইয়া লৌহদরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

মনে প্রাণে দারুণ সন্দেহ, এ কি আশ্চর্য্য সংঘটন! অন্নরাশির ভিতর এ কিসের পত্র? ঘুল্‌ঘুলির নিকট যাইলাম, হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম দিবালোকে কষ্টে পত্রখানি পাঠ করিতে সমর্থ হইলাম।

পত্রটি এইরূপ—

"বহু কষ্টে, বহু সন্ধানের পর তোমার উদ্দেশ পাইয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর, তাঁহার কৃপা থাকিলে এবার এ বিপদ হইতেও উত্তীর্ণ

হইতে পারিবে; প্রাণ স্থির রাখ, মনের বলে বলীয়ান হও, অতি শীঘ্রই তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার চেষ্টায় আছি। কিমধিকমিতি—

তোমার সেই
বীরবাহু।"

অতুল আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলাম! আহা দেবীরাণি! ধন্য তোমার স্নেহ—ধন্য তোমার মমতা! এমন ভয়ঙ্কর দুর্গম স্থানেও তোমার দয়ার বিরাম নাই! আমার বিপদ সাগরে তুমিই একমাত্র কাণ্ডারী! এস বীরজাদেবি! এস, তোমাকে একবার দর্শন করি, এই অন্ধকূপ আলোকিত হউক, আমি আত্মহারা হইয়া যম যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই! ওহো তুমিই আমার নরকে নন্দন!!

ত্রিংশ চক্র।

একি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির আবির্ভাব!

এইরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল, পত্রখানি বক্ষে ধারণ করিয়া থাকি; দেবীরাণী আজিও আসিলেন না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—সন্ধ্যা হইতে পুনশ্চ প্রভাত পর্য্যন্ত প্রতি নিমিষেই দেবীরাণীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করি, যে লোক আইসে সেই, দেবীরাণীর কোন সন্ধান নাই। প্রতিদিনই একবার করিয়া তাঁহাকে সাড়া দিই, কিন্তু কোন উত্তর পাই না। পার্শ্বের গৃহে তিনি যে আছেন, তাহা আমি বেশ জানি; কারণ আমার আহারের পরক্ষণেই সেই গৃহের দরজা উন্মোচনের শব্দ পাই, তাঁহার আহার পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে, নিয়মিত সময়ের পর গভীর গর্জ্জনে লৌহ দরজা বন্ধ হয়, ইহা নির্দ্ধারিত সময়ে প্রতিদিন শ্রবণ করি!

অদ্য কিন্তু সে নিয়মের ব্যত্যয় দেখিলাম। আমার পার্শ্বস্থিত বন্দীর গৃহ আজ সকাল হইতে উন্মুক্ত হইতেছে, ক্রমাগত পদধ্বনি—মনুষ্যকণ্ঠের মিশ্রিত গুঞ্জন অনবরত শুনিতেছি, আমার আহারের নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু আমার আহার আসিল না—এইরূপ আজ সমস্তই বিশৃঙ্খল দেখিতেছি।

কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া শুনিলাম, বাহিরের গোলমাল থামিয়া গিয়াছে, পার্শ্বস্থিত গারদ বন্ধ হইয়াছে, বহির্দ্দেশ নীরব—নির্জ্জন। অকস্মাৎ আমার গৃহের দরজা খুলিয়া গেল। আমার আহার লইয়া এ কে আসিল? এ ত সে লোক নয়—যে লোক প্রত্যহ আইসে—এ ত সে লোক নয়? কে তবে তুমি? ওহো চিনিয়াছি,—এ অন্ধকারেও তোমাকে বেশ করিয়া চিনিতে পারিয়াছি।—এঁ্যা এঁ্যা গোবিন্দলাল? আমার পরম সুহৃদ দেবীরাণীর সহায় তুমি সেই গোবিন্দলাল? "গোবিন্দলাল! গোবিন্দলাল! এতদিন পরে কি হতভাগাকে তোমাদের মনে পড়ল?"

শশব্যস্তে গোবিন্দলাল কহিয়া উঠিল, "চুপ করুন—চুপ করুন, অত অস্থির হবেন না, এমন ক'রে চেঁচাবেন না। শীগ্‌গির শীগ্‌গির এই অন্ন ব্যঞ্জন খেয়ে ফেলুন, তার পর অনেক কথা হবে।" আমি কহিলাম, "সে পরে হবে, আমি আহারের জন্য একটুও কাতর নই,—আগে বল দেবীরাণী কোথায়—তিনি কেমন আছেন?" গোবিন্দলাল কহিল, "তিনি নিকটেই আছেন। আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না, হাত মুখ ধুয়ে যা পারেন খেয়ে নিন্।"

গোবিন্দলালের উপদেশ মত তাহাই করিলাম, যথাসম্ভব আহার্য্য উদরস্থ করিলাম। গোবিন্দলাল কহিল, "শুনুন, আজ গভীর রাত্রে যখন চাদ্দিক নিশুতি হবে, দেবীরাণী ছদ্মবেশে এই ঘরে দেখা দিবেন, তারপর তাঁর হুকুম মত চল্‌তে পার্‌লে, বোধ হয় এবারেও রক্ষা পেতে পারবেন। সন্ধ্যার পর যে লোক আপনাকে আহার করাতে আস্‌বে, তার সঙ্গে বিশেষ কোন কথার দরকার নাই। দেবীরাণী আস্‌বেন বোলে আপনার মুখে কোনরূপ প্রফুল্ল ভাব সে যেন না দেখ্‌তে পায়, যেমন আছেন ঠিক্ তেমনিই থাক্‌বেন।" ত্রাস্তে লৌহ দরজা বন্ধ করিয়া গোবিন্দলাল প্রস্থান করিল।

এত জ্বালা এত কষ্ট এত যে উৎকণ্ঠা, এক দেবীরাণীর আগমন সংবাদ শ্রবণেই যেন সমস্ত দূর হইল। ওহো, কত কালের পর আজ দেবীদর্শন ভাগ্যে ঘটিবে, উঃ! কত দিনের পর তাঁর মুখচন্দ্র দর্শন করিব! আহা হাঃ! আর সময় কাটে না—আজিকার দিন যেন কাটে না। একবার বসি, একবার উঠি,—আনন্দ-প্রবাহে অনির্ব্বচনীয়রূপে আমি ভাসমান। কখন সন্ধ্যা হইবে, কখন গভীরতায় নিশীথিনী আচ্ছন্না হইবে? আমার মহাদেবীর কখন দর্শন পাইব?

ঘুল্‌ঘুলির আলোক ক্রমেই নির্ব্বাণ হইল, এক্ষণে সন্ধ্যার আবির্ভাব; 'দেবী-নাম' জপ করিতে করিতে ক্রমেই রাত্রি গভীরা হইল। যে লোক আইসে, সেই লোক আসিয়া আমায় আহার করাইয়া গেল; কোন কথা কহিলাম না—কোন ভাবই প্রকাশ করিলাম না। আর যেন সময় কাটেনা, আর অপেক্ষা করিতে পারি না। প্রতি মুহূর্ত্তে দেবীরাণীর শুভাগমন অপেক্ষা করিতেছি, নিমীলিত-নেত্রে দেবীরাণীর রূপ ধ্যান করিতেছি, দেবীরাণীর কার্য্যকলাপ, অমানুষিক বুদ্ধি, তাঁহার লোকাতীত অভূতপূর্ব্ব-দেবীভাব, পলকে পলকে কল্পনা করিতেছি, গভীর হইতে গভীরতায় মগ্ন হইতেছি, ভাব-বিভোরে আত্মহারা তন্ময়ে লীন হইয়া ঠিক্ দরজার সম্মুখে ধ্যানে বসিয়া আছি, অকস্মাৎ উন্মুক্ত শীত সমীরণে উত্তপ্ত দেহপ্রাণ শীতল হইল। চক্ষু চাহিলাম, সম্মুখে অনুপম বালক মূর্ত্তি! হরি হরি! সেই প্রাণারাম বালক বেশে আমার দেবীরাণী দর্শন দিয়াছেন। আনন্দোন্মাদে এক লম্ফে দণ্ডায়মান হইয়া (কি পাগল! কি জ্ঞানশূন্য আমি!!) তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলাম, তিনিও তৎক্ষণাৎ পার্শ্বে সরিয়া গিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন; আমার উন্মত্ততা দূর হইল, ভাবিলাম, অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। করজোড়ে বিনীতভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম; বাহিরের একটি ক্ষুদ্র দীপশিখায় তাঁহার মুখচন্দ্র কিয়ৎপরিমাণে উজ্জ্বলীকৃত ছিল। ক্ষণেক উভয়েই নির্ব্বাক—উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া আছি।

দেবীরাণী প্রথম কথা কহিলেন, "কেমন আছ?"

"কেমন আছি? দয়াময়ী দেবি! কেমন আছি—তাকি দেখ্‌তে পাচ্ছ

না? এখনো আছি, তোমার শুভ-দর্শনাপেক্ষায় এখনো বেঁচে আছি। তোমাকে দেখ্‌ব বোলে—তোমার কথা শুন্‌ব বোলে, এই ঘোরতর বিপদের মধ্যে তোমার সমুখে এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব বোলে এখনো আছি।"

দেবীরাণী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "থাক্‌ আর তোমায় বক্তৃতা কত্তে হবে না, একটু চুপ কর! এখন এই সময়ে অপর কোন লোক নেই বলেই এত গুলো পাগ্‌লামী কত্তে পেরেছ;—আর বেশী ক্ষেপো না! এস, আমার হাত ধরে ধরে সাবধানে নিঃসাড়ে বাইরে এস।" অতি চুপি চুপি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পশ্চিম দিকের ঠিক পার্শ্বের ঘরে আমরা প্রবিষ্ট হইলাম।

উঃ কি ভয়ঙ্কর হৃদয়বিদারক দৃশ্য! একজন জরাজীর্ণ অশীতিপর বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শয়ান! দরিদ্রের রোগসেবা হেতু যে সমস্ত সামগ্রী আবশ্যক, তৎসমস্তই অতি বিশৃঙ্খল ভাবে চতুর্দ্দিকে জীর্ণাবস্থায় পতিত! রোগী উত্তর দক্ষিণে লম্ববান অবস্থায় শয়িত আছেন। দেবীরাণী আমাকে অগ্রসর করাইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া অপেক্ষাকৃত স্বর উচ্চ করিয়া কহিলেন,—"চোখ্‌ চেয়ে দেখুন, যাঁকে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, তাঁকে এনেছি, একবার চেয়ে দেখুন।" রোগী তথাপি বিনিদ্র হইলেন না। আমি চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইঁহারি সঙ্গে কি আমি কথা কইতেম? কে ইনি দেবীরাণী?" দেবী কহিলেন, "সে পরিচয় উঁহারি মুখে শুন্‌তে পাবে। বোধ হয় বড় কাহিল হয়ে প'ড়েছেন, দাঁড়াও, একটু দুধ ওঁর মুখে দি।" দেবীরাণী অতি যত্নে রোগীর মুখ তুলিয়া একটু দুগ্ধ ঢালিয়া দিলেন। রোগীর চৈতন্য হইল, ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া অতি ধীরে কহিলেন, "কেও?"

দেবীরাণী কথঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কহিলেন, "আমি; এখন কেমন আছেন?" বৃদ্ধ বিরক্ত মুখে হতাশ স্বরে কহিলেন, "আছি এখনো!"

দেবীরাণী। "যাকে দেখ্‌বেন বলেছিলেন, তাঁকে এনেছি—এই দেখুন।"

বৃদ্ধ। "কই, আমার কাছে বসাও।"

তাঁহার বক্ষের নিকট আমি বসিলাম। অতি বিনীত ভাবে কহিলাম, "এখন একটু সুস্থ ব'লে বোধ হচ্ছে কি?"

রোগীর শুভ্র শীর্ণমুখে একটি ক্ষীণ নীরব হাসি দেখা দিল। অতি ধীরে ধীরে অসংলগ্ন ভাবে কহিতে লাগিলেন, "এগিয়ে এস—কাণের কাছে মুখ নিয়ে এস, বেশী কথা বল্‌বার শক্তি নাই। তোমার নাম কি বাবা?"

আমি। "আমার নাম ব্রজেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

রোগী। "পিতার নাম?"

আমি। "হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।"

রোগী। "দেবীরাণীর মুখে শুন্‌লাম তোমার জীবনী নাকি মহা রহস্যে ঢাকা আছে। আগা গোড়া বেশ ক'রে আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি?"

আমার এই জীবন-কাহিনী আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তিনি যতই শ্রবণ করেন, তাঁহার সেই রক্তশূন্য শ্বেত মুখে কি এক অদ্ভুত কৌতূহলে বিকৃত ভাব ধারণ করিতে থাকে। স্থির নিস্পন্দ হইয়া আমার সমস্ত কথাই তিনি শ্রবণ করিলেন। আমার ঠিক পশ্চাতে দেবীরাণী দণ্ডায়মান ছিলেন; পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম, দেবীরাণী নাই, একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া দরজার নিকটে গিয়া তাঁহার সন্ধান করিলাম, দেখিতে পাইলাম না। আবার ফিরিয়া আসিয়া রোগীর শয্যায় উপবেশন করিলাম। হঠাৎ রোগীর অবস্থা বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল, মুখে এক প্রকার অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি বড়ই কাতর হইলাম। দেবীরাণীর উপদেশ মত তাঁর মুখে একটু দুগ্ধ ঢালিয়া দিলাম; তিনি অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া জড়িত স্বরে কহিলেন, "ওঃ বড় কষ্ট! আর দেরি নাই, আমার কাণের কাছে মুখ দাও।" স্বর ক্রমেই অস্পষ্ট—ক্রমেই জড়িত হইতে লাগিল, হাঁ করিলেন, এবার আর দুধ দিলাম না। গঙ্গাজল ছিল, তাহাই একটু মুখে ঢালিয়া দিলাম। পীড়িত যেন অপেক্ষাকৃত একটু সবল হইয়া কহিলেন, "বালিসের নীচে হাত দাও, একটা চাবি পাবে, এই ঘরের পশ্চিম কোণে পাথর চাপা আছে, সেই পাথর খুলে একটা ছোট বাক্স পাবে, তার

ভিতর যা যা আছে, সব তোমার—বুঝে কাজ কোরো—ওঃ বাপ্‌রে প্রাণ যায়! আ—মায়—ক্ষমা—কর—দয়া—ওঃ—"ঈশ্বর! ক্রমে স্বরবন্ধ, আমার মুখের প্রতি চাহিয়া চিরদিনের মত চক্ষু নিমীলিত হইল, মুমূর্ষু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য, তাহার আনুসঙ্গিক গভীর চিন্তা, তাঁহার পর আবার এই জীবন্ত দেহ শবে পরিণত হইল। আমার হৃদয় ভয়ঙ্কর ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল! কিয়ৎক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। দূরে একটা কিসের শব্দ শুনিয়া আমার মোহ ভঙ্গ হইল। ভয়ঙ্কর বিপদ-ক্ষেত্রে উপস্থিত আছি, কালবিলম্বে আরও অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। শবের মাথার শিয়রে বালিসের নীচে হাত দিলাম, যথার্থই একটা চাবি পাইলাম। আনন্দ-ভয়-বিষাদে সেই ঘরের পশ্চিম কোণে অতি ত্রাস্তে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সেই স্থান অতি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, তৎক্ষণাৎ হাত দিয়া পরিষ্কার করিলাম। দেখিলাম সমতল মেজের সহিত সংলগ্ন সত্য সত্যই একখানা পাথর বেমালুম ভাবে চাপা রহিয়াছে। এই পাথর খুলিবার অবশ্যই কোন রকম উপকরণ অস্ত্র এই গৃহ মধ্যে কোথাও না কোথাও আছে। আবার সেই শবের শয্যার নিকট আসিলাম, আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর সেই শয্যার ঠিক্ মধ্যদেশে অর্থাৎ শবের কটীদেশের নীচে, ছোট একটি লৌহ অস্ত্র এবং একটি হাতুড়ী রহিয়াছে দেখিলাম। বাম হস্তে শব দেহ ঈষৎ সরাইয়া অতি কষ্টে হাতুড়ী এবং লৌহ দণ্ড সংগ্রহ করিলাম। তৎক্ষণাৎ প্রভূত বলে সেই অস্ত্র সাহায্যে পাথর খানি খুলিয়া ফেলিলাম, দুই হস্ত পরিমিত একটি লৌহ সিন্দুক বসান রহিয়াছে, তখনি সেই চাবির দ্বারা সিন্দুকের তালা খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, একটি স্বর্ণ কৌটা এবং এক বাণ্ডিল কাগজ উত্তমরূপে জড়িত; তখনি কৌটাটি এবং কাগজ হস্তগত করিয়া পুনশ্চ তালা বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। বলা বাহুল্য পাথরখানিও যথাসম্ভব চাপা দিয়া ফেলিলাম।

আর কালবিলম্বে বিপদপাতের সমূহ সম্ভাবনা ভাবিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একেবারে আমার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম;

ঘোরতর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। ইতিপূর্ব্বে কিয়দ্দূরে যে সামান্য একটি দীপশিখা দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। এখন কোন্ দিকে কোন্ পথে যাই? দেবীরাণীও কখন্ কোন্ অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহাও জানি না। তবে এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? এইত আমার রুদ্ধশ্বাস মুক্ত হইয়াছে, দ্বারও অবারিত, প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য কতকটা আমাকে নিরাপদ করিয়াছে, এই বৃদ্ধের অপূর্ব্ব রহস্য, তাঁহার প্রাণ ঢাকা গোপনীয় বস্তু আমার হস্তগত হইয়াছে, বৃদ্ধের গতপূর্ব্ব কাতরোক্তির সহিত আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের না জানি কোন্ স্বর্গীয় সুখের সম্বন্ধ মিশ্রিত রহিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব?

এ বাড়ীর পথ জানি না, দুরাত্মারা ইহার ছন্দাংশও বুঝিতে দেয় নাই, জানি না কোন্ দিকে যাইলে আমি নিরাপদ হইব। গৃহমধ্যে শব পতিত, আমার চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত দেহ শবাকারে পরিণত হইয়াছে, আমি হিন্দু হইয়া হিন্দুর শব এইরূপে বিনা সংকারে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাই? এ পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই? কি করি, আমি উভয় শঙ্কটে পড়িলাম। আমি একা, সম্পূর্ণ নির্ব্বান্ধব নিরাশ্রয়ী একা, এ হেন আমার দ্বারা শবদেহ সংকার কোনরূপেই সম্ভবে না। যাহাই হউক, ভাবিয়া আর কি করিব, দেবীরাণীর উপর এই সমস্ত নির্ভর করিয়া নানান্ খানা ভাবিতে ভাবিতে সেই দুর্গম অন্ধকার ভেদ করিতে করিতে অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলাম। অন্ধকারে চলিতে চলিতে অন্ধকার সমুদ্রে নিমগ্না হইয়া একি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির আবির্ভাব!

একত্রিংশ চক্র।

এখন তবে কোথায় যাই ?

পাঠক মহাশয়! সেই বিভীষণা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির অধিকারিণীকে চিনিয়াছেন কি? উঃ বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! শুনিলে আপনিও আমার মত রোমে রোমে কম্পিত হইয়া উঠিবেন! এ সেই ধূমাবতী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী দলপতির মা—ওরফে আমার দিদিশাশুড়ী! দশ নম্বর গারদ হইতে পলায়ন করিয়া এই প্রেতিনীর নিকট বনলতা সাজে কিয়ৎক্ষণের জন্য পরিচিত ছিলাম! ইহারি নিকট হইতে আমার কুগ্রহচক্রের দ্বিতীয় চক্র ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মথ্যমান উত্তাল-তরঙ্গে নিষ্পেষিত হইয়া ভয়ঙ্কর বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আবার তাহারি জালে ধরা পড়িলাম? উঃ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ! মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্যে ধন্যবাদ!

সেই বৃদ্ধা ডাকিনী যেন হাঁ করিয়া আমাকে গিলিতে আসিল! সর্পবৎ উজ্জ্বল চক্ষে যেন আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল! আমাকে দেখিতে পাইয়া পাপিনী একটা অমানুষিক হাস্য করিয়া উঠিল! চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, অন্ধকার-সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে আলোড়িত হইল।

আমি নির্ব্বাক নিশ্চল—মন্ত্রমুগ্ধবৎ ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি; পাপিনী আর কোন কথা না কহিয়া প্রভূত বলে আমায় টানিয়া লইয়া চলিল! সেই মৃত্যুন্মুখী লোলচর্ম্মার শরীরে বল দেখিয়া ভাবিলাম, সত্য সত্যই এ নারী-প্রেতিনী!

দুর্গম অন্ধকারে নিমগ্ন একটা ভগ্ন অট্টালিকার ভগ্নগৃহে সেই 'মঙ্গলাবুড়ী" আমাকে সবলে লইয়া আসিল! কর্কশ কণ্ঠে ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কারে কর্কশা কহিল, "তুই ভৈরবগাঙ্গুলীর ছোট মেয়ে নয়? তোর নাম বনলতা নয়? ওরে হারামজাদা পাজীছেলে! আমার সঙ্গে তোর এত চালাকী? ও মা!

আমাকে অবাক্ ক'রে তুলেছে ? তোর এত বড় স্পর্দ্ধা ? ওরে, আমি ডাকাতের মা, তোর মত কত ব্যাটার মাথা এই হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছি ! এবার মরেছ, আমার হাতে এবার আর তোর ছাড়ান্ ছিড়েন নেই !"

সবলে এক ধাক্কায় সেই গৃহ মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। মর্ম্মান্তিক ক্রোধে আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, নিজের শুভাশুভ না ভাবিয়া, উপস্থিত বিপদ ভুলিয়া—স্ত্রীলোক বলিয়া কোন মতেই মার্জ্জনা করিবার বিবেচনা রহিল না। যেমন উঠিবার চেষ্টা করিয়াছি, পাপিনী আমার পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক এক চপেটাঘাত করিল,—তাল সামলাইতে পারিলাম না—আবার ধরাশায়ী হইলাম। এবার দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তিম বলে তাহাকে আক্রমণ করিলাম ; জানি না, কোথা হইতে এত' বল আমার শরীরে আসিল। নরঘাতিনী কতক্ষণ আমার সহিত যুঝিতে পারে ? আমার একটা মুষ্টাঘাতে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল ! গৃহের এক কোণে একটা ক্ষুদ্র প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার সবেগ পতনে তখনি নিবিয়া গেল, আমারও অপূর্ব্ব সুযোগ—পলায়নের পথ পরিষ্কার হইল।

ডাকিনী ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল, বাহিরেও অনেকগুলি পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম,—আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখনি তথা হইতে সরিয়া পড়িলাম। অন্ধকার—পথ জানি না, তাহাতে ভগ্ন গৃহ ; স্তূপ স্তূপ ইট কাট চারিদিকে ছড়াছুড়ি। পায়ে পায়ে কত হোঁচট খাইলাম, কতবার পড়িয়া গেলাম—এইরূপ বড় কষ্টে উর্দ্ধশ্বাসে কত ঘর দ্বার দালান অতিক্রম করিতে করিতে ছুটিলাম ! হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষত বিক্ষত দেহে অনেক কষ্টের পর সুদর দরজা দেখিতে পাইলাম। এতক্ষণে যেন প্রাণ আসিল, একটু যেন নিরাপদ হইলাম। একবার কাণ পাতিয়া শুনিলাম, বৃদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে যেন এই সমস্ত ঘটনা কাহাকে বলিতেছে ; বুঝিলাম, বুড়ী আর একাকিনী নয়—দস্যুরা সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছে। এখন তবে কোথায় যাই ? কোন্ দিকে যাইলে নিরাপদ হইতে পারি ? উৎকণ্ঠায় ভয়ে প্রাণ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কোথায় যাই ? কোন্ পথ ধরিলে পাপাত্মাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারি ? দীনবন্ধো ! রক্ষা কর—দয়াময় ! বিপন্ন

পথহারা পথিককে পথ দেখাও! কোন্ পথে যাই? আর বৃথা চিন্তা করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকের পথ ধরিলাম! উঃ এখনও ডাকিনীর তীব্র চীৎকার আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে! প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চিম মুখে অন্ধকার ভেদ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলাম। একবার স্থির মনে পশ্চাৎভাগে স্থির কর্ণ হইয়া শুনিলাম, দূরে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি! সন্দেহ হইল—পলায়নের বেগমাত্রা আরো বাড়াইয়া দিলাম, ক্রমাগতই ছুটিতেছি।—ঘন জঙ্গল ছাড়াইয়া এইবার একটা মাঠে পড়িলাম,—আমার ভয়ও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল! এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ছিলাম, কতকটা লুকাইবার স্থান ছিল, এখন চতুর্দ্দিক ফাঁকা, লুকাইবার স্থানও নাই,—পাপাত্মাদের পাপ দৃষ্টি হইতে এড়াইবারও সম্ভাবনা নাই। কি করিব, অদৃষ্টে যাহাই থাক্—হাঁপাইতে হাঁপাইতে যতদূর পারিলাম—ছুটিতে লাগিলাম। আর পারি না,—চতুর্দ্দিক ঘুরিতেছে—প্রান্তর মধ্যস্থিত একটা বটবৃক্ষ তলে একবার বসিলাম, কাণ পাতিয়া শুনিলাম বাতাসের সন্ সন্ শব্দ!

অনুমান দুই ঘণ্টা এইরূপ প্রবল বেগে ছুটিতেছি; জানি না, কত পথ অতিক্রম করিয়াছি! অপেক্ষাকৃত শীত বাতাসে অনুভবে বুঝিলাম, নিকটে কোন জলাশয় আছে; উঠিলাম, অনুসন্ধান করিতে করিতে অনতিদূরে প্রকৃতই একটি পুষ্করিণী বিরাজ করিতেছে। তখনি নামিলাম, হস্তপদ প্রক্ষালনান্তর আকণ্ঠ পূরিয়া জল পান করিলাম, অনেক সুস্থ হইলাম।

আবার যথাসম্ভব গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে প্রান্তর জঙ্গল প্রভৃতি কত স্থানই অতিক্রম করিলাম। জনমানব দেখিতে পাইলাম না, কেবল নিশাচর জন্তুর অস্পষ্ট চীৎকার ধ্বনি! ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল, প্রাচী দিক্ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল,—এইবার লোকালয়ের মধ্যে পড়িব।—এত বিপদেও কিন্তু এতক্ষণ ছিলাম ভাল,—এতক্ষণ প্রকৃতির গর্ভে লুক্কায়িত ছিলাম, প্রকৃতি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন দিবালোকে নরলোকের মধ্যে পড়িব,—বিপদের ভারও ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে, ভয় ভারের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও আমার মাথার শিয়রে আসিয়া বসিবে। এখন তবে কোথায় যাই?

দ্বাত্রিংশ চক্র।

বন্যশূকর।

এইরূপে তিন দিন কাটিয়া গেল। বনপথ ভিন্ন প্রশস্ত পথে ভ্রমেও পদার্পণ করি না; ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন ফল এই মাত্র আহার করি; রাত্রি হইলে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন নিরাপদ বৃক্ষতলে শয়ন করি—জগজ্জননী ভগবতীর মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া নিদ্রা যাই। সূর্য্যোদয়ে কথঞ্চিৎ শরীরে বলাধান হয়, ক্রমাগত চলিতে আরম্ভ করি; যে দিকে নয়ন চলে, সেই দিকেই যাই; কিন্তু আমার দিঙনির্ণয় সেই পশ্চিম-মুখে। আমি বেশ জানি, হাজার দস্যুর গ্রাস হইতে পলায়ন করিয়াছি—হাজার দস্যুই আমার অনুসন্ধানের নানাবিধ উপায় করিতেছে, যখন আমা হেন বালকের উদ্দেশ দুরাত্মাদের এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, তখন এই পশ্চিমদিকই আমার পক্ষে বোধ হয় প্রশস্ত নিরাপদ, কপালে যাহাই থাক, আর দিক্‌ভঙ্গ করিব না, পথে পড়িয়া মরি সেও ভাল, তবু আর তাহাদের জালে ধরা দিব না।

সম্মুখে একটি অতি পরিষ্কার পুষ্করিণী, অনেকক্ষণ তাহার তীরে বসিয়া কায়া প্রাণ শীতল করিলাম, পরিশেষে অবগাহন স্নান করিয়া সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, একখানি মাত্র অতি জঘন্য বস্ত্রে আমার শরীর আবরিত,—সেই ভিজা কাপড়খানি অঙ্গে শুকাইয়া লইলাম।

এখন প্রচণ্ড জ্যৈষ্ঠ মাস, ফলের প্রাচুর্য্য এ সময় ছাড়া বঙ্গের কোন ঋতুতে নাই। পুষ্করিণীর চারিদিকেই আম্র কাঁঠালে পরিপূর্ণ, যত পারিলাম

খাইয়া উদর পরিতোষ করিলাম। পাঠিকা ঠাকুরাণি! আজ আমি কত নিরাপদ ভাবুন দেখি? আমার স্বাধীন প্রাণ—স্বাধীন মুক্ত বাতাসের স্বাধীন ক্ষেত্রে বসিয়া অমৃতফল ভোজন করিয়া আজ কতদূর যে পুলকিত, আমার আঠার বৎসরের পূর্ব্বের পিত্রালয়েও বোধ হয় এত আনন্দ এত স্বাধীনতার পুলক ছিল না। যাহা হউক, সেই সরসীতীরে ঘনপল্লবাচ্ছন্ন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া আমি আজ বড়ই শান্তি পাইলাম। আর উঠিতেও ইচ্ছা করে না, পাও চলে না, আর কতদূর যাইব, কতদূরে লোকালয় পাইব, জানি না; যদিও মানুষের কাছে আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করে না, তত্রাচ এইরূপ জনশূন্য প্রান্তরে বৃক্ষতলে বসিয়া একাকী কেমন করিয়া প্রাণ বাঁচাইব? এরূপ ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকাও আমার পক্ষে কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়। পাষণ্ড নরঘাতিগণের নিকট হইতে আমি তিন দিনের দূরে বসিয়া আছি, এই তিন দিনের ব্যবধান কি দস্যুর ব্যবধান? ১০ নম্বর গারদ হইতে পলাইয়া কতদূরের পথ দেবনারায়ণবাবুর অমন মহৎ আশ্রয়ে থাকিয়াও যখন রায়মহাশয়ের চক্ষু এড়াইতে পারি নাই, তখন আমি কেমন করিয়া বলিব যে এখনও নিরাপদে আছি? এতক্ষণ বেশ ছিলাম, হঠাৎ একটা অনিশ্চৎ ভয় আমাকে আক্রমণ করিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, গাত্রোত্থান করিলাম—আবার পশ্চিমমুখে যাত্রা করিলাম। পেট-কাপড়ে অনুসন্ধান করিলাম, সেই বৃদ্ধ প্রদত্ত কৌটা এবং কাগজ গুলি ঠিক্ আছে।

বনজঙ্গল ছাড়াইয়া আবার একটা প্রান্তরে পড়িলাম।—দূরে মেঘের মত একটা পাহাড়ের প্রতি হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লাল-কিরণের ছটায় পাহাড়ের কিয়দংশ অতি সুন্দর শোভা পাইতেছিল! পাহাড় দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল! একেত বাল্যাবধি পাহাড় দেখিতে আমি বড়ই ভালবাসি, তাহার পর অবশ্যই কোন যোগী সাধুলোকের অধিষ্ঠান সম্ভাবিত; ঐ পর্ব্বতের প্রতি আমি বিশেষ লক্ষ্য করিলাম। যেমন করিয়া পারি আমাকে ঐ স্থানে পঁহুছিতে হইবে,—যথাসম্ভব দ্রুত-গতিতে ঐ দিক্ অভিমুখে ছুটিলাম।

দেখিতে দেখিতে দিনটি কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার ধূম্রল ধূসর মূর্ত্তি ক্রমে

জগতীতলে দেখা দিলেন,—আমার চলিবার বিরাম নাই,—কিন্তু কোথায় সে পর্ব্বত? সে পর্ব্বতের দূরতা পরিমাণ আমার সাধ্যাতীত। অপরিচিত দুর্গম প্রদেশ, তায় রাশী রাশী অন্ধকারের একত্র সমাবেশে গমনের বড়ই ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল; কি করি, যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। এমন সময়ে এ কি ভয়ঙ্কর বিপদ! একটা দুর্দ্দান্ত বন্যশূকর তীরবেগে আমার পার্শ দিয়া চলিয়া গেল; বোধ হয় অন্ধকারে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, অথবা তার লক্ষ্য ছিলাম না, তাই রক্ষা; নচেৎ তাহার সামান্য শৃঙ্গাঘাতে এখনি পঞ্চত্ব পাইতে হইত; উঃ নিদারুণ শঙ্কায় রোমে রোমে কম্পিত হইয়া উঠিলাম। তবু সন্দেহ দূর হইল না, কিয়ৎক্ষণ স্থির কর্ণে সেই বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান রহিলাম। এমন সময়ে কিয়দ্দূরে অস্পষ্ট আর একটা বিকৃত শব্দ শুনিতে পাইলাম, উঃ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!! আর একটা বন্য-শূকর জ্বল জ্বল চক্ষে অন্ধকার ভেদ করিতে করিতে আমার প্রতি স্থির লক্ষ্য করিয়া অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে;—কোথায় যাই, কোথায় রক্ষা পাই? হা অদৃষ্ট! উপায় কি?

একবার পলায়নের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে উদ্যম বাতুলতা মাত্র,—আর কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া অতি ত্রাস্তে সেই বটবৃক্ষের উপর অতি উচ্চ ডালে আরোহণ করিলাম।

হা অদৃষ্ট! পৃথিবীর জীব মাত্রেই কি আমার জীবনের বৈরী? উঃ কি ভয়ঙ্কর বিপদেই পতিত হইলাম! সেই বৃক্ষোপরি উঠিতে না উঠিতে ক্ষিপ্ত বন্যশূকরটা মূলদেশে আসিয়া দাঁড়াইল! রোষ-অগ্নিচক্ষে আমার প্রতি স্থির লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল! উঃ কি ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত দৃষ্টি! তাহার অগম্যস্থানে আসিয়াছি বলিয়াই যেন আমাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে এমনি তাহার প্রকট ইচ্ছা! দুরন্ত জন্তু একটা বিকৃত গর্জ্জন করিয়া বৃক্ষমূলের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। একে আমার শরীর অবসন্ন, তাহার উপর এই নিশীথ রাত্রে বন্যশূকরের সহিত যুদ্ধ, ভয়ে সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! যেন দেহ ভার আর বহিতে পারি না, কে যেন আমায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে! কি করি, যে কাপড় খানি আমার পরা ছিল, সেই কাপড়

পাকাইয়া বৃক্ষডালের সহিত আপনাকে আপনি বেশ করিয়া বন্ধন করিলাম,—এক্ষণে আর আমার পতনের সম্ভাবনা রহিল না।

এইরূপে যতই রজনী প্রভাত হইতে লাগিল, শূকরটার ততই আক্রোশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! কিয়ৎক্ষণ গর্জ্জনের পর অবশেষে জানোয়ারটা যেন অবসন্ন হইয়া তথায় শুইয়া পড়িল! ক্রমে কালরাত্রির অবসান, চতুর্দ্দিক্ ফর্সা হইল, বৃক্ষে বৃক্ষে কাক কোকিল প্রভৃতি এক তানে ডাকিয়া উঠিল। আমি যে বৃক্ষের উপর বসিয়া আছি, সেই বৃক্ষের পক্ষিগুলি আমাকে দেখিয়া সবেগে চীৎকার করিতে করিতে উড়িতে আরম্ভ করিল। ঊষার বিমল বাতাসে আহা, আমার সন্তপ্ত দেহ প্রাণ যেন অনেকটা শান্ত হইল!

প্রভাত উদয় দেখিয়া বন্যশূকরটা ঘোরতর গর্জ্জনের সহিত কয়েকবার বৃক্ষমূলদেশ ঘুরিতে লাগিল,—অবশেষে রৌদ্রের সঞ্চার দেখিয়া আমার প্রতি একটা তীব্র দৃষ্টিপাতের পর কি জানি কি ভাবিয়া আমার গন্তব্যদিকে অর্থাৎ সেই পশ্চিম দিকে সবেগে দৌড়িয়া পলাইল।

ওঃ এতক্ষণের পর হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণিপাত করিলাম। এখনো বিশ্বাস নাই, দুর্দ্দান্ত জানোয়ারটা যদি আবার ফিরিয়া আইসে, অথবা আর একটা ভয় সন্দেহ আমার মনের মধ্যে জাগরিত হইল,—শুনিয়াছি বন্যশূকর দল বাঁধিয়া প্রায়ই একত্রে বিচরণ করে, তাহাই যদি হয়? যদি দলে সংবাদ দিতে গিয়া থাকে? ওঃ তাহা হইলে প্রাণ বাঁচাইবার আর কোন উপায় থাকিবে না। যাহা কপালে থাকে ঘটিবে, আর বিলম্ব না করিয়া আপনা আপনি বন্ধন মুক্ত করিয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলাম। অপর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দূরে পাহাড়ের উদ্দেশে সবেগে ছুটিলাম!

ক্রমাগত ছুটিতেছি;—বরাহের ভয়ে প্রাণের দায়ে ক্রমাগত সেই পাহাড়ের অভিমুখে ছুটিতেছি!—এক একবার পশ্চাতে চাই আর দৌড়িতে থাকি;—পরে একটা পাথর লাগিয়া একটা ভয়ানকরূপে হোঁচট খাইলাম;

দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, গুরুতর আঘাতে তখনি ভয়ানক চীৎকার করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম,—তাহার পর আর কি হইল মনে নাই!——

ত্রয়স্ত্রিংশ চক্র।

তুমি জগতের মা!

অতি সুখ নিদ্রা, শান্তিদায়িনী বিরামময়ীর অতীব মনোহারিণী সুষুপ্তি! যেন হাস্যময়ী আনন্দময়ী জননীর কোলে আমি প্রগাঢ় নিদ্রিত! যেন ঘন ঘোর উত্তাল তরঙ্গের পর মহাসমুদ্র স্থির শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে! যেন জগতের মহাপ্রলয়ের পর নবীন জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শোভা পাইতেছে! যেন পাপ-সংসারের পাপদেহ পরিত্যাগের পর পরজগতের নবীন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়াছি,—আমি কোথায়? স্বর্গে না পৃথিবীতে? সজ্ঞান কি জ্ঞান-শূন্য? মোহ না প্রলাপ? ধীরে ধীরে পার্থিব জ্ঞানের সঞ্চার—ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলাম, সত্য সত্যই আমি আনন্দময়ীর কোলে শুইয়া আছি।

গৈরিক বস্ত্রাবৃতা শ্বেত শীর্ণকায়া একটি প্রৌঢ়া তপস্বিনীর কোলে আমি শায়িত। অতি করুণ—অতি স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল, উঠিবার চেষ্টা করিলাম, তিনি বারণ করিলেন।

আহা, কে ইনি দয়াময়ী? কে আমাকে ইঁহার অভয় কোলে শয়ন করাইয়া দিল? আমি কোথায় কোন্ দূরপ্রান্তরে পড়িয়াছিলাম, কেমন করিয়া কোন্ পুণ্যবলে ইঁহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইলাম? আমার চক্ষে জল

আসিল,—কহিলাম, "আপনি কে মা ? দীনহীন পথের ভিখারী এ অভাগা সন্তান কেমন ক'রে আপনার কোলে আশ্রয় পেলে মা ? এত দয়া আমার উপর কেমন ক'রে হ'ল দয়াময়ি ?"

প্রৌঢ়া তপস্বিনী কহিলেন, "কেমন ক'রে কি হ'ল, সে সব কথা এখন শুনে কাজ নাই, সময় ক্রমে সব শুন্‌তে পাবে। এখন একটু শান্ত হও।"

আমি কহিলাম, "মাগো, আমি কেমন ক'রে শান্ত হ'ব মা ? আমার জীবনকাহিনী কিছুই এখনো জানেন না, তাই আমায় শান্ত হ'তে বল্‌ছেন। তোমার অভয় কোলে শুয়ে আমি জীবনে এমন শান্তি কখন পাইনি মা ! আমি বড় শান্ত বড় তৃপ্তি বড়ই আনন্দ তোমার কোলে শুয়ে পাচ্ছি। ও মা বল, এ অধম সংসারতাড়িত দীন হীনকে কে তোমার কোলে তুলে দিলে ? আমাকে এ কথা বল্‌তেই হ'বে। ও মা বল, তোমার পায়ে ধরি বল।"

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলাম। শরীরে বিন্দুমাত্র বল নাই,—মস্তিষ্ক অতিশয় দুর্ব্বল,—কিন্তু তবু মনের বেগে মনের উৎসাহে তখন আমি পূর্ণ বলীয়ান। তাঁহার চরণ ধরিতে গেলাম,—তিনি সরিয়া আসিয়া অতি বাৎসল্যানন্দে গদ্‌গদ ভাবে প্রাণাধিক সন্তানের মত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "চুপ কর বাবা, চুপ কর ; এমন ক'রে দাঁড়িও না, তুমি বড়ই কাহিল,—এখনি মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবে। আজ সাত দিনের পর তোমার এই প্রথম জ্ঞানের সঞ্চার। দিনের মধ্যে এক পোয়া মাত্র দুধ খেয়ে এই সাত দিন বেঁচে আছ ! এমন অস্থির হ'লে এখনি প'ড়ে যাবে,—তা হ'লে আর তোমায় বাঁচাতে পার্‌ব না বাবা !"

একি শুনিলাম ! আমি এক সপ্তাহ অজ্ঞানে কাটাইয়াছি ? এ হেন সুদীর্ঘ কাল অজ্ঞানাবস্থায় আমার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই ? ওঃ ধন্য কঠিন প্রাণ ! ধন্য বিধাতার সুদীর্ঘ পরমায়ু রেখা অঙ্কণ !

সত্য সত্যই আমি আবার দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম, তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। শরীর দুর্ব্বল বটে, মন কিন্তু আমার নিদারুণ কৌতুহলে দেহাপেক্ষা অধিকতর বলবান, নচেৎ বোধ হয় অজ্ঞান

হইয়া পড়িতাম। তাঁহার অনবরত পাখা সঞ্চালনে আমি কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বেশ সুস্থ হইলাম।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না ; কহিলাম, "আমার বেশ মনে আছে, একটা বন্যশূকরের ভয়ে প্রাণের দায়ে দৌড়িতে দৌড়িতে হোঁচট খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেম, কোথায় কোন্ স্থানে জানি না ;—কেমন ক'রে আপনার চক্ষে পড়্লেম কিছুই জানি না। অনুগ্রহ ক'রে বলুন,—আমি বড়ই কৌতূহলী হয়েছি!"

প্রৌঢ়া কহিলেন, "একে একে তোমায় সমস্ত বল্ছি ; তবে শোন বাবা ;—এ জায়গার নাম নীলগঞ্জ,—খুব কাছেই একটা পাহাড় আছে, তাহার নাম নীলপাহাড় ! আমি বড়ই অভাগিনী বড়ই দুঃখিনী বাছা ! সে অনেক কথা, পরে সমস্তই শুন্তে পাবে। আমি এখানে এই কুটীরে প্রায় কুড়ী বৎসর আছি। কেহ সঙ্গী নাই, নির্ব্বান্ধব নির্জ্জন কুটীরে আমি একা থাকি। নিকটেই গ্রাম আছে ; কোন কোন বৃদ্ধা আমার কুটীরে পদার্পণ করেন মাত্র, আমিও কখন কখন তাঁহাদের বাটীতে যাই। আমার পরিচিতা সেই গ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আজ সকালে আমার যাবার আবশ্যক হয়েছিল, ফিরে আস্তে অনেক বেলা হয়, সদর রাস্তায় না গিয়ে বনপথ দিয়েই আমি যাতায়ত করি। খানিক দূর আমি চলে আস্ছি, এমন সময়ে অতি কাতর কণ্ঠের দারুণ চীৎকার শুন্তে পেলেম ! দূর জঙ্গলে বন্য শূকরের বড়ই অত্যাচার ; ভাব্লেম—নিশ্চয় কেউ বন্যশূকরের হাতে পড়েছে, একবার দেখে আসি যদি আমা হ'তে কোনরূপ প্রতিকার হয়। জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আর কোন সাড়া শব্দই পাই না, চারিধার খুঁজে দেখ্লেম, আর কোন শব্দই নাই। তবে কি আমার শোন্বার ভ্রম হ'ল ? এই রকম নানান্ থানা ভাব্তে ভাব্তে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মাঠের মাঝখানে পড়্লেম। হঠাৎ দেখ্লেম, একটি বালক মাঠের মাঝখানে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে। তখনি নিকটে গিয়ে দেখলেম তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছ। বুকে নাকে হাত দিয়ে দেখ্লেম প্রাণ আছে জ্ঞান নাই ; হু হু শব্দে পা দিয়ে রক্ত পড়ছে, বুড়ো আঙ্গুলটি

ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। তখনি কোন বন্যলতার শিকড় বেঁটে রক্ত বন্ধন করে দিলেম। অনেক সেবায় যত্নে কিন্তু জ্ঞানের সঞ্চার কোন মতেই হ'ল না। নিকটে কা'কেও দেখতে পেলেম না, কি করি, আমি একাই তোমাকে কোলে ক'রে অনেক কষ্টে এই কুটীরে আন্‌লেম! কেবল একটু একটু গরম দুধ ছাড়া আর কিছুই তোমাকে খাওয়াতে পারি নি। এই রকমে সেই দিন সেই রাত্রিটি অতি শঙ্কটে কেটে গেল! তার পর দিন প্রাতঃকালে তোমার ভয়ানক জ্বর আরম্ভ হ'ল। আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তোমার সেবায় তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্‌লেম। দিনের দিন জ্বরের গতি ক্রমেই বৃদ্ধি হ'ল—তার পর সম্পূর্ণ বিকার। বিকারের ঘোরে কত প্রলাপ কত আবোল তাবোলই বকেছ;—কায়মনে ভগবানের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা কর্‌লেম; অভাগিনীর কথা ভগবান শুন্‌লেন—তাঁর কৃপায় এই সাত দিনের পর তোমার বিকারের ঘোর কেটে গেছে। বাবা, আমি সংসারত্যাগী তপস্বিনী—সংসারের মায়া অনেক দিন কাটিয়েছি, কিন্তু কেন জানি না, তোমাকে দেখবামাত্রেই মায়ায় আমার শরীর পূর্ণ হ'ল, আমার তপ যাগ কোথায় ভেসে গেল, কে যেন আমায় আবার সংসার যেতে আকর্ষণ কচ্ছে! এই ত বাবা, সব কথাই তোমাকে বল্‌লেম, তোমারও সমস্ত কথা আমাকে শুন্‌তে হ'বে; কিন্তু এখনো দু'দিন থাক্, তুমি আগে বেশ ক'রে সেরে উঠ। আর তোমার কোন ভয় নাই, একেবারে তোমার জ্বর ত্যাগ হয়েছে; কিছু আহারের উদ্যোগ ক'রে দিই,—তুমি যেমন শুয়ে আছ, তেমনি থেকো;—উঠ না—বড়ই দুর্ব্বল আছ।" তিনি গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আমি তপস্বিনীর কুটীরে শয়ান; তপস্বিনীর আবশ্যকোপযোগী যাহা যাহা দ্রব্যের আবশ্যক, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি শায়িত, মস্তকের নিকট একটি তাম্র কমণ্ডলু, অরুণীকাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি দণ্ড, গৃহের এক কোণে দণ্ডায়মান। একটি ক্ষুদ্র বাঁশের আল্‌না, তাহাতে দুই তিন খানি মাত্র গৈরিক বসন স্থাপিত; এইরূপ অতি সামান্য সামান্য যোগিনীর উপযোগী দ্রব্য;—ঘরটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

উঃ ধন্য জগদীশ্বর ! এ দীন হীনের প্রতি তোমার এত করুণা ? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম ! যেখানে যে বিপদে পড়িতেছি, তখনি সে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া পরক্ষণেই শান্তির আনন্দময়ী ক্রোড়ে ফেলিয়া দিতেছ। আহা মনে পড়ে, দশ নম্বর গারদ হইতে পলায়নের পর দেবী-রাণীর সাহায্যে বনলতা বেশে মঙ্গলাবুড়ীর কাছে আশ্রয় পাই ; তার পর জানি না কোন্ ছদ্মবেশী দেবতার অনুগ্রহে কুহকময়ী শক্তিতে অন্ধকারে নৌকারোহণে পলায়ন করি ; অতঃপর আকস্মিক বিপদ, জলমগ্ন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় খালের ধারে পড়িয়া থাকি ; সেইবারেই ত প্রাণ গিয়াছিল, ভগবন্ ! তোমারি কৃপায় দেবনারায়ণবাবুর করুণদৃষ্টিতে স্থান পাই,—সেবারেও প্রাণরক্ষা হইল,—দেবনারায়ণবাবুর আশ্রমে মনের সুখে কালযাপন করিতে থাকি। আহা, একে একে আমার আজ সব কথাই মনে পড়িতেছে ! কোথায় সে দেবনারায়ণবাবু—কোথায় সে নির্ম্মলচন্দ্র—আর কোথায় সে ধ্যানেগড়াছবি মহাদেবী দেবীরাণী ! আর কোথায় আমি !

আর ভাবিতে পারিলাম না, দেবীরাণীর দেবীলাঞ্ছিত মূর্ত্তি স্মরণে আসিবা মাত্র অশ্রুস্রোতঃ উথলিয়া উঠিল, কিছুক্ষণের জন্য যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম !

গৃহ মধ্যে পদ শব্দ শ্রবণে চক্ষু উন্মীলন করিলাম, তপস্বিনী আসিয়াছেন। কহিলেন, "উঠ বাবা, আস্তে আস্তে আমার হাত ধরে একবার বাহিরে এস, হাত মুখ ধুয়ে যা হয় কিছু খাও।"

তাহাই করিলাম, তাঁহার হাত ধরিয়া কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরের দাওয়ায় বসিলাম। আহা কি শান্তিপূর্ণ আনন্দময় নিকেতন ! দাওয়ার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন ; তাহা যৎপরোনাস্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিধারে পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ, যুঁথী, বেলা, সেফালিকা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষে অতি সুন্দর প্রাঙ্গনটি সুসজ্জিত। বৃক্ষে বৃক্ষে প্রস্ফুটিত পুষ্পে সে স্থানটি যে কি স্বর্গীয় সুখের আবাস, আমি এত স্থানে বেড়াইয়াছি কুত্রাপিও এমন মনোহর স্থান নয়নগোচর করি নাই।

আমার মনের ভার শরীরের ভার যেন অনেক কমিয়া গেল,—স্বাধীন

সুরভি বাতাসে সত্য সত্যই আমার মনের ক্লান্তি গ্লানি সমস্তই যেন কোথায় উড়িয়া গেল,—প্রাণারাম আনন্দে আমি মাতিয়া উঠিলাম।

মুখ হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভিজা গামছায় পরিষ্কার করিলাম, বেশ ক্ষুধার সঞ্চার হইল। চারিখানি মাত্র রুটি একটু তরকারি এবং অর্দ্ধসের পরিমাণ অতি বিশুদ্ধ তপ্ত দুগ্ধ পান করিয়া আমি যথেষ্ট সবল হইলাম।

অতঃপর তপস্বিনী দেবী দাওয়ায় একটি ক্ষুদ্র বিছানা করিয়া দিলেন। সে বিছানা কিন্তু ব্যাঘ্র চর্ম্মের নয়; পরিষ্কার তোসকের উপর ধপ্ ধপে চাদর, তাহারি উপযুক্ত বালিশ; আমি বেশ জানি, কুটীরে এ সকল কিছুই নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন—তিনিই জানেন। এত দিনের পর সেই বৃদ্ধ প্রদত্ত কৌটা ও কাগজগুলির তত্ত্ব লইবার অবসর পাইলাম। পাঠক মহাশয়কে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমার অজ্ঞানাবস্থায় সেই কৌটা এবং কাগজগুলি একটি তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি সংসারবিরাগিনী যোগিনী বলিয়াই অপূর্ব্ব রহস্যময় বস্তু ফিরিয়া পাইলাম, অন্য কাহারও হস্তে পড়িলে আমাকে চিরদিনের মত অনুতাপ করিতে হইত, বাহিরে আসিবার সময় তাক হইতে দ্রব্য দুইটি লইয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমতঃ কাগজের বাণ্ডিলটি খুলিলাম,—দেখি, একখানি দানপত্র। একি! এ লেখা কার? এ লেখা আমার নিকট বিশেষ পরিচিত; এই হস্তাক্ষর আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়াই দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম, আহা—হা! এ লেখাগুলি আমার সেই দেবীরাণীর! অতীব আনন্দে অতীব কৌতূহলের সহিত সমস্ত পাঠ করিলাম। ও হো দয়াময়! পতিতপাবন হরি! সত্য? না আবার কোন কুহক জালে আবদ্ধ হইতেছি? হরি হরি! তোমার চক্র তোমার মায়া বুঝে কার সাধ্য! অতি জীর্ণ পুরাতন একখানি কাগজ। হস্তাক্ষর পরিষ্কার বটে; কিন্তু কালির রঙ্ সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে,—অতি কষ্টে অনেক ক্ষণের পর পড়িতে পারিলাম। অতি অসংলগ্ন ভাবে কতকগুলি কথা মাত্র লিখিত আছে। সেই কথাগুলি এইরূপ :—

নীলাচল, কোন গহ্বরের ভিতর রত্নগৃহ বা "গুপ্তধন" মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলার্থে। এ সন্ধান যিনি পাইবেন, এ রত্নগিরি তাঁহারই!

সাল নাই, তারিখ নাই, ইহা ভিন্ন আর কিছুই লিখিত নাই।, কি অভাবনীয় অপূর্ব্ব রহস্য!! সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল! একি, সেই বৃদ্ধ কে? তিনিই কি পত্রোল্লিখিত মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কোন বংশধর? নচেৎ এ অপূর্ব্ব রহস্য তাঁহার কাছে কি প্রকারে আসিল? আর যদি তাহাই হয়, তবে এতদিন কারাগারে বন্দী হইয়াই বা ছিলেন কেন? তবে কি দুরাত্মা দস্যু রায়মহাশয় এই সন্ধান অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, ইহারি নিমিত্ত কি তার এত পীড়াপীড়ি? হায় কি দুর্ভাগ্য! কি শোচনীয় ব্যাপার! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া তিনি আপনাকে মন্দভাগ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই বটে! এঁ্যা! এঁ্যা! একি অঘটন ঘটনা! এই রত্ন সমুদ্র আমাকেই বা দান করিলেন কেন? এই দানপত্র, তিনি মুখে বলিয়াছেন, দেবীরাণী লিখিয়াছেন,—

"আমার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ হইতে এই অগাধ সম্পত্তি "রত্ন গৃহ" নীলাচলের কোন গহ্বরে অতি লুক্কায়িত ভাবে রক্ষিত আছে। আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন রাজবংশীয়েরা ইহার স্থান-সন্ধান অবগত হইতে পারেন নাই।—আমিও সেইরূপ অকৃতকার্য্য হইয়াছি। উপস্থিত আমি নির্ব্বংশ, আমার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি চিরকালের নিমিত্তই ভূগর্ভে লুক্কায়িত রহিয়া গেল;—এই ভয়ে আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক লিখিত এই মহামূল্য দানপত্রখানি তোমাকেই উপযুক্ত বিবেচনায় দান করিলাম। যদি তুমি কখন সন্ধান পাও, তুমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবে। এত লোক থাকিতে যদি কেহ সন্দেহ করেন, তোমাকেই বা ইহার উপযুক্ত অধিকারী করিলাম কেন, তাহার উত্তর শ্রীমতি বীরজাসুন্দরী দেবী ওরফে "দেবীরাণী" সর্ব্বলোক সমক্ষে

যথাযথ যুক্তির দ্বারা প্রচার করিবেন। এ সম্বন্ধে তিনিই আমার প্রধান সাক্ষী রহিলেন ;—কিমধিকমিতি।

বন্দ্যোপাধ্যায়োপাধিক,

শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ.

পুনশ্চ,—

তুমিও যদি জীবনে এতদ্বিষয়ে অপারক হও, তবে তুমিও যাহাকে উ বিবেচনা করিবে, তাঁহাকে দান করিতে পারিবে, এতদর্থে আমি সজ্ঞানে মুক্তকণ্ঠে এই দানপত্র লিখিলাম।—

প্রকৃতই আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোতঃ প্রলয়প্লাবনে আমার হৃদয়ের মধ্যে উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া পড়িলাম, কি এক মহাভাবে আমি যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, জীবনে এরূপ ভাব আর কখন হয় নাই।

অতঃপর স্বর্ণ কৌটা কোন রকমেই খুলিতে পারিলাম না। কৌটার ডালাটি এমনি দৃঢ়তর রূপে অঁাটিয়া গিয়াছে, বিশেষ কোন যন্ত্র সাহায্য ব্যতিত বোধ হয় খুলিবার সম্ভাবনা নাই। উপস্থিত এ চেষ্টায় বিরত হইয়া কাগজগুলি এবং কৌটাটি লুক্কায়িত রাখিলাম।

তপস্বিনী (এখন হইতে ইঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলাম) স্নান আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। এক থানি তাম্রপাত্রে নানাবিধ ফল মূল আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন।

মাগো! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রাণ! ধন্য বাৎসল্য মমতা! ওগো, তুমি শুধু আমার মা নও, তুমি জগতের মা!—

চতুস্ত্রিংশ চক্র

অনুসন্ধান।

এইরূপ মহা সুখশান্তিতে আমার এক পক্ষ কাটিয়া গেল, এই এক পক্ষ মধ্যে আমার শরীর সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গেল, আমি পূর্ব্বের মত সবল হইলাম। তপস্বিনীর দৈনন্দিন কার্য্য যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত ইনি আমার আহারাদির জন্য ব্যস্ত থাকেন; তার পর পূজা অর্চ্চনা সারিয়া দেবীর আহার করিতে বেলা পাঁচটা বাজে। ইতিমধ্যেও আবার দয়াময়ী মা আমার বেলা তিনটার মধ্যে ফল মূলাদি লইয়া আর একবার সংবাদ লন। গত কল্য সন্ধ্যা হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমার আদ্যন্ত জীবনকাহিনী একাসনে বসিয়া তপস্বিনী মা সমস্তই শুনিয়াছেন, শুনিতে শুনিতে তিনি কতবার শিহরিয়াছেন, কতবার ক্রন্দন, কখন স্তম্ভিত, কখন দীর্ঘনিশ্বাস, কখন অপূর্ব্ব ভাবে চমকিত হইয়াছেন! চক্ষের জলের সহিত আমার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত রহস্য শুনিয়াছেন। সবই বলিলাম বটে, কেবল গতপূর্ব্ব সেই বৃদ্ধ সঙ্গীর কোন কথাই তাঁহাকে বলিলাম না; সুতরাং স্বর্ণকৌটা এবং কাগজের রহস্য তাঁহার অজ্ঞাত রহিল! কিন্তু তাঁহার কোন কথাই আমার এখনও শোনা হয় নাই!—তিনি কে কি বৃত্তান্ত কেনই বা এমন জনশূন্য প্রান্তরে বিশ বৎসর একাহারে একাকিনী বাস করিতেছেন, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেবীর কার্য্যকলাপে বেশ বোধ হইতেছে যে, কোন একটা দুর্ব্বিসহ চিন্তায় তিনি নিতান্ত পীড়িত, এককালে বোধ হয় ধনাঢ্য-গৃহিণী ছিলেন,—বলিব বলিব করিয়া আজিও বলেন নাই।

তপস্বিনীর তিন খানি কুটীর। যে গৃহে আমি শয়ন করি, এইটিই ইঁহার প্রশস্ত গৃহ; একটি রন্ধন শালা, আর একটি পূজা গৃহ। এ গৃহটি সর্ব্বদাই আবদ্ধ থাকে। এক পক্ষের মধ্যে একবারও খোলা দেখি নাই। দরজা বন্ধ করিয়া পূজা করেন, ভ্রম ক্রমেও উন্মুক্ত রাখেন না। আমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এখন বেলা আন্দাজ তিনটা, এইমাত্র দেবী আমায় ফলমূল খাওয়াইয়া পূজা গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। আর একবার কৌটাটি খুলিবার প্রয়াস পাইলাম। উঠানের এক পার্শ্বে কর্দ্দমাক্ত এক খানা ভাঙ্গা কাটারী পতিত রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহারি সাহায্যে অনেক ক্ষণের পর অতি কষ্টে ডালার-কৌটাটি খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার ভিতর দুইটি মাত্র দ্রব্য; একটি অতি মনোহর মহামূল্য হীরকাঙ্গুরী, আর একটি বড় স্বর্ণের চাবি। ইহার অর্থ কি? এমন কি রহস্য ইহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে? কিছুই বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক তখনকার মত সে চিন্তায় বিরত হইয়া একবার পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইল। পত্রে লিখিত আছে, "নীলাচল", আর এই পর্ব্বতের নামও শুনিতেছি নীলপাহাড়। তবে কি এই পর্ব্বতের কোন গহ্বরে রত্নরাশী লুক্কায়িত আছে? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ঘোরতর সন্দেহে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। তপস্বিনী মাকে এ সব কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া দ্রুতপদে পাহাড় অভিমুখে চলিলাম; অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে মূলদেশে উপস্থিত হইলাম। আঁকা বাঁকা সরু মোটা একটা রাস্তা পাহাড়ের উপর উঠিয়াছে,—অতি কষ্টে অতি সাবধানে সেই পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

আহা, কি মনোহর বৈকালিক প্রকৃতির শোভা! অস্তোন্মুখ সূর্য্য পশ্চিমাচলে ধীরে ধীরে শায়িত হইতেছেন, রক্তিমরবির রক্তিমসমুদ্রে ধীরে ধীরে অবগাহন! জনশূন্য পর্ব্বতে আমি একাকী পরিভ্রমণ করিতেছি,—গ্রীষ্মের দারুণ অত্যাচারে পার্ব্বতীয় বৃক্ষগুলি অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে মলয়ার মহাপ্রাণ চামরের ব্যজন পাইয়া দিক্‌দিগন্তভেদী বৃক্ষরাজী সঘনে নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিতেছে, আমারও উত্তপ্ত মন প্রাণের

উপর শান্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। আহা, ঐ দূরে একটা মহাগম্ভীর জলপ্রপাত! রৌপ্য-স্রোতের মত পর্ব্বতহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মহাশব্দে উথলিয়া পড়িতেছে! বস্তুতঃ এ দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়!

এই ত নীলাচল, ইহারি কোন গহ্বরে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের অগাধ সম্পত্তি নিহিত আছে? কিন্তু কোন্ দিকে? কে বলিতে পারে কোন্ দিকে! যদি দিঙ্‌নির্ণয় স্থাননির্ণয় প্রকৃত রূপে নির্দ্ধারিত থাকিত, তবে কি এ সম্পত্তি গুপ্তভাবে এত কাল থাকিতে পারিত? হায় হায় কি মোহাচ্ছন্ন কি জ্ঞানশূন্য আমি! সাতপুরুষ ধরিয়া এ রত্নগৃহ বিশেষ রূপে অন্বেষিত হইতেছে, কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, আর আমা হইতে আমার মত একটা বালক কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাই বলিতেছি,—কি মোহাচ্ছন্ন—কি পাগল—কি জ্ঞানশূন্য আমি!

কিন্তু তাই বলিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আশা,—আশাতেই ত পৃথিবীতে চলিতেছে, আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে!

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যতদূর পারিলাম, তন্ন তন্ন করিয়া পার্ব্বত্য স্থানগুলি অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ক্রমেই অন্ধকার সমাগত দেখিয়া কষ্টে পথ চিনিতে চিনিতে তপস্বিনী মাতার কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। তপস্বিনী মা আমার জন্য উৎসুক চিত্তে বসিয়াছিলেন, আমাকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা?" আমা কর্ত্তৃক সদুত্তর পাইয়া সান্ধ্য-ক্রিয়ার নিমিত্ত তিনি গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন, সেই দাওয়ার বিছানায় বসিয়া আমিও অনন্তচিন্তায় চিন্তিত রহিলাম।

পঞ্চত্রিংশ চক্র।

ঘোরতর বিপদ !

এইরূপে কি প্রভাতে—কি মধ্যাহ্নে—কি অপরাহ্নে যখনই সময় পাইতাম, পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে গুহায় গুহায় অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। তপস্বিনী মা যেন দেখিয়াও দেখেন না—জানিয়াও জানেন না, জানিতে পারিলাম, তিনি নীরবে সমস্তই দেখিতেছেন, আমার গতিবিধি তাঁহার অজানিত নাই, আমি কি করি, কোথায় যাই, তিনি কেমন করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারেন। পাহাড় হইতে যখনি ফিরিয়া আসি, অমনি তিনি বলেন, "আজ পাহাড়ের অমুক দিকে গিয়াছিলে ?" আমি আশ্চর্য্য হইতাম।

কিন্তু তপস্বিনী দেবীর আজি কালি একটু ভাবান্তর দেখিতেছি ; আমি যে দিন হইতে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিতেছি, সেই দিন হইতে তিনি যেন একটু চিন্তাযুক্ত সন্দিগ্ধ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আর ইহাই বা কি আশ্চর্য্য কথা ? ইনি পূজা গৃহে অবরুদ্ধ না থাকিলে আমি কখনই কুটীর হইতে বহির্গত হই না, তবে ইনি কিরূপে জানিতে পারেন, "আজ আমি পাহাড়ের অমুক দিকে গিয়াছিলাম ?"

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, তিনি কেমন যেন কৌতূহলবিস্ময়-চক্ষে একবার অন্তরাল হইতে দেখেন। আমি কিন্তু জানিয়াও জানি না—বুঝিয়াও বুঝি না।

তপস্বিনীর জীবন কাহিনী এখনো পর্য্যন্ত কিছুই শুনি নাই, কৌতূহল থাকিলেও কিন্তু সময় পাইতেছি না, আমি এতাধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, দেবীর নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিবারও সময় পাইতেছি না। কিন্তু দিন দিন

তিনি কেমন বিবর্ণ ও মলিন হইতেছেন ; আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যে তাঁহার একটা কি গভীর জিজ্ঞাস্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিতেছে।

যাহা হউক, এইরূপ সন্দেহে—কৌতূহলে এবং মাতার আদরে আমার এক মাস কাটিয়া গেল, ইহার মধ্যে কিছুই সন্ধান পাইলাম না ; অথচ অনুসন্ধানের কোনই ত্রুটি হইতেছে না।

এখন দ্বিপ্রহর, আহারাদি করিয়া সেই দাওয়ার বিছানায় শুইয়া আছি, দেবীও পূজাগৃহে পূজা করিতেছেন, নানান্ খানা ভাবিতে ভাবিতে আমি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম।

এ আবার কি আবার ? দূরঘণ্টানিনাদবৎ অতি মনোহর গীতধ্বনি যেন আমার অন্তরে অন্তরে বাজিয়া উঠিল। গীতের প্রতি তাল প্রতি মূর্চ্ছনা প্রতেক বাক্য যেন স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতেছি ! প্রিয় পাঠক ! কি মনোহর সঙ্গীত, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

গীত।*

দু'দিন দেখি নি' ব'লে কি হে !
এত বাদ এত অভিমান ?
দু'টো কথা শুধু শুনাতে পারি নি'
তাই কি ভাবনা এত ভাণ ?
যত কথা সব তোলা আছে,
একটিও তার ভুলি নি',
কাছে আছি তবু চোখ'চোখী নাই,
এ কথা কি আগে বলি নি' ?
যেখানেই কেন থাকনা, তুমি—
যতই ভাবনা কেন,
তোমাতেই আছি—তোমাতেই র'ব
তোমাতেই মন প্রাণ।

* দেশমল্লার—একতালা।

সেইরূপ স্বপ্নসঞ্চরণ—ভাবসমাধির সেইরূপ বিকার! মনে পড়ে দেব-নারায়ণবাবুর বাটীতে এইরূপ একটা স্বপ্নের খেলা দেখিয়াছিলাম। আজিকার মত ঘুমন্তকর্ণে সেই রূপ জীবন্ততান সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, চক্ষুরুন্মীলন করিলাম। আর কোন শব্দ নাই, চতুর্দ্দিক নিরব নির্জ্জন! বাহিরের দাওয়ার আসিলাম, মা মা বলিয়া দুই তিনবার ডাকিলাম, তপস্বিনীদেবীর কোন সাড়া পাইলাম না। পূজাগৃহ বন্ধ; কিন্তু বহির্দ্দিকে বন্ধ নয়, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। ভাবিলাম, বুঝি পূজা করিতেছেন। দরজায় কোনরূপ ছিদ্র বা ফাটাল নাই, যাহাতে ভিতর দিকে কোন রূপ দৃষ্টি চলিতে পারে। অনেকক্ষণ তথায় কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কোন শব্দ পাইলাম না; তবে বুঝি তন্ময়চিত্তে মহাধ্যানে নিমগ্ন আছেন? শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলাম; কি করি! একবার তবে পাহাড়ের দিকে যাই;—পর্ব্বতভ্রমণ কেমন একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কোন কাজ কর্ম্ম না থাকিলে, কেবলি তথায় যাইতে ইচ্ছা করে!

তাহাই করিলাম, স্বর্ণকৌটা গোপনে লইয়া পর্ব্বত অভিমুখে বহির্গত হই-লাম। প্রায় তিনমাস হইল, এইস্থানে আসিয়াছি; এই তিন মাসের মধ্যে যত-দূর সম্ভব প্রায় সমুদয় স্থানই অন্বেষণ করিয়াছি; এক এক দিক তিন চারি-বার করিয়া পরিভ্রমণ করি। বাকী কেবল দক্ষিণদিকের একটা ভয়াবহ শৃঙ্গ! তথায় মনুষ্যের গমনাগমন বড়ই কষ্টকর! সেই স্থানে পঁহুছিবার জন্য আজি কালি বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি, অগত্যা এখন দক্ষিণশৃঙ্গের পথ ধরিলাম।

এ দিকে রাস্তা নাই, অনেক অন্বেষণ করিলাম, পর্ব্বত আরোহণের কোন পথই পাইলাম না; কিন্তু যেমন করিয়া পারি তথায় উঠিতেই হইবে। প্রাণে মনে বল বাঁধিলাম, ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক গাছের মূল পাথরের অগ্রভাগ ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে অতি কষ্টে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। একাগ্রতায়—মনের উৎসাহে জ্ঞান বিবেচনা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি হাত ফস্‌কাইয়া যায়, কোথায় পড়িয়া যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব, তাহার স্থির নাই।

যাহা হউক, অতি কষ্টে ক্ষত বিক্ষত দেহে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া সেই ঘনজঙ্গলাচ্ছন্ন ভয়ানকশৃঙ্গের উপর উঠিলাম!

উঃ কি ভয়ানক স্থান! জনমানব শূন্য নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা গভীর শান্তি যেন অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে। অত্যুচ্চ শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি যেন শৃঙ্গে শৃঙ্গে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাণে ভয়ঙ্কর ত্রাস জন্মিল! ঐ দূর পশ্চিমতপনের রক্তিমাভা দূর শৈলশৃঙ্গের নিম্নে ক্রমেই শয়িত হইতেছে,—যেন গভীর অন্ধকার করালমুখ বিস্তার করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দিঙ্মণ্ডল গ্রাস করিতেছে! পথ নাই—অতি দুর্গম পর্ব্বতময় স্থান—হা! কি করিলাম! কোথায় আসিলাম! কেন আমার এ দুর্ম্মতি হইল? এ স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কি ফল হইবে? কি করি, কিয়ৎক্ষণের জন্য কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বড়ই উদ্‌ভ্রান্তপ্রাণে চিন্তিত হইলাম। ক্রমেই অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল; কদাচিৎ বন্যপশুর দূর অস্ফুটশব্দ গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! বাতাসের শন্ শন্ শব্দের সহিত মাঝে মাঝে যেন পর্ব্বতগুহায় কি একটা হুঙ্কার উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতি অন্ধকারের সহিত অন্তরপ্রকৃতি ভয়ানকরূপে সমাচ্ছন্ন হইল! কি করি! কোথায় যাই! পথ নাই, অতি দুর্গম দুরারোহ এহেন পর্ব্বতশৃঙ্গে কেন আসিলাম?—হায়, কেন উঠিলাম? অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত দূরের আর কোন বস্তুই নয়নগোচর হয় না, আপনাকে আপনি এখন আর দেখিতেও পাই না। আসে—পাশে উর্দ্ধে অধে দশদিকেই অন্ধকার! উঃ কি ভয়ঙ্কর বিপদেই পতিত হইলাম! অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি, প্রত্যাগমনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

একটা পাথরের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলাম। আকাশের দিকে চাহিলাম, উঃ কি সর্ব্বনাশ! ভয়ঙ্কর কালমেঘে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক থম্ থম্ করিতেছে, এখনি ঝড় উঠিবে, এখনি মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইবে,—উঃ কোথায় যাইব—কোথায় গিয়া প্রাণ বাঁচাইব?

দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল, শীতোষ্ণমিশ্রিত দুষ্টবাতাস দশদিকে কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইল! পার্ব্বত্যধূলিকঙ্কর অবিরাম বর্ষণ হইতে

লাগিল। আর চক্ষু চাহিতে পারি না, আর আত্মরক্ষা করিতে পারি না—এই-বারেই গেলাম, আজি মৃত্যু নিশ্চিত! ঝড়ের প্রচণ্ডবেগে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ-শাখা ভগ্ন হইয়া ঠিক আমার সম্মুখে প্রায় দশহস্ত দূরে ভয়ঙ্কর শব্দে পতিত হইল! ততোধিক ভয়ঙ্কর শব্দে তথাকার কয়েকখানা পাথর খসিয়া গড়াইতে গড়াইতে কোথায় অন্ধকারে পড়িয়া গেল! ঝড়ের বেগ কিঞ্চিৎ-মন্দীভূত হইতে না হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মুহুর্মুহু বিদ্যুস্ফুরণ—ঘন ঘন বজ্রাঘাত!—তাহার উপর অবিরাম বৃষ্টিপাত! কোথায় যাই—কোথায় রক্ষা পাই? ঘোরতর অন্ধকার! লক্ষ্য নাই—দৃষ্টি নাই! বৃষ্টির জলে পার্ব্বত্যভূমি পিচ্ছিল, কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে যাইব, তাহারও সাহস নাই, এমন সময়ে অতি ভয়ঙ্কর শব্দে দশদিক বিদীর্ণ করিয়া বজ্রাঘাত হইল! আমার মস্তকে নয়, অতি নিকটে—কোথায় জানি না! আমি সেই নিদারুণ ভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম!

ষট্‌ত্রিংশ চক্র।

রহস্য-ভেদ!

সেই সেই অলৌকিক দেবতাকণ্ঠনিঃসৃত অতি মধুর গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে আমার মোহভঙ্গ হইল। স্বপ্ন কি মোহের ঘোর এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলাম। আহা হা! সত্যসত্যই দেবনিকেতন! মণিমাণিক্যেখচিত কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় গৃহ! দশদিক

আলোকিত, নীলাভসূক্ষ্মরশ্মিজালে আ মরি মরি, কি অদৃষ্টপূর্ব্বশোভাই ধারণ করিয়াছে! অতি মনোরম সুকোমল উপাদানে আমার মস্তক শয়িত, যেন কাহার কোলে আমি শুইয়া আছি! এখনও ভ্রম! একি স্বপ্ন—না মোহের বিকার? পুনঃ পুনঃ চক্ষুমর্দ্দনের পর এবার স্থিরচৈতন্যে, পূর্ণজ্ঞানে, শিরোদেশে দৃষ্টিপাত করিলাম। আহা হা! কি দেখিলাম! একি!—সেই তুমি? তুমিই কি সেই সংসারসাগরের ধ্রুবতারা, প্রাণারাম-নন্দনের প্রাণপ্রিয়া পারিজাত, আমানিশার পূর্ণচন্দ্র? ওহো—তুমিই কি সেই সংসারসারসর্ব্বস্বা মহাপূজ্যা মহাদেবী? অতুল উল্লাসে মহান্ আনন্দে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলাম। মহাভাবে গদগদ হইয়া তাঁহার চরণ দু'টি বক্ষে ধারণ করিতে গেলাম, তিনি মৃদু হাসিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। আমি বিস্ময়াবেশে—নিদারুণ কৌতূহলের সহিত কহিলাম,—"কোথায় আমি দেবী-রাণি? এমন অপূর্ব্ব মণিমাণিক্যখচিত দেবনিকেতনে,—কোন্ পুণ্যবলে এসেছি দয়াময়ি? আমার বেশ মনে পড়ে, একটা ভয়ানক শৃঙ্গে—ভয়ানক প্রকৃতিবিপ্লবের মধ্যে অজ্ঞান পতিত ছিলাম, কোন্ পুণ্যবলে তোমার সালোক্য প্রাপ্ত হ'লেম? আমায় বল, আমাকে আর অন্ধকারে রেখ'না, আমি আর কৌতূহলের বিষম ভার বইতে পারি না।" দেবীরাণী কহিলেন,—"চুপ কর, স্থির হও, এইখানে স্থির হ'য়ে বসি এস, তোমাকে আর অন্ধকারে থাকৃতে হ'বে না, তোমার সমস্ত রহস্য আজ প্রকাশ পাবে।"

সেই অতি সুন্দর রাজকক্ষতুল্য বিচিত্র মার্ব্বেল প্রস্তরাচ্ছাদিত হর্ম্ম্যতলে অতি পুলকিত মনে উপবিষ্ট হইলাম। দেবীরাণী হাস্যমূর্ত্তি পুলকবিস্ফারিত-নেত্রে কহিলেন,—"এতদিনের পর তোমার সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত বিপদ ঘুচে গেল! একে একে সব কথাই শোন;—আচ্ছা, বেশ ক'রে মনে ভেবে বল দেখি, যখন তুমি পাহাড়ের উপর ঝড়বৃষ্টির ধমকে আর বজ্রপাত-ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়, তখন তোমার কাছে কি কি ছিল, আগে তার সন্ধান কর দেখি?"

আকস্মিক ভয়নৈরাশ্যে আমি যেন অতল-জলে তলাইয়া যাইলাম! এত-ক্ষণে আমার চমক ভাঙ্গিল,—সত্যই ত, স্বর্ণকৌটাটি কোথায় গেল? ফ্যাল্

ক্ষাল্ দৃষ্টে দেবীরাণীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম, কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। দেবীরাণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"এই দেখ, সেই সোণার কৌটা! আর বাগাড়ম্বরে দরকার নাই, শোন তবে;— তুমি কি কখন তোমার তপস্বিনী মা'র পূজাগৃহ স্বচক্ষে দেখেছ?"

আমি কহিলাম, "ওই ত আশ্চর্য্য কথা! তপস্বিনী মা কখনও দেখান্ নাই, আমিও দেখ্বার সুবিধা পাই নাই,—সে ঘর দিন রাত বন্ধ থাকে। দেবী-রাণি! এ গভীর রহস্যের মর্ম্ম আমায় সোজা কথায় শীগ্‌গির্ শীগগির্ বল। আমি সেই ভয়ানক শৃঙ্গে ঘোর ঝঞ্ঝাবাত মধ্যে অজ্ঞান অভিভূত ছিলাম, তোমার চক্ষে কেমন ক'রে পতিত হ'লেম দেবীরাণি? সেই ভয়ঙ্কর অভ্রভেদী দুরারোহ-শৃঙ্গে সেই খণ্ডপ্রলয় ভেদ ক'রে কেমন ক'রে তুমি উপস্থিত হ'য়েছিলে?"

দেবীরাণী সাহাস্য বদনে কহিলেন, "শোন, সব স্থির হ'য়ে শোন,—তোমার তপস্বিনী মায়ের পূজাগৃহের তলদেশ থেকে একটা গভীর সুড়ঙ্গ এই পর্ব্বত ভেদ ক'রে বরাবর এসেছে। তুমি যার জন্য এই পর্ব্বতে নিতান্ত উৎসুক মনে অন্বেষণ কত্তে আস, তিনিও সেই কারণে সুড়ঙ্গ ভেদ ক'রে এই পর্ব্বতের মধ্যে আসেন—"

তৎক্ষণাৎ আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "এই জন্যই কি তিনি পাহাড়ের সব কথা বল্‌তে পাত্তেন? আমি কখন্ কোন্ সময় পাহাড়ের কোন্ দিকে যেতেম, তিনি কি তাই সমস্ত দেখে আমায় আশ্চর্য্য কত্তেন? তাই তিনি সব জান্‌তে পাত্তেন? আমি যার জন্যে পাহাড়ে আস্‌তেম্—তিনিও সেই জন্যে পাহাড়ে আস্‌তেন?—একি আশ্চর্য্য কথা! একি অদ্ভুত রহস্য! তিনি তবে কে? দয়াময়ী দেবি! তিনি কে? শীঘ্র বল—নচেৎ উন্মত্ত হ'ব।"

দেবী। "তিনি কে শুন্‌বে তবে? ব্রজেন্দ্রবাবু! বুক বাঁধ,—কাণ খাড়া ক'রে শোন, তিনি তোমারি মা—তোমারি গর্ভধারিণী জননী!"

আমি। "এ্যাঁ এ্যাঁ! তিনি আমার মা? তিনি আমার গর্ভধারিণী? কোথায় তিনি—কোথায় তিনি? কোথায় আমার সেই আনন্দময়ী মা? দেবীরাণি! সত্য সত্যই তবে এতদিন পরে আমি মা পেলেম?"

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না, আনন্দ গদগদভাবে আমার বাক্য রোধ হইয়া গেল ! দেবীরাণী কহিলেন, "এখন বুঝ্‌তে পাল্লে ? তোমার পর্ব্বতভ্রমণের কথা কেমন ক'রে তোমার মা বুঝ্‌তে পাল্লেন ? তার পর শোন :—কাল বেলা দ্বিপ্রহরে যখন তুমি তপস্বিনীদেবীর দাওয়ায় নিদ্রিত ছিলে, সেই সময় আমি এবং তোমার মা পূজাগৃহে ব'সে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা কচ্ছিলেম ; যখন শুন্‌লেম, একটা স্বর্ণকৌটা রাত্র দিন তোমার নিকট গোপনে থাকে,তখন আর আমার বিস্ময়-কৌতূহলের সীমা পরিসীমা রইল না ; তোমার মাথার শিয়রে কৌটাটি আছে শুনে, তখনই অতি সন্তর্পণে বালিশের নীচে থেকে বার ক'ল্লেম । কৌটাটি খুলে যা দেখ্‌লেম, তা'তে আর আমার কোন সন্দেহ রইল না। তোমার কাণের কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে একটি গান গেয়ে, সেখান থেকে স'রে প'ড়্‌লেম। যখন আমি গান গাই, তখন তোমার মা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পাহাড়ে চ'লে গেছেন। তার পর আমি আড়াল থেকে দেখ্‌লেম, তুমিও ঘুমে থেকে উঠে বরাবর পাহাড়ের উপর চ'লে গেলে ; অগত্যা আমিও সুড়ঙ্গপথে তোমার মাতার সহিত মিলিত হ'লেম ; কিন্তু এবার তোমাকে আমরা দেখ্‌তে পেলেম না, তুমি পাহাড়ের কোন্ দিকে উঠেছ, তার কোনই সন্ধান কত্তে পাল্লেম না। এমন সময় ভয়ানক ঝড় উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বৃষ্টি তেমনি বজ্রাঘাতের ধূম ! তোমার জন্যে আমরা বড়ই চিন্তিত হ'লেম। তখন একটা উচ্চশৃঙ্গে উঠে চারিদিক দেখ্‌তে লাগলেম ; এমন সময়ে দক্ষিণদিকের অতি ভয়ানক পার্ব্বত্যজঙ্গলের ভিতর থেকে একটা আর্ত্তনাদ শুনতে পেলেম ! আমরা স্থির ক'রে বিশেষ মনো-যোগের সহিত শুন্‌লেম। এই যে রত্নগৃহ দেখ্‌ছ, কোন একটা গহ্বরের পার্শ্ব থেকে পাহাড় কেটে এই অতি চমৎকার গৃহ নির্ম্মিত হ'য়েছে ! ঝড় বৃষ্টি কমে গেলে, এই গৃহের ছাদের উপর উঠে চারিদিক দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দক্ষিণদিকে চেয়ে দেখি, উন্নত দক্ষিণশৃঙ্গটা বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে, বড় বড় পাথর কোথায় খ'সে পড়ে গেছে। সেই ভয়াবহ শৃঙ্গের পথ দয়াময় পরমেশ্বর প্রশস্ত ক'রে দিলেন। অতি সাবধানে সাবধানে সেই দিকে খানি-

কটা অগ্রসর হ'য়ে দেখি, কে যেন মৃতপ্রায় পড়ে র'য়েছে। তখন তোমার উপর একটা ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হ'ল! কাছে গিয়ে যা দেখ্লেম, আমার বুক ভেঙ্গে গেল---প্রাণ হু হু কত্তে লাগ্ল—চারিদিক অন্ধকার দেখে তোমার মাথার শিয়রে বসে পড়্লেম! কিয়ৎক্ষণের জন্য আমারও জ্ঞান চৈতন্য হ'রে গেল! তারপর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা ডাকৃতে ডাকৃতে অতি কষ্টে সেইদিকে আস্ছেন! তাঁর বুঝ্তে আর কিছুই বাকী রইল না। তৎক্ষণাৎ তোমাকে ধরাধরি ক'রে এই গৃহের মধ্যে নিয়ে এলেম। অনেক-ক্ষণ আগুনের তাপ দিতে দিতে গরমদুগ্ধ পান ক'রে অনেক যত্নে সমস্ত রাত্রের পর প্রভাতের স্নিগ্ধবাতাস পেয়ে তোমার জ্ঞান হ'ল! ইতিমধ্যে তোমার সোণার কৌটা থেকে চাবি নিয়ে তোমার মা কোষাগারে চ'লে গেলেন। যার জন্য তোমার এত যন্ত্রণা, তোমার মাতা তপস্বিনীবেশে কুড়ি বৎসর অতি কষ্টে কালযাপন কচ্ছেন, সেই হারানিধি অতুল ঐশ্বর্য্য তোমা-হ'তেই আজ প্রাপ্ত হ'লেন। তোমারও সমস্ত রহস্য এতদিন পরে প্রকাশ হ'ল! পথের কাঙ্গাল নানাস্থানী ব'লে আর তোমায় দুঃখ কত্তে হ'বে না! এখন হ'তে তোমার একটি ইঙ্গিতে রায়মহাশয়ের ঐ প্রকাণ্ড দেহখানা কেঁপে কেঁপে মাটীতে পড়ে যাবে, তার হাজার পাপ অনুচর তোমার একটি মুখের কথায় অতি নিকৃষ্ট কিঙ্করের মত আজ্ঞাধীন হ'য়ে তোমার পায়ে ধর্বে। পথের ধূলি হ'য়ে লোকের পায়ের তলে আর লুটিয়ে থাকৃতে হ'বে না, এখন হ'তে জগতের শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ ক'ল্লে। আজ আর তুমি দীনদরিদ্র ব্রজেন্দ্রভূষণ নও;—মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের অধস্তন-সপ্তমবংশধর মহারাজাধীরাজ শ্রীশ্রীনারায়ণের একমাত্র হারা'ন অমূল্যধন তুমি

শ্রীশ্রীমান ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূপ বাহাদুর!

এই তোমার অত্যদ্ভুত রহস্য-ভেদ!

সপ্তত্রিংশ চক্র।

অদ্ভুত আত্মকথা!

সেই সেই অতি বিচিত্র হীরকমণিমণ্ডিত অপূর্ব্ব রত্নগৃহ তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শনের পর মহান্ আনন্দিত মনে দেবীরাণীর সহিত আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। দেবীরাণী যতই অত্যদ্ভুত রহস্য প্রকাশ করিতেছেন, আমি ততই কৌতূহল-বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইতেছি, অতি প্রগাঢ়ভাবে প্রকৃতই আপনহারা হইতেছি। দেবীরাণী অগ্রে, আমি পশ্চাতে—ধীরে ধীরে নানান্ খানা ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছি। হটাৎ একটি লোক আসিয়া দেবীরাণীকে অতি সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

দেবীরাণী কহিলেন,—"কেও বিজয়? কি খবর?" বিজয় ত্রস্তে কহিলেন, "খবর সবই ভাল, লোক জনে আশ্রম পরিপূর্ণ! তপস্বিনীদেবী আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছেন।"

আমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুতগতিতে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশদ্বারের নিকটেই আমার মা দণ্ডায়মান ছিলেন, আমাকে দেখিয়া ছুটে আসিয়া একেবারে আমায় কোলে তুলিলেন, প্রগাঢ় বাৎসল্যরসে আদৃত হইয়া বার বার মুখচুম্বনের পর কহিলেন, "বাপ্‌রে! তুই আমার সেই বুকজুড়ান হারা'ন ধন? সত্য সত্যই তুই আমার সেই শিশু? বাপ্‌ধন! আজ কুড়িবৎসর তো বিহনে কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি। এস বাবা এস,—এস চাঁদ এস,—ঘরের ভিতর কে কে আছে সব দেখ্‌বে এস, এই দুঃখিনী তপস্বিনীর আশ্রমে তোমার রাজসংসার পেতেছি। চল বাবা দেখ্‌বে চল।" তাঁহার চক্ষু হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল,

আমিও আর কথা কহিতে পারিলাম না। তাঁহার কোল হইতে নামিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, নাই—আর দেবী-রাণী নাই, বিজয় নামক সেই ব্যক্তিও নাই, নিমেষ মধ্যে তাঁহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। যেমন প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অমনি দেখিতে পাইলাম, কি সর্ব্বনাশ! সেই আমার কারাগারের সঙ্গী—সেই বৃদ্ধরোগী দাওয়ার উপর উপবিষ্ট আছেন! একি ইন্দ্রজাল কাণ্ড! স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তিনি ত কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সৎকার করিতে পারি নাই বলিয়া, আমি কতই ভাবিত হইয়াছিলাম। কি আশ্চর্য্য! সেই তিনি? আমি রোমে রোমে কম্পিত হইয়া উঠিলাম। তপস্বিনীদেবী ইত্যবসরে আশ্রমের কোন্ ঘরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, দেখিতে পাই নাই। সেই বৃদ্ধ সঙ্গী আমাকে 'হাতছানি' দিয়া আহ্বান করিলেন, আমি ভয়ে ভয়ে তন্নিকটস্থ হইলাম। অতীব করুণ-প্রীতিবৎসল্যে আমার হাত দুইখানি ধরিয়া কহিলেন, "আমাকে চিন্‌তে পেরেছ কি? আমি তোমার সেই বৃদ্ধ সঙ্গী, আমাকে দেখে তুমি অবাক্ হ'য়ে গিয়েছ, ভয় পেয়েছ, না?" আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম, কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। বৃদ্ধ কহিলেন, "সত্য সত্যই এ ভয় পাবার কথাই বটে; চক্ষের সম্মুখে দেখ্‌লেম, যে লোক চির-কালের জন্য চোখ বুঝ্‌লে, কিছুদিন পরে আবার তাকে জীবন্ত দেখ্‌লে প্রকৃতই আশ্চর্য্য হ'তে হয়—ভয়ও হয়; কিন্তু বৎস, আমি তখন মরি নাই, একরূপ তীব্র বিষে মৃতবৎ হয়েছিলেম, ঐরূপ মৃতবৎ হয়েছিলেম ব'লেই দুরাত্মাদের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি, তা নাহ'লে আর কিছু দিন থাকলে, সত্য সত্যই দগ্ধে দগ্ধে আমার প্রাণান্ত হ'ত। এখন সব বুঝতে পাল্লে ত?"

এঁ্যা—বিষ? আবার বিষ? তবে কি এও দেবীরাণীর কাণ্ড? আমার আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল, যথার্থই আমি চিত্রার্পিতের মত তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম!

বৃদ্ধ কহিলেন, "এ সব কার কৌশল বুঝ্‌তে পেরেছ? সমস্তই দয়াময়ী দেবীরাণীর! তার পর্ সব শোন;—আমার নাম বোধ হয় সেই দানপত্রেই পেয়েছ, কিন্তু পরিচয় বোধহয় জান না। ক্রমে ক্রমে সবই শুন্‌বে, সেই



যমালয় থেকে পলায়নের কথাই আগে শোন ;—যখন বুঝ্‌লেম, আর আমার উদ্ধারের কোন উপায় নাই, তখন দেবীরাণী একটা মহাকৌশলের অবতারণা ক'ল্লেন। তাঁর কাছে একরূপ তীব্র বিষ আছে, সেই বিষ পান ক'ল্লে, তিন দিন পর্য্যন্ত ঠিক মৃতের মত থাকে, আবার একরূপ 'প্রতিষেধক' আছে. ইত্তিমধ্যে তাহা সেবন করালে, রোগীর তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হয়। তিনি অগত্যা এই কৌশল ক'ল্লেন, একখানি দানপত্র লিখিয়ে নিয়ে তিনি সেই বিষ আমাকে পান করালেন। তাইতেই তোমার সম্মুখে সেইরূপ মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়ি। তোমাকে শেষকালে যা যা উপদেশ দিয়েছিলেম, অর্থাৎ বালিসের নীচে চাবি—পশ্চিম কোণে পাথরের কথা প্রভৃতি কেহই জান্‌তেন না, এমন কি দেবরাণীও না ; তোমাকে সেই সব কথা বোলে, ক্রমে ক্রমে শরীর অবশ—দৃষ্টিশক্তিহীন হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, তারপর আর আমার চৈতন্য রৈল না,—তুমিও আমার উপদেশ মত সমস্ত কাজ ক'রে তৎক্ষণাৎ সে ঘর থেকে পলায়ন ক'ল্লে। এই পর্য্যন্তই জান, তার পর আমার উদ্ধার কেমন ক'রে হয় শোন ;—বুঝ্‌তেই পাচ্ছ, এ সমস্ত দেবীরাণীর কাণ্ড! আর তাঁর মুখেই এ সব শোনা ;— তার পর তৎক্ষণাৎ লোক জনের সাহায্যে আমাকে সরিয়ে দিয়ে, তিনি এক ভয়ানক কাণ্ড ক'ল্লেন! সেই রাত্রেই রটিয়ে দিলেন, বৃদ্ধ বন্দী এতদিন পরে দেহত্যাগ ক'রেছে, দলে খবর গেল। ইত্যবসরে দেবীরাণী ঠিক্ আমার মত একটা বৃদ্ধশব কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রে, ঠিক আমার মত সেই খাটে শুইয়ে রাখ্‌লেন, অসমসাহসিকবুদ্ধির কথাটা একবার শোন! এমনি ভাবে কাপড়মুড়ি দিয়ে সেই শবটাকে প্রচ্ছন্নে রাখ্‌লেন, কার সাধ্য সন্দেহ করে! তার পর দলপতি প্রভৃতি সবাই সেই ঘরে এল, যথাযুক্তিতে পরীক্ষা ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে দেবীরাণীর উপর কোন রূপ সন্দেহ না রেখে, একটা প্রকাণ্ড ঝোলার মধ্যে পূরে বেশ ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে' ছেঁদে সেই বাড়ির পশ্চিমদিকের কিয়দ্দূরে একটা ছোট-রকম পাহাড় আছে, তাহার উপর থেকে একটা গভীর গুহার মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর আমার গৃহ তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'ল্লে, কিছুই পে'লে না, তারা হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল। আমার পলায়নের কথা সব বুঝ্‌তে

পাল্লে ? এখন তোমার অত্যদ্ভুত রহস্য এখনি শুন্‌বে।” অতঃপর গোবিন্দলাল বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিলেন। কি সুখ ! কি আনন্দ ! আমার সেই চির-পরিচিত বন্ধু দেবীরাণীর প্রধান সহায়, গোবিন্দলাল রায়মহাশয়কে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আমাদের সম্মুখে অবির্ভূত হইল। সেই বৃদ্ধ কহিলেন, “ব্রজেন্দ্রভূষণ ! গোবিন্দলাল কা’কে লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে এনেছে চিন্তে পেরেছ কি ?” আমি ঘৃণায় তৎপ্রতি চাহিতে পারিলাম না। রায়মহাশয়কে দেখিয়া আমার যেন সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাঁহাকে কহিলাম, “আর ব’ল্‌বেন না—আর ব’ল্‌বেন না—আমি আর ও নরাধমকে চিনিনা ? ওর চক্রে প’ড়ে আমার যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক যাতনা সহ্য কত্তে হ’য়েছে, তা’ মহাশয় বোধহয় সমস্তই শুনেছেন ; ও নরাকারে পিশাচ, অমন নির্ম্মম নারকী দৈত্যের কল্পনাতেও সৃষ্টি হ’তে পারে না ! আমায় বলুন, কেমন ক’রে নরাধম ধৃত হ’ল ?” তিনি উচ্চহাস্যে কহিলেন,—“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ব্রজেন্দ্রভূষণ ! অনেক গুলো কথা ক’য়ে ফেল্‌লে যে বাবা ? দৈত্যের কল্পনাতেও এমন জীব সৃষ্টি হয় না ব’ল্‌ছ ? এ হ’তেও যে আরো অদ্ভুত জীব আছে, সাদা কথায় যাকে তুমি আঠার বৎসর বাপ্‌ ব’লে এসেছ। এ জীবটিকে তা হ’লে কোন্‌ নামে ডাক্‌তে চাও বৎস ? হাঃ হাঃ ! ঠিক্‌ কথাই ব’লেছ বটে, দৈত্যের কল্পনায় এ জীব সৃষ্টি হয় না—এ কথা যথার্থই বটে, কেমন গোবিন্দলাল ? আচ্ছা বেশ—বেশ, সে লোকটিকেও দেখ্‌তে চাও ?” বিজয় ! বিজয় ! বলিয়া কাহাকে আহ্বান করিলেন।

বৃদ্ধ। “রায় মহাশয় ! বসুন, অনেক যত্নে অনেক আবাহনে আপনার শুভাগমন হ’য়েছে !” রায়মহাশয় অতি বিরসবদনে দাওয়ায় বসিয়া পড়িলেন।

“ব্রজেন্দ্রভূষণ ! কেমন অভিনয় দেখ্‌ছ ?” আমি নির্ব্বাক চিত্রার্পিতের ন্যায় এ সকল দেখিতেছি, এমন সময় এ কি বীভৎস মূর্ত্তি ! সেই সেই যাহাকে আঠার বৎসর পিতা বলিয়াছিলাম, তৎকালীন যে আমায় সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, পিতার মতই যত্নবান ছিলেন, আমায় ছলে কৌশলে শ্বশুরালয় নামক নরককুণ্ডে আনিয়া সংসারচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করিয়াছে,

সেই সেই হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ম্লানমুখে সভীতপাদবিক্ষেপে বিজয় নামা সেই অপরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিকটস্থ হইলেন।

বৃদ্ধ। "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! বসুন, এত ভয় কেন? তাই ত! এ কি আশ্চর্য্য দেখ্‌ছি? তোমাদের মত লোক, লোক দেখে ভয় পায়? ব্রজেন্দ্রভূষণ ঠিক কথাই ব'লেছে, দৈত্যের কল্পনাতেও এমন নিকৃষ্ট জীব সৃষ্টি হয় না! (গোবিন্দলালের প্রতি) গোবিন্দলাল! আর বিলম্ব ক'রছ কেন? আর যারা যারা আছে ডেকে নিয়ে এস, আজ এ স্থলেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ হ'ক।" কিয়ৎক্ষণ পরেই গোবিন্দলালের সহিত রায়মহাশয়ের পাপ অনুচরগণ দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সম্মুখের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইল। অসমসাহসী ভীম বলবান গঙ্গাধর তাহাদিগের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। আমি বিষম কৌতূহলী হইয়া এই অদ্ভুত রহস্যময় অভিনয় একান্তমনে দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে দেখি পূজাগৃহদ্বার মুক্ত হইল! সেই বৃদ্ধের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চক্ষুই সেই দিকে ধাবিত হইল। আহা হা, কি দেখিলাম! একটি স্থির-সৌদামিনী চমকিত হইল! অতি চমৎকারমূর্ত্তি! রাজরাজেশ্বরীবেশে দেবীরাণীর আবির্ভাব! কি অপূর্ব্ব জ্যোতিচ্ছটা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! পশ্চাতে শীর্ণকায়া শ্বেতবসনা তপস্বিনী দেবীরাণীর হাত ধরিয়া সেই রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই দুইখানি কুশাসন আমাদের নিকট হইতে কিয়ৎদূরে পাতা ছিল, উভয়ে তাহাতেই উপবিষ্টা হইলেন।

সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি চতুর্দ্দিক চাহিয়া অতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"এক্ষণে সকলেই উপস্থিত আছেন, এই দীন দুঃখিনী তপস্বিনীর আশ্রমে যে এ সব মহাত্মাদের এক সঙ্গে শুভাগমন হ'বে, দয়াময় ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহই ব'ল্‌তে হ'বে। এখন সকলকার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, যিনি যে বিষয়ের জন্য জিজ্ঞাসিত হ'বেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে যথাযথ প্রত্যুত্তর দিবেন কি না?" কিছুক্ষণের জন্য সকলে নিস্তব্ধ, এমন কি সূচিপতন হইলে তাহার শব্দ শুনা যায়। অতি গম্ভীর দৃষ্টিতে অতি গম্ভীর স্বরে চতুর্দ্দিক কম্পিত

করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা আবার কহিলেন,—"কেমন গো বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! কি গো সদাশয় রায়মহাশয়!! মুখে বাক্য নাই কেন? এত স্থির, এত শান্ত ত তোমরা নও! বল, যা যা প্রশ্ন ক'র্‌ব এ সকলের উত্তর পাব ত?" সবিনয়ে অতি কাতরে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—"মহাশয়! আর কেন? ক্ষমা দেন, আপনি ক্ষমাবান মহাপুরুষ, আর লজ্জা দিবেন না।"

উচ্চহাস্যে বৃদ্ধ কহিলেন,—"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ক্ষমাবান মহাপুরুষই বটে! এ ক্ষমা কিন্তু মানুষের সাধ্যাতীত, বুঝ্‌লে হরিহর! দেবতারাও এতটা সহ্য কত্তে পারেন না। যাক্ এখন সে সব কথা, এ স্থলে সকলেই উপস্থিত আছেন, সাক্ষীরও অভাব নাই, আদ্যোপান্ত যা যা ঘট্‌বে সকলে শ্রবণ করুন ;—

অষ্টত্রিংশ চক্র।

বৃদ্ধের আত্মকথা।

(১ম পরিচয়।)

আমার নিবাস কলিকাতার কোন ধনাঢ্যপল্লীতে, মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের আমি অধস্তন সপ্তম বংশধর। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নবাব মীরজাফরের সমসাময়িক, তিনি তৎকালে পাঁচহাজারি মুন্‌সব্‌দার হইতে নিজ ক্ষমতায় পুরুষকারের বলে এক বারে দাওনের পদে উন্নীত

হয়েন। তিনি নবাবের দক্ষিণহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহার প্রবলপরাক্রমে রাজকর্ম্মচারী মাত্রেই সশঙ্কিত ছিল। এমন সময়ে দৈব তাঁহার বিরুদ্ধ হইল। কমলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি অতি স্বজ্জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় তাঁহার সহকারী ছিলেন। এই কমলাকান্ত ব্যতীত অধিকাংশ কুচক্রী কর্ম্মচারী নানাবিধ উপায়ে নরেন্দ্রনারায়ণকে নবাবের বিদ্বেষনয়নে নিপাতিত করিল। মীরজাফরের অত্যাচার ভয়ে কমলাকান্তের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য নীলাচলের কোন গুপ্তগহ্বরে প্রভূত যত্নে লুকাইত রাখিলেন। তাঁহারা উভয়েই চাকরিতে জবাব দিয়া, এই কলিকাতায় আসিয়া অভেদ্য বন্ধুতাসহকারে বাস করিতে লাগিলেন— এবং এক প্রাণে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দিন দিন তাঁহাদের উন্নতি হইতে লাগিল, অচিরেই তাঁহারা বিখ্যাত ধনবান বলিয়া সুপরিচিত হইলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনারায়ণ 'মহারাজা' নামে বিভূষিত হইয়া অবশিষ্ট কাল অতি সমারোহে যাপন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মৃত্যু সন্নিকট ভয়ে এক খানি দানপত্র প্রস্তুত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ নামে তাঁহার একমাত্র সন্তানকে ঐ সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী রাখিয়া পক্ষাঘাত রোগে হটাৎ বাকরোধ হইয়া তাঁহার প্রাণাত্যয় হইল। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে বাণিজ্যকার্য্যে যে প্রভূত অর্থাদি সঞ্চয় করেন, তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ তৎসমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, কিন্তু নীলাচলস্থ রত্নগৃহ সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কেবল মাত্র এই দানপত্র খানি পাইয়াছিলেন। নীলাচল, কোন গহ্বরের ভিতর রত্নগৃহ বা "গুপ্তধন" মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। বংশ-পরম্পরায় ভোগ দখলার্থে। এ সন্ধান যিনি পাইবেন, এ রত্নগিরি তাঁহারই! এই পর্য্যন্ত! ইহা ভিন্ন আর কোন সন্ধানই তিনি পাইলেন না।

তারপর কমলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। তিনিও বোধ হয় বন্ধুর শোক

সহ্য করিতে না পারিয়া, অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রজেন্দ্র-ভূষণ শ্বশুরবাটীর ভ্রমে যে বাটীতে আবদ্ধ ছিলেন, ইহাই কমলাকান্তের সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা। তাঁহার পর পর সপ্তম পুরুষ এ বাটীতেই ক্রমে ক্রমে অতুল সুখভোগের সহিত দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই পরদুঃখকাতরা মহিয়সী দেবীরাণী ওরফে শ্রীমতী বীরজাসুন্দরী দেবী, সপ্তম বংশধর শ্রীমান ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা। বাল্যকালে ইহাঁর পিতা "বনলতা' নামে সম্বোধন করিতেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা তরুলতা রায়মহাশয়ের কুহকে পড়িয়া কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা অদ্যাপিও জানা যায় নাই। এইরূপ জনপ্রবাদ, তিনি বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! শশীবালা নাম্নী তাঁহার হতভাগিনী দ্বিতীয়া কন্যা অতীব সুন্দরী ছিলেন, এবং এই বীরোজাসুন্দরীর সহিত আকারে এমত সৌসাদৃশ্য, উভয়কে পর পর দেখাইলে, কে কোনটি স্থির করা যায় না। তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই দুরাত্মা নানাবিধ উপায় করিয়াছিল। অবশেষে নিরুপায় ভাবিয়া যে দশ নম্বর গারদে ব্রজেন্দ্রভূষণ আবদ্ধ ছিলেন, সেই গৃহেই শশীবালাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। রায়মহাশয়ের বিষম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, অভগিনী অবশেষে আত্মসংপ্রদান করিয়া কোথায় গুপ্তভাবে বাস করিতেছিলেন, আজি তিন মাস হইল, অভাগিনী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে! বীরাজসুন্দরীর বয়ঃক্রম তখন ১২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে; একে বালিকা, তায় অন্তঃপুরচারিণী, পুনশ্চ রায়মহাশয়ের পৈশাচিক-শাসনে বাহিরের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এই অবস্থা হইলেও দেবীরাণীর কিন্তু অকুতোসাহস—অমানুষিক বুদ্ধি। যখন বুঝিলেন, যে সাহস ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই, গোবিন্দলালের পরামর্শে অন্তঃপুর হইতে প্রকাশিত হইলেন, সর্ব্বদাই পুরুষসাজে সজ্জিত থাকিয়া নিজ কার্য্য সংসাধন করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। ঐ নরাধম, বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক বিশ্বনাথ রায় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁরই উপর বীরজা সুন্দরীর সমস্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া ভৈরবচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই পিশাচ এরূপ দুরাচার এতবড় নারকী, যে প্রভুর সমস্ত

উপকার ভুলিয়া নাবালিকা দেবীরাণীর প্রধান শত্রু হইয়া উঠিল। দুরাত্মা ধর্ম্মভয় না করিয়া একহাজার দস্যু সংগ্রহ করিয়া প্রধান দলপতি হইয়া উঠিল। গোবিন্দলাল গঙ্গাধর জয়পাল এবং বিজয়নামা এই তিন ব্যক্তি ইহাঁরা প্রভুর উপকার না ভুলিয়া, প্রকাশ্যতঃ ভৈরবচন্দ্রের স্বপক্ষে থাকিয়া ভিতরে ভিতরে দেবীরাণীর প্রধান রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইহাঁদেরই অমোঘ-কৌশলে, দেবীরাণী এবং ব্রজেন্দ্রভূষণ অদ্যাপিও অক্ষতশরীরে জীবিত আছেন। ইতিমধ্যে ইহাঁরা রায়মহাশয় প্রভৃতিকে দূর করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিতে পারিতেন; কেবল মাত্র ভৈরবচন্দ্র প্রদত্ত দালীল দস্তাবেজ দানপত্রাদি সমস্তই ঐ পাপাত্মার নিকট অতি গোপনে রক্ষিত ছিল বলিয়াই এত দিন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর দেবগ্রাম-নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কলঙ্কিনী শ্যালিকা 'তারাকালী' কোন উপায়ে ঐ সমস্ত দলীল দস্তাবেজ প্রভৃতি হস্তগত করিয়া-ছিল; অতঃপর ঘটনাক্রমে শ্রীমান ব্রজেন্দ্রভূষণ হটাৎ তৎসমুদায় প্রাপ্ত হয়েন। দেবীরাণী ব্রজেন্দ্রভূষণ কর্ত্তৃক কোন দৈবঘটনায় তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া রায়মহাশয় প্রভৃতি দুর্দান্ত ব্যক্তিকে হস্তগত করিয়াছেন। এতদিন পরে দেবী-রাণীর সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইল। দেবীরাণী সত্য সত্যই মহারাণী পদে অভিষিক্ত হইলেন।

তারপর ব্রজেন্দ্রভূষণের কথা;—শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ হইতে পর পর সকল বংশধরেরাই ঐ রত্নগৃহ সন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে আমার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ নর-নারায়ণ ভূপবাহাদুর কি জানি কোন উপায়ে নীলাচলের সন্ধান এবং তাহার স্বর্ণকৌটাস্থিত চাবি ও একটা হীরকাঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন আমার বয়ঃক্রম চাল্লিশ বৎসর, তখন পিতৃদেবের সংসারের উপর পূর্ণ বৈরাগ্য হয়। এক দিবস আমাকে গোপনে আহ্বান করিয়া চুপে চুপে এই দানপত্র ও স্বর্ণকৌটা দিয়া এবং সমস্ত স্থাবর অস্থাবরের আমাকে একমাত্র উত্তরাধি-কারী করিয়া আমার জননী সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রাছলে নিরুদ্দেশ হন। এই দুরাত্মা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দেওয়ান ছিল, ঐ পাপাশয় রত্নগৃহ

সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জানিত। ইহার কপটমায়ায় মুগ্ধ হইয়া ব্রজেন্দ্রভূষণ যখন তৃতীয়বর্ষীয় বালক, তখন ঐ ব্যক্তিকে আমার সমস্ত সম্পত্তির অছি করিয়া ব্রজেন্দ্রভূষণকে উহার হস্তে সমর্পণ করত আমরা সস্ত্রীক নীলাচল উদ্দেশে প্রস্থান করি। বজরাযোগে গঙ্গার কিনারা দিয়া ক্রমাগত সপ্তাহকাল নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতেছি, এমন সময় ঠিক সন্ধ্যাকালে ঘোরতর মেঘাড়ম্বরের সহিত বৃষ্টি হইতে লাগিল। তীরে নৌকা লাগাইয়া আমরা ঘোর প্রকৃতি-বিপ্লব সহ্য করিতে লাগিলাম। গভীর রাত্রি, আমরা নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে সবাই বিনিদ্র হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখি একখানা দ্রুতগামী ছিপ্ আমাদের বজরা লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে আগমন করিতেছে। আমার জনৈক মাঝি সমস্ত বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিল, "মহারাজ জী! সাবধান! সাবধান! ঐ দেখুন অন্ধকার ভেদ ক'রে আমাদের লক্ষ্য ক'রে এক খানা ছিপ আস্‌ছে।" যদিও আমার দল নিতান্ত অপরিপুষ্ট ছিল না, তথাচ আমি অতিশয় ভয়াকুল হইলাম।

একে গভীর রাত্রি, তাহাতে জলপথ, আবার হৃদয়ানন্দদায়িনী পত্নী সমভি-ব্যাহারিণী—আমি বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে ছিপখানা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল। ওহো! গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুড়ুম্ করিয়া শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রধান মাঝিও রক্তাক্ত কলেবরে গঙ্গাজলে নিপতিত হইল। আমাদের বজরার ভিতর হইতে মহাশব্দে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল, দেখিতে দেখিতে একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল! ডাকাডাকি—মারামারি—হুড়াহুড়ি ইত্যাদি নানা ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া আমার পত্নী ভয়ে অভিভূতা হইয়া আমার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন! অগত্যা ভয়ে কাতরা, মোহাভিভূতা আমার স্ত্রীকে লইয়া বজরার একটা খোলের ভিতর আমরা লুকাইত হইলাম। বজরার উপর ভয়ানক কাণ্ড হইতে লাগিল! দস্যুগণের ভয়ঙ্কর চীৎকারে—আমার দলস্থিত লোকের হাহাকারে প্রকৃতই আমি তখন আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। ওহো! সে আজ কত কষ্টের কথা! সে ঘোর ভয়াবহ দৃশ্য যেন এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে! দুরাত্মাদের লাফালাফি দাপাদাপিতে কেন যে

তখন বজরা ডুবিয়া যায় নাই, বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমাদের দলই সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। যখন আমাদের দলস্থ আর একটি লোকও জীবিত নাই, তখন সেই দুর্বৃত্তরা আমাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তখন দৈব আমাদের পূর্ণ বিমুখ, কাজেই আত্মগোপনে অসমর্থ হইয়া সেই দুর্বৃত্ত দস্যুগণের মধ্যে পাষণ্ড নরাধম রায়মহাশয়ই আমাদিগকে বাহির করিল। তখনও আমার স্ত্রী অজ্ঞান; ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জলিয়া উঠিল! তাহার গণ্ডদেশে এক প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলাম। পাষণ্ড হটাৎ টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়াই তাহার সেই লাঠী লইয়া সজোরে আমার মস্তকোপরি আঘাত করিল। তখন দশদিক অন্ধকার দেখিয়া অন্তিম চীৎকারের সহিত অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তিন দিন পরে যখন আমার জ্ঞান হইল, দেখিলাম একটা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ আছি। তখন ধীরে ধীরে আমার সমস্ত কথা মনে হইল। আমি কোথায়, কোন অজানিতস্থানে নিপতিত? হায় হায়! হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম! কোথায় সেই প্রাণপ্রতিমা অভাগিনী স্ত্রী—কোথায় সংসার—কোথায় আমি!! নিদারুণ যাতনায় বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলাম! এমন সময় ঐ নরপিশাচ আসিয়া আমায় কহিল, "তোর নীলাচলের সমুদায় খপর বল্!" আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এ ব্যক্তি কোথা হইতে নীলাচলের সমাচার জানিল?" যাহা হউক, এই সংবাদ পাইবার জন্য আমাকে অশেষ নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। একাদিক্রমে বিশবৎসর কাল এই নিদারুণ কষ্টে ছিলাম! সে কষ্ট এত দিন পরে মহাসুখে পরিণত হইল, এই আমার জীবনের দুর্ভাগ্যময় জীবনী! এখন তপস্বিনী দেবী তাঁহার কি বক্তব্য আছে, বলিয়া যান।

ঊনচত্বারিংশ চক্র।

তপস্বিনীর আত্মকথা।

(২য় পরিচয়)

তখন ধীরে ধীরে শান্তস্বরে তপস্বিনীদেবী কহিতে আরম্ভ করিলেন; "বজরার দস্যুঘটিত ভয়ানক কাণ্ড সমস্তই উহাঁর মুখে প্রকাশ পাইল! তারপর কি অসহনীয় জ্বালা—কি নিদারুণ কষ্টে কেমন করিয়া এই দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। যখন দেখিলাম, আর কোন উপায় নাই, ঐ নরপিশাচ রায়মহাশয়ের প্রচণ্ড আঘাতে আমার স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন কোন প্রকারে উহার হস্ত ছাড়াইয়া 'মা গঙ্গে! আমায় নাও মা! আমি আর এ নিদারুণ দৃশ্য দেখ্‌তে পারি না! মাগো! আমার স্বামীকে রক্ষা ক'রো—আমার স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ব না!' এই বলিয়া গঙ্গাজলে ঝম্প প্রদান করিলাম। আমাকে ধরিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক দৌড়িল; বেশ বুঝিতে পারিলাম, চারি পাঁচ জন লোক জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। বাল্যকাল হইতে আমার উত্তমরূপ সাঁতার অভ্যাস ছিল। তাহাও বটে, আর রাত্রিকাল বলিয়া বোধ হয় পাপিষ্ঠদের নজরে পড়ি নাই; খুব ধীরে ধীরে সাঁতার দিয়া বজরার পশ্চাৎ দিকে হাল ধরিয়া ভাসিয়া রহিলাম। চারিদিকে দস্যুগণ আলো জ্বালিয়া আমার সন্ধান করিতে লাগিল। সৌভাগ্য বশতঃ কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। প্রাণভয়ে অতি সাবধানে ঐ রূপে আত্মরক্ষা করিলাম। আমার মৃত্যু স্থির করিয়া ঐ দুরাত্মারা

বজরা ছাড়িয়া দিল ; বজরার পশ্চাতে তখন কেহই আইসে নাই বলিয়াই নিস্তার পাইয়াছিলাম।

এই রূপে সমস্ত রাত্রি জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম,—প্রায় প্রভাত নিকট দেখিয়া তাহারা কিনারায় বজরা লাগাইল। তখন আমার শরীর এত নিস্পন্দ ও অসাড়, কেমন করিয়া ইহাদের সম্মুখ হইতে পলাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কি করি, কপালে যাহাই থাক্, প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে আপনাকে লুকাইয়া তীরে উঠিয়া একটা ঝোপের ভিতর লুকাইত রহিলাম ; যদিও পূর্ব্ব দিক ফর্সা হইয়া আসিতেছে, তবুও ঘন বৃক্ষচ্ছায়াতে সে স্থানটা কতক অন্ধকারময় ছিল। কালবিলম্বে সমূহ বিপদ ভাবিয়া ক্রমাগত ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। পদে পদে বড়ই ব্যাঘাত লাগিল ; একে আর্দ্রবস্ত্র, তাহাতে শরীর অতিশয় অবসন্ন, কি করি প্রাণের দায়ে যথাসম্ভব ছুটিতে লাগিলাম। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, কেহই আমার অনুসরণ করিতেছে না, তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলাম। আর বসিতে পারি না, শীতে ও প্রাণভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি, শরীরের ভার আর সহ্য হয় না। সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াই নিদ্রিত হইলাম। কতক্ষণ এইরূপ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না ; যেমন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক আমার পার্শ্বে বসিয়া আগুনের তাপ দিতেছে, আমি হটাৎ চমকিত হইয়া কহিলাম, "আমি কোথায় ?" সেই স্ত্রীলোকটি কহিল, "ভয় নাই মা ভয় নাই ! তুমি ভিজে কাপড়ে পাঁশ বর্ণ হ'য়ে ঘুমুচ্ছ দেখে, আমি সুবশ্বুঝ্তে পে'রেছি। কাছেই আমার কুঁড়ে ঘর আছে, চল সেখানে তোমায় নিয়ে যাই। এখন উঠ্তে পার্‌বে কি ?" আমি বলিলাম, "চল মা চল, কোথায় তোমার ঘর ? আমি বড় বিপদে প'ড়েছি, এ হতভাগিনী অনাথিনীকে আশ্রয় দে মা ! আমি বেশ উঠ্তে পারব। তোমার আগুনের তাপে আমার শরীর এখন বেশ সবল হ'য়েছে।" আস্তে আস্তে উঠিলাম, অতি সাবধানে অতি যত্নে তিনি আমাকে তাঁহার কুটীরে লইয়া গেলেন।

একটি কৃষকের অতি সুন্দর সুখের সংসার! কৃষক, কৃষকপত্নী আর দুইটি কন্যা এ কুঁড়েঘর খানিকে যেন সোণার—যেন স্বর্গের সংসার করিয়া তুলিয়াছেন! তাঁহাদের সাধুতা—সদাশয়তা বাস্তবিক এ পৃথিবীর নয়। কন্যা দুইটির বিবাহ হইয়াছে। আমি যখন তথায় প্রথম প্রবেশ করি, কন্যা দুইটিই শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে বিশেষ ভক্তি যত্নে পরম সুখে রাখিলেন। এই রকমে আমার কিছু দিন কাটিয়া গেল। এই সময়ে বড়কন্যাটি (হৈমবতী) পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। কি সরলতাময়ী সুন্দরী কন্যা! চাষার ঘরে এমন রত্ন জন্মে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না; তাহার বিবাহও বেশ সম্পন্ন লোকের সহিত হইয়াছে। কন্যাটি প্রকৃতই হাস্য-ময়ী সরলা—স্নেহময়ী! আমার প্রতি তাহার প্রগাঢ় যত্ন প্রগাঢ় ভক্তি! এই কয়মাসে বাটীর কর্ত্তা আমার স্বামীর অনেক তল্লাস লইয়াছেন, কোন ক্রমেই সন্ধান পান নাই। কোন রূপে তথায় সুখে দুঃখে আমার দিন কাটিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে হৈমবতী তাহার শ্বশুরবাটীর সম্বন্ধে কতই গল্প করেন, সে সব কথা শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত। একদিন তার মুখে হঠাৎ একটা কথা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলাম। সে কথাটি এই;—তাহার শ্বশুরালয় নীলগঞ্জে, তাহার অনতিদূরে "নীলপাহাড়" নামে একটা পর্ব্বত আছে, আর এইরূপ প্রবাদ, তাহার কোন গহ্বরে নাকি কোন্ রাজার অগাধ ধন পোতা আছে। এ কথাটি শুনিয়া আমার মনে মনে বড়ই আনন্দ হইল, তথায় যাইবার জন্য আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল; এ সব কথা কাহাকেও না বলিয়া হৈমবতীর শ্বশুরবাটীতে কোন ছলে যাইবার উপায় দেখিতে লাগিলাম। সেই দিন হইতে হৈমবতীকে আমি আরো যত্ন আরো ভালবাসিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে এমন হইল, হৈমবতী আমাকে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারে না, আমিও ততোধিক। এমন সময়ে আমার এক উত্তম সুবিধা ঘটিয়া গেল। হৈমবতীর শ্বশুরের বড় অসুখ, সত্বরেই তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে। কিন্তু হৈমবতী আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, আমারও মনগত ভাব তাই। কাজেই কাহারো আর কোন আপত্তি রহিল না। শুভ দিন দেখিয়া হৈমবতীর সহিত আমি

তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলাম। তথায় আমার আদর যত্নের কিছুই ত্রুটি হইত না, আমি পরমযত্নে তথায় বাস করিতে লাগিলাম। মনে মনে "নীলপাহাড়" দেখিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল, ক্রমে তাহারও সুযোগ ঘটিয়া গেল। হৈমবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, কোন উপায়ে একদিন গোপনে নীলপাহাড় দেখিয়া আসিব। তাহার শাশুড়ীকে বলিয়া মত করিলাম। এক দিন আহারাদির পর একজন কৃষাণকে সঙ্গে লইয়া হৈমবতী ও আমি নীলপাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

সেই কৃষাণটি নীলপাহাড়ের অনেক সন্ধান জানিত, আর তিনক্রোশ পথ মাত্র ব্যবধান, দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। কৃষাণটি যেমন নম্র—তেমনি প্রভুভক্ত, সে আমাদের নীলপাহাড়ের প্রত্যেক স্থান দেখাইতে লাগিল। তিনবার পর্য্যবেক্ষণের পর পশ্চিমদিকের শৃঙ্গের কিয়দ্দূর গমনের পর কহিল, "এই স্থানটা বড় ভয়ানক! ঐ শৃঙ্গের নিকট কোথায় একটা ভয়ানক গহ্বর আছে, ঐ গহ্বরে কোন্ রাজার অগাধ ধন বহুকাল হ'তে নাকি পোতা আছে। সেই রাজাদের কত লোক আসিয়াছিল, কেহই সন্ধান ক'ত্তে পারেন নাই।" আমি অনিমিষনেত্রে ঐ দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, এ স্থান ভয়ানক দুর্গম, মানুষের সাধ্যাতীত; তবু কিন্তু আমার কৌতূহল দূর হইল না। একটা রাজার ঐশ্বর্য্য,—রাজার এত লোকজন আসিতেছে, কি প্রকারে এ স্থান এরূপ অগম্য থাকিতে পারে? যাহা হউক, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। অতি কষ্টে কিয়দ্দূর চলিয়া আসিয়াছি, এমন সময়ে কৃষাণটি কহিল, "দেখুন—আর একটা আশ্চর্য্য দেখুন! এখানে একটা ভয়ানক গর্ত্ত দেখুন!" অতি সন্দিগ্ধ চিত্তে ঐ স্থানে আসিয়া দেখিলাম, যথার্থ একটা ভয়ানক গর্ত্ত বটে! বড় বড় গাছ পালায় গর্ত্তটি বুজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! কিন্তু স্থানটা সমতল ভূমির উপর। আমার মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইল;—ভাবিলাম, এটা নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গ। যাহা হউক, এই ভাব গোপনে রাখিয়া আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

রাত্রে সুনিদ্রা হইল না;—কেবলই সেই নীলপাহাড়, পশ্চিমশৃঙ্গ এবং

সুড়ঙ্গের কথা মনে তোলা পাড়া হইতে লাগিল। এইরূপ আরও এক সপ্তাহ সেই বাটীতে কাটাইলাম, আর ভাল লাগে না। ক্রমে হৈমবতীর শ্বশুর আরোগ্য লাভ করিলেন, হৈমবতীরও পিত্রালয়ে গমনের কথা উঠিল। এখন কি করি? কোথায় থাকি? হৈমবতীর শ্বশুরালয়ে কি পিত্রা-লয়ে? অনেক চিন্তার পর এই এক উপায় স্থির করিলাম। হৈমবতীর পিত্রা-লয়ে যাইবার পূর্ব্ব দিন হৈমবতীর শাশুড়ির সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া সেই কৃষাণের সহিত নীলাচলের উদ্দেশে আবার যাত্রা করিলাম। একেবারে গর্ত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম; বাস্তবিক সুড়ঙ্গই বটে! এই স্থানেই কুটীর বাঁধিতে মনস্থ করি-লাম। কৃষাণকে আমার মনগত ভাব বুঝাইয়া কুটীর বাঁধিতে আদেশ দিলাম।

তৎপর দিন হইতে তথায় কুটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল, ঠিক সুড়ঙ্গের উপর হইতে পর পর তিনটি ঘর প্রাঙ্গণ প্রভৃতি যথোচিত রূপে একটি তপস্বি-নীর কুটীর নির্ম্মাণ করাইলাম। হৈমবতীর শ্বশুর সর্ব্বতোভাবে আমার সাহায্য করিতে লাগিলেন। অনেক লোকজন লাগাইয়া সুড়ঙ্গের উপরি ও ভিতরস্থ গাছ পালাগুলি সমুদায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইল। গর্ত্ত পরিষ্কার করিবার সময় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নাই, কেবল দুই একদিন সর্পের উৎপাত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ দেশের 'কোল' জাতীয় লোকেরা এতই সাহসী, সর্প দেখিলে ভয় দূরে থাকুক, তাহাদের আনন্দ হয়। তাহারা অতি আনন্দের সহিত সুড়ঙ্গের ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিল। যখন তাহাদের মুখে শুনিলাম, সর্পের বা কোন হিংস্র জন্তুর ভয় নাই, তখন সুড়ঙ্গ পরিষ্কার কার্য্যে ক্ষান্ত হইলাম। আমার এতাদৃশ অধ্যবসায় দেখিয়া তাহারা কোন রূপ সন্দেহ বা বিরক্তি বোধ করিল না। অতি বিশ্বাসের সহিত সমস্ত কার্য্য করিয়া চলিয়া গেল। অতঃ-পর হৈমবতীর শ্বশুরের তত্ত্বাবধানে ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। সুড়ঙ্গের উপরিস্থিত ঘরখানিকে পূজাগৃহ করিলাম। বাহিরে এমন কোন কথাই প্রকাশ পাইল না, যাহাতে এই গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে। তার পর প্রতিদিনই একটু একটু করিয়া সুড়ঙ্গের পথ আবিষ্কার

করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমার যথাশক্তিতে দুই তিন মাসের মধ্যেই সুড়ঙ্গের সম্পূর্ণ পথই পরিষ্কার করিলাম। স্থানে স্থানে যাহা জঙ্গল ছিল, তাহা আমি একাই পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। ভিতরে বড় অন্ধকার! তথায় সূর্য্যরশ্মির একেবারেই অভাব। অনেকগুলি মশাল তৈয়ার করিলাম, সেই মশাল জ্বালিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। সুড়ঙ্গের শেষ মুখে একটা প্রকাণ্ড লৌহদরজায় পথ রুদ্ধ। এইবার বড় বিপদে পড়িলাম! সেই কবাট ভয়ানক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহার চাবিও আমার কাছে নাই, আর আমি একা স্ত্রীলোক হইয়া কেমন করিয়া সেই ভয়ানক লৌহদরজা উন্মুক্ত করি? বড়ই হতাশ ভগ্নমনে কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, অনাথবান্ধব হরি সকলের আশা পূর্ণ করেন, আমার আশা কি পূর্ণ করিবেন না? এইরূপে আশায় আশ্বায় বহুকাল কাটিয়া গেল। আজি দেড় মাস হইল, এই দেবীরাণী হটাৎ পরমসুন্দর বালক সাজে আমার নিকট আসিলেন, ইহাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। ইহাঁরই মুখে আমার পতি-পুত্রের সমাচার পাইলাম। তিনি যেন আমার বিধাতা হইয়া আমার দুরদৃষ্ট-দ্বার মোচন করিলেন। আমার পতিপুত্র কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহা-দের মর্ম্মান্তিক যাতনা, এই সংসারের পৈশাচিক-কাণ্ডের কথা শুনিয়া, আমি যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইলাম, বলিতে পারি না! কেবল যে পতিপুত্রের সংবাদ পাইলাম, তাহা নয়; যে প্রচণ্ড লৌহকবাট খুলিবার জন্য জীবনের অর্দ্ধ পরমায়ু অতি হতাশে নিদারুণ কষ্টে কাটাইয়াছি, তাহার চাবিও ইহাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া কি যে অসীম আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না! তৎক্ষণাৎ মশাল জ্বালিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর গমন করিলাম। কত যুগ ধরিয়া এই লৌহকবাট—কবাটের প্রকাণ্ড কুলুপ আবদ্ধ আছে, তাহা কি হটাৎ এক দিনে খুলিবে? ক্রমাগত এক সপ্তাহ ধরিয়া অবিরাম পরিশ্রমের পর লৌহকবাট উন্মুক্ত করিলাম; কিন্তু তাহাতেও ভিতরের রহস্য প্রকাশ হইল না। ইহারি ভিতর রত্নগৃহ। এ গৃহের চাবি কোথায়? যে হতাশ সেই হতাশ! তবে ইহার ভিতর পাহাড়ের রাস্তা আছে, পর্ব্বতের উপর উঠা যায় এই মাত্র। কিছুই হইল না, এত যে কষ্ট—এত যে

আশা, তাহার কিছুই সফল হইল না। অগত্যা কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। যেমন দিন কাটে, তেমনি ভাবে কাটিতে লাগিল,—দেবীরাণীও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর আজি দেড়মাস অতীত হইল, একদিন হৈমবতীর শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, হটাৎ দূর বনপথে একটা আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। সেই পথটায় বড়ই বন্যশূকরের উৎপাত! ত্রস্তে গিয়া দেখি, এই ব্রজেন্দ্রভূষণ—আমার হারা'ন অমূল্যনিধি হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। আমি একাই আমার বুকজুড়ান ধনকে বুকে করিয়া আমার আশ্রমে লইয়া আসিলাম। তারপর অনেক যত্নে বিস্তর সাধ্যসাধনায় সাত দিনের পর আমার বাছাকে ফিরিয়া পাই! তারপর যখন এই অনাথবালকের অদ্ভুত জীবনকাহিনী শুনিলাম, তখনি আমার সন্দেহ হয়! আমিও আমার তিনবছরের বাছাকে রাক্ষসের মুখে সঁপিয়া দিয়া আসিয়াছি, এত দিনে যদি বাঁচিয়া থাকে, সেও আমার এত বড়টি হইয়াছে! যতই বাছার চাঁদমুখ দেখি, ততই যেন দিশে-হারা হইয়া যাই! তার পর যখন দেখিলাম, নীলাচল পর্ব্বতের উপর ব্রজেন্দ্র-ভূষণের ভয়ানক ঝোঁক, তখন ভয়ানক সন্দেহে আমাকে আকুল করিয়া তুলিল! ব্রজেন্দ্র নীলপাহাড়ে যাইয়া কি করেন, দেখিবার জন্য আমিও পূজাগৃহ বন্ধ করিয়া গুপ্তসুড়ঙ্গ দিয়া অলক্ষিতে ব্রজেন্দ্রভূষণের কার্য্যকলাপ গতিবিধি সমস্তই পরীক্ষা করি। ব্রজেন্দ্রভূষণ যেন সর্ব্বদাই কি অনুসন্ধান করিতেছেন। দিনের দিন উৎকণ্ঠায় সন্দেহে যেন অতিশয় কাতর হইতে লাগিলেন! একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, বনপথ হইতে প্রথম যখন মূর্চ্ছিত ব্রজেন্দ্রকে আশ্রমে লইয়া আসি, তখন একটা স্বর্ণকৌটা ও একতাড়া কাগজ ইহাঁর কাপড়ের খুঁটে বাঁধা আছে দেখিলাম। স্বর্ণকৌটা ও কাগজের রহস্য কিছুই আমি জানি না; কারণ যখন আমি স্বামী-সমভিব্যাহারে নীলগঞ্জের "নীলপাহাড়" উদ্দেশে আগমন করি, তখন ঐ স্বর্ণকৌটা দানপত্রাদি সমস্তই আমার স্বামীর নিকটেই ছিল,—আমি কখন চক্ষেও দেখি নাই। এই স্বর্ণকৌটার রহস্য আমার নিকট অজ্ঞাত রহিল। ব্রজেন্দ্রভূষণ পাহাড়ে যাইয়া যাহা যাহা করিতেন, এই জন্যই আমি তাঁহাকে তৎসমস্ত কথা বলিতে পারিতাম।

এই রূপে আমরা মাতা পুত্রে অতি সন্দিগ্ধচিত্তে কালযাপন করিতেছি, হটাৎ দেবীরাণী আবার দেখা দিলেন! আসিয়াই ব্রজেন্দ্রভূষণের সমস্ত বিবরণ অতি গোপনে কহিলেন। যখন জানিলাম ব্রজেন্দ্রভূষণই আমার সেই হারানিধি, তখন অতুল বাৎসল্যানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলাম। পূজাগৃহ বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ কোন কারণ বশতঃ নীলপাহাড়ে যাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবীও আমার সহিত মিলিত হইলেন; এমন সময়ে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইল। তখন আমরা ব্রজেন্দ্রভূষণের জন্য অত্যন্ত কাতর হইলাম, হটাৎ আবার গভীর নাদে একটা বজ্রাঘাত হইল! তখন দেবীরাণীকে তথায় রাখিয়া আমি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ভাবিলাম, হয় ত ব্রজেন্দ্রভূষণ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যেমন আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি, দেখি আশ্রম লোকে লোকারণ্য! হটাৎ একটা অজানিত ভয়ে ভীত হইলাম। এই নির্জ্জন গভীর শান্তিময় তপস্বিনীর কুটীর আজ এত জনাকীর্ণ কেন? তখন বৃষ্টির তেজ কিয়ৎ-পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে। হৈমবতীর শ্বশুর অগ্রসর হইয়া ইহাঁদিগের শুভাগমন প্রচার করিলেন। অতি দীর্ঘকালের পর আবার আমি স্বামীর শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া আমার সমুদয় কষ্ট একবারে দূর হইল। তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। এই আমার আত্মকথা!"

চত্তারিংশ চক্র।

দেবীরাণীর আত্মকথা!

(তৃতীয় পরিচয়)

"যাঁহাকে এ সংসারের অন্নপূর্ণা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী, যাঁহার সাধু বুদ্ধিবলে, অপ্রতিহত সতীত্ব-তেজঃ-প্রভাবে তিনটি সংসার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, যাঁহার অলৌকিক বুদ্ধিচাতুর্য্যে আমার হারানিধি, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং আমার সমস্ত সংসার আজ আমি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, সেই পরদুঃখকাতরা বীরজাদেবীর কৃতজ্ঞতাপাশে আজ আমরা সকলেই আবদ্ধ। এক্ষণে তিনি এইরূপ সাধুসংকল্পে পতিপুত্র লইয়া রাজরাণী হউন, ইহাই এই বৃদ্ধের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ! এক্ষণে তাঁহার ইতিবৃত্ত কি? তিনি কি উপায়ে ব্রজেন্দ্রভূষণকে রক্ষা করিয়াছেন? তাঁহার অত্যদ্ভুত জীবনীরহস্য নিজ মুখ হইতেই প্রচারিত হউক! একটি হিন্দু-বালিকার অপূর্ব্ব মহিমাময়ী দেবীচরিত্র,—স্বর্ণাক্ষরে আকাশপটে লিখিত হউক,—জগৎসংসার সুশিক্ষিত হউক!" এই বলিয়া মহারাজ নীরব হইলেন।

তখন লজ্জারক্তিম অবনতবদনে বীণাবিনিন্দিতস্বরে যেন দেবভাষায় দেবীরাণী কহিতে লাগিলেন;—"আমার পূর্ব্বাভাষ পিতৃপরিচয় প্রভৃতি সমস্তই মহারাজার শ্রীমুখে প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর আমি যতদূর জানি, পূর্ণসত্য-জ্ঞানে রাজাধীরাজের শ্রীচরণে নিবেদন করি। অতি বাল্যকালে আমি পিতৃমাতৃহীনা; আমার বড়ভগিনীর সংবাদ আমি কিছুই জানিনা। আমরা দুই ভগিনীতে আপনার সংসারে আপনার বাটীতেই যেন বন্দিনী! এই রায়মহাশয়-

কেই আমরা পিতৃতুল্য—বড়মামা বলিয়া জানি ; অর্থাৎ ইহাঁর উপর আমাদের ভরণপোষণ ও তত্ত্বাবধানের ভার। আর ইহাও জানি,ইনি একটি মূর্ত্তিমান পাপ! একটি প্রকাণ্ড দস্যুদলের অধিনায়ক! আমাদের মাতৃপক্ষীয় কোন শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির আমাদের বাটীতে প্রবেশ নিষেধ! সুতরাং ঐ রায়মহাশয়ই আমাদিগের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা! আমার মধ্যমা ভগিনী শশীবালা যখন প্রথম-যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন হইতেই ঐ পিতৃস্থানীয় পূজনীয় ব্যক্তির তাঁহার উপর পাপদৃষ্টি পড়িল! একদিন হটাৎ শশীবালা কোথায় অন্তর্হিত হইলেন! ইহাঁর চরণে ধরিয়া কতই কাঁদিলাম, কতই সাধ্যসাধনা করিলাম, কিছুতেই সঠিক উত্তর পাইলাম না। এইরূপে অতি কষ্টে আমার দিন কাটে, আমি তখন চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকামাত্র ; মেজোদিদির কোনই উপায় করিতে পারিলাম না। এই সময়ে একদিন রায়মহাশয় আসিয়া আমাকে কহিলেন, "শশীবালার জন্য তোমার এত চিন্তা কেন? সে ভাল ঘরে প'ড়েছে, শীঘ্রই তা'র সহিত তোমার সাক্ষাৎ হ'বে। তোমার বিবাহের বয়স হ'য়েছে, আর তোমাকে অবিবাহিতা রাখা যায় না। আমি তোমার জন্য একটি সুপাত্র স্থির ক'রেছি, আগামী চতুর্থদিনে তোমার বিবাহ। বিবাহ স্থির বটে ; কিন্তু তোমাকে অতি গোপনে থাক্‌তে হ'বে, বরকন্যার চোখোচোখিটি পর্য্যন্ত হ'বে না ;—কেবল মাত্র জান্‌বে, তোমার বিবাহ হ'য়ে গেল। বিবাহরাত্রে যদি তুমি পলায়ন কর, অথবা আমার অমতে কোন কার্য্য কর; এই হেতু তোমাকে কোন গৃহে আমি কয়েদ ক'রে রাখ্‌ব। বিবাহ হ'য়ে গেলে, বর নিজবাটীতে প্রস্থান ক'র্‌লে পর—তোমার মুক্তি হ'বে।" আমি কোন কথাই কহিতে পারিলাম না ; যাহা বলিলেন, কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। অতি নীরবেই বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইল।

বাটীতে খুব সমারোহ,—আমার বিবাহ! বাহিরে খুব গোলমাল বটে, কিন্তু ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই। আমার অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে ;—পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া আমার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে, এমন সময় দেখি শশীবালা ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গলা ধরিয়া অনেকক্ষণ দুই জনে কাঁদিলাম। হায় হায়! মেজ-

দিদির সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! দিদি আমার রায়মহাশয়ের অঙ্কশায়িনী! লোমে লোমে কম্পিত হইয়া উঠিলাম!—বুঝি আমারও সর্ব্বনাশের দিন নিকট! আমিও হয় ত রায়মহাশয়ের পাপ-দৃষ্টি এড়াইতে পারিব না! বিবাহের পূর্ব্বদিন হইতে আমি বন্দিনী রহিলাম। বর চলিয়া গেলে পর, আমার মুক্তি হইল। আর মেজদিদিকে দেখিতে পাইলাম না, তিনি কোথায় গেলেন জানিনা। যেমন দিন কাটে, তেমনি ভাবে আমার এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই গোবিন্দলাল আমার বাপের অতি প্রিয়তম ভৃত্য! এই তখন আমার একমাত্র সুহৃৎ! ইহারই পরামর্শে এখন হইতে আমি পুরুষবেশ ধারণ করিলাম। তাহাতে রায়মহাশয়ের কোন আপত্তি হইল না—বরং তাহাতে আনন্দিত হইল। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই রায়-মহাশয় আমাদের কয়ভগ্নীকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। আমার বড়দিদির কথা মনে নাই, তিনিও নাকি নৃত্যগীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। মেজদিদি ও আমি একত্রে নৃত্যগীত অভ্যাস করিয়াছি। আমাদের শিক্ষাদাতা যিনি, এই হেতু তিনি আমাদের উপর বিশেষ তুষ্ট ছিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। এক সপ্তাহের পর হটাৎ শশীবালা আসিয়া বলিলেন, "আজ নাকি বর আস্‌বে, তুমি বিশেষ সাবধানে থেকো, খবরদার তার চক্ষে প'ড়ো না। রায়মশাই বড় কড়া হুকুম দিয়েছেন। সেই বরের সম্মুখে আমাকে উপস্থিত থাকতে হ'বে, আর সে জান্‌বে, আমিই ক'নে। কোন উপায়ে তারে বিষ খাইয়ে মারতে হ'বে। কেন কি বৃত্তান্ত তা আমি কিছুই জানি না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল! আহা, কে হতভাগ্য আমার বর হইয়াছে জানি না! গোবিন্দ-লালের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বরকে বাঁচানই স্থির করিলাম। গোবিন্দলালের নিকট এক প্রকার বিষ আছে, তাহার প্রভাব পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে! সেই বিষ যাহাতে বরকে খাওয়ান হয়, তাহার তদ্বিরে গোবিন্দ-লাল ফিরিতে লাগিল।

আমি বালকবেশে অতি মনোকষ্টে সেই দিনটি কাটাইলাম। রাত্রি

দ্বিপ্রহরের সময় কোণের ঘর হইতে দিদির কণ্ঠস্বর আমার কাণে আসিল। অতি সাবধানে আত্মগোপন করিয়া চুপি চুপি সেই গৃহের ফাটল দিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা ভাষার প্রকাশ করিতে পারি না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া দেখিলাম, মেজদিদি আমার বরকে সেই বিষমিশ্রিত খাবার হাতে তুলিয়া খাওয়াইয়াছেন। তারপর যাহা যাহা ঘটিল, তাহা দ্বিতীয়চক্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আর দ্বিরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই, আমিই বালকবেশে আমার স্বামীকে গোবিন্দলালের সহায়তায় কি কি উপায়ে উদ্ধার করি, তারপর মঙ্গলাবুড়ীর বাটীর কাণ্ড, স্বপ্নময়ী অন্ধকার বেশে আমি ইহাঁকে খালের ধারে লইয়া যাই। সেই ক্ষুদ্রনৌকায় অন্ধকার আবরণে যে একটি মনুষ্য বসিয়াছিল, সে আর কেহই নহে, গোবিন্দলাল। আমার স্বামীর পলায়ন-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল, এই রায়মহাশয় ওরফে 'বড়মামা'র চতুর্দ্দিকেই গুপ্তচর ফিরিতেছে। নৌকারোহণে যখন পলায়ন করেন, রায়মহাশয়ের কোন গুপ্তচর বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা কর্ত্তৃক নৌকা ডুবিয়া যায়। তারপর ঈশ্বরেচ্ছায় আমার স্বামী, মহোদয় দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কৃপাচক্ষে পতিত হয়েন। তাঁহার বাটীতে অবস্থানের সমুদায় বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এদিকে আমার স্বামীর নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল! এই সময় রায়মহাশয় আমাকে নানাবিধ তিরস্কার ও অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

তারপর শঙ্করনামা যে দেবনারায়ণবাবুর ভৃত্য ছিল, সেও এই রায়মহাশয়ের একজন দলস্থ ব্যক্তি। তথায় আমার স্বামীর অবস্থানের কথা ক্রমে রায়মহাশয়ের কাণে উঠিল। আর কি এই বিশ্বাসঘাতক স্থির থাকিতে পারে? দলবল লইয়া শীঘ্রই সেই দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমিও সেই বালকবেশে গোবিন্দলালের সাহায্যে তথায় উপস্থিত হইলাম। এই দুরাত্মা দেববাজারের কোন ঘর লইয়া এক দোকান খুলিয়া বসিল। আমার স্বামীকে ধরিবার জন্য কতই চক্রান্ত হইতে লাগিল। তারপর দেববাবুর বাটীর কথা সমস্তই উক্ত হইয়াছে। দেববাবুর বাটীর কথা এবং আমার স্বামীর অবস্থিতির কথা, শঙ্কর আসিয়া সংবাদ দেয়।

একদিন দ্বিপ্রহরে আমি চুপি চুপি দেববাবুর বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, অনেক দিন ইহাঁকে দেখি নাইও বটে, আর যদি কোন উপায়ে চুপি চুপি উদ্ধার করিতে পারি, এই বাসনাই তখন বলবতী। কোন ক্রমেই আর সাক্ষাৎ পাইলাম না ; তবে অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, রাস্তার দিকের উপরের ঘরে তিনি নিদ্রিত। তথায় দাঁড়াইয়া আত্মগোপন করিয়া যথাসম্ভব ধীরে ধীরে একটি গান গাহিলাম। মনে ধারণা, যদি আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আমাকে দর্শন দেন। কিছুই হইল না,—অগত্যা ফিরিয়া আসিলাম।

দেববাজার হইতে প্রায় চারিক্রোশ উত্তরে একটি ভয়ানক জঙ্গল আছে, সেই বনমধ্যে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইলাম, তথায় অতি গোপনে কার্য্যানুরোধে সময় সময় বাস করি। সেই দিন সন্ধ্যার সময় শুনিলাম, আমার স্বামী আবার ধরা পড়িয়াছেন—এবং তাঁহার উপর নাকি ভয়ানক পীড়ন হইতেছে! সেই কথা চতুর্দ্দশ চক্রে উক্ত হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, যখন শুনিলাম রায়মহাশয়ের কোন দুর্দ্দান্ত সহকারীকে আমার স্বামী অমিত বলে আঘাত করিয়াছেন, তখন জয়পালকে যথাযথ রূপে উপদেশ দিয়া সেই গৃহে আমিই প্রেরণ করিয়াছিলাম। জয়পাল একখানা কাল কম্বল দিয়া ইহাঁকে অন্ধকার আবরণে কোন একটা অন্ধকার গৃহে লুক্কায়িত রাখিল। যে গৃহে ইনি লুক্কায়িত রহিলেন, সেই গৃহদ্বারে আমি চুপি চুপি আসিয়া আমার স্বামীর কাতরোক্তি শুনিতে পাইলাম, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল! তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য একটি গান চুপি চুপি গাহিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিলাম। তার পর যখন দেখিলাম, দেবনারায়ণবাবুর মৃতপ্রায় দেহ সেই ঘরে রাখাই যুক্তিযুক্ত হইল, তখন আমি আনন্দে বিভোর হইলাম। ভাবিলাম, আজ একটি উপায়ে দু'টি প্রাণ রক্ষা হইল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই আমার স্বামীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে।

তার পর ষোড়শ চক্রের কথা।—আমি আর আপনাকে লুকাইতে পারি না ; আমার অজ্ঞাতস্বামীর সহিত যতই ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল, ততই অধীর হইতে লাগিলাম। দেবনারায়ণবাবুর জীবন প্রাপ্তির পর, সেই কুটীরে আমার স্বামীর সহিত ফিরিয়া আসিলাম, তখন আর আমার বালক-মূর্ত্তি

রাখিবার অভিপ্রায় না থাকায়, আমার প্রাকৃতিক মূর্ত্তির বিশেষ প্রয়োজন হইল। আমার স্বামীকে আমার মূর্ত্তি ফিরাইয়া আমি আপনার মূর্ত্তিতে সোচ্ছ্বাসে আমার স্বামীর নিকট মূর্ত্তি ধরা দিলাম।

এই স্থানে একটি ঘোরতর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার! নির্ম্মলকুমার নিদারুণ মনোবেদনায় ব্যথিত হইয়া যখন মাতুলালয়ে প্রস্থান করেন, এই সংবাদ শঙ্করের নিকট অবগত হইয়া, রায়মহাশয় তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করেন, তদবধি নির্ম্মলকুমার একটা ভগ্নগৃহে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে উদ্ধার করা এই সময় বিশেষ আবশ্যক বুঝিলাম, তাই আমার স্বামীকে রূপান্তর করিয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিলাম। তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আর দ্বিরুক্তির আবশ্যক নাই। দেবনারায়ণবাবুর সংসারের যাবতীয় ঘটনা আমি নির্ম্মলকুমারকে বলিলাম; সেই দিন জয়কালী আমা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দেবনারায়ণবাবুর নিকট উপস্থাপিত করিলাম। তিনি সেই কলঙ্কিনী পত্নীকে আর গ্রহণ করিবেন না, সর্ব্বলোক সমক্ষে বাজারের মধ্যে আনিয়া পত্নী পরিত্যাগ করিবেন;—নির্ম্মলকুমারকে এ কথা বলিতেও অন্যথা করিলাম না। তাই জয়কালী বিসর্জ্জনের পর নির্ম্মলকুমার পিতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

এইবার আমার একটু সামান্য ভুলে আমার স্বামী আবার ধরা পড়িলেন;—অর্থাৎ যখন আমি ইহাঁকে দেববাজারে প্রেরণ করি, সেই সময় গোবিন্দলালকে ইহাঁর সঙ্গে দেওয়া আমার উচিত ছিল। তাহা না করিয়া, আমি একাই সেই ভয়ঙ্কর দস্যুসঙ্কুল স্থানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তাহা হইলেও গোবিন্দলাল কিন্তু অলক্ষিতে ইহাঁকে ইঙ্গিত করিয়াছিল। গোবিন্দলালের ইঙ্গিতের অর্থ এইরূপ; দেববাবুর বাড়িতে যাইবার আবশ্যক নাই, সদর রাস্তার না গিয়া গোপনে বন্যপথ দিয়া কুটীরে আসাই উচিত ছিল। তাহা না করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে জনপ্রবাহে ঝম্প দিলেন, তাহাতেই রায়মহাশয়ের অমোঘ জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন।

অজ্ঞান অবস্থায় ইহাঁকে গারোদখানায় আবদ্ধ করিবার পর হইতে, ইনি জ্বরাভিভূত হন! গোবিন্দলালের ঔষধে এবং তাঁহার শুশ্রূষায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। এই সময়ে রায়মহাশয় আমার উপর ঘোরতর সন্দেহ

করিয়া, ইহঁাকে বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁহার উদ্ধার-কর্ত্তার নাম কিছুতেই প্রকাশ পায় নাই, তাই রক্ষা ; নচেৎ সেই দিন আমাদের সকলকেই প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইত।

ইত্যবসরে একটা লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর কথা আমার কাণে আসিল ! দেব-নারায়ণবাবু নির্ম্মলকুমারকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া তাঁহার গৃহত্যাগের পর, নির্ম্মলকুমার তখন একরূপ অসহায় অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। সেই সময়ে রায়মহাশয় কোন রূপ চক্রান্ত করিয়া নির্ম্মলকে হস্তগত করেন। উঃ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ! যাক্ সে সব কথা পরে বলিতেছি। আমার স্বামীকে কোন উপায়ে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাকে পুনশ্চ বনলতা সাজে সাজাইয়া, সেই ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কাণ্ড দেখাইলাম ! পিশাচী জয়কালী নির্ম্মলকুমারকে গলা টিপিয়া মারিতেছে ! তখন কি কি কাণ্ড ঘটিল, কি উপায়ে নির্ম্মলকুমার রক্ষা পাইলেন, তৎসমুদয় বিংশ-চক্রে প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ম্মলকুমারকে সুস্থ ও সবল করিয়া তাঁহার বাটীতে প্রেরণ করা হইল।

অতঃপর আমার স্বামীকে আমার পিত্রালয়ে আনয়ন করা হইল। এই সময় আর একটি ভয়াবহকাণ্ড উপস্থিত হয় ! জয়কালী এবং তাহার দূরসম্বন্ধীয় ভগ্নী তারাকালী, ইহারা দুই জনেই রায়মহাশয়ের উপপত্নী রূপে গোপনে বাস করিতেছে। এই সময় তারাকালী একটা পুটুলীর জন্য, অর্থাৎ আমার জীবনী-রহস্য এবং দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি যাহাতে আছে, তাহা দেখিবার জন্য মহা পীড়াপীড়ি করে। অধিক কি, ইহার আদ্যন্ত রহস্যও তাহার জানিতে বাকী রহিল না। পাপাত্মা দেখিল বড়ই বিপদ ! তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিল ! আমার পিত্রালয় হইতে ঘোরতর জঙ্গলের মধ্যে একটা ভগ্নগৃহ আছে, সেই নির্জ্জন গৃহটাই রায়মহাশয়ের পাপ অভিনয়ের স্থল' সেই গৃহমধ্যেই তারাকালী হত্যা হয়। তৎপার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড দুরাত্মার কবর ! তন্মধ্যেই তারাকালীকে গোর দেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে আমার স্বামী সেই গৃহ হইতেই দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি সমস্তই প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে তৎসমুদায় দ্বাবিংশ চক্রে বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

এক দিন হটাৎ কোন উপায়ে জানিতে পারিলাম, হরিহর বন্দোপাধ্যায়ের নিকট গুপ্তগৃহের চাবী অতি গোপনে আছে! সেই চাবী হস্তগত করা তখন আমার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল। ইনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে কখনই দেখেন নাই বটে, কিন্তু শশীবালাকে উত্তম রূপ চিনিতেন! হায় হায়! ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে শশীবালা মেজ্ দিদি আমার ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন! হরিহরবাবু এই ঘটনা জানিতেন না। আমাকে শশীবালা-ভ্রমে দিনকতক বড়ই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেদিন শুনিলাম, সেই রত্নগৃহের চাবী ইহাঁর নিকট আছে;—সেই দিন আমাকে একটা ঘৃণিত ও পৈশাচিক কার্য্যের অভিনয় করিতে হইয়াছিল! সে ব্যাপার ত্রয়বিংশ চক্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। তার পর চতুর্বিংশ চক্রের ঘটনা সমস্তই ব্যক্ত হইয়াছে,—তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়; কেবল জয়কালীর নিকট হইতে যে পত্র বিনিময় করিয়াছিলাম, মৎপ্রদত্ত সেই পত্র আর কিছুই নয়, কেবল তাহাকে ভয় প্রদর্শন মাত্র। অতঃপর আমরা নৌকাযোগে কলিকাতায় আমার স্বামীর পিত্রালয়ে আসিলাম। তথায় কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই ষড়বিংশচক্রে বিবৃত হইয়াছে। এই সময়েই আমি স্বামীর অনুগ্রহে আমার পিতৃপ্রদত্ত দলীল দস্তাবেজ সমস্তই পাইলাম বটে, কিন্তু আমার পতিকে রক্ষা করিতে পারিলাম না! তিনি আবার রায়মহাশয়ের নিকট ধরা পড়িলেন!

এই সময়ে রায়মহাশয়ের যুক্তি শুনিয়া আমি হর্ষবিস্ময়ে দিশেহারা হইলাম। সেই যুক্তি পরামর্শ এই; "দ্বীপান্তরে কোন একটা ভয়ানক গারদে এক ব্যক্তি আজি বিশবৎসর কাল আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই কারাগারেই এবার ইনি আবদ্ধ হউন, তথায় যে পর্য্যন্ত উহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, কয়েদ থাকুন।" রায়মহাশয় যে কেন এরূপ ভুল বুঝিলেন, বলিতে পারি না; কারণ সেই কারাগারের বৃদ্ধ বন্দীই ইহাঁর পিতা। যাহা হউক, আমি আনন্দে উন্মত্ত হইলাম। যখন শুনিলাম, আমার স্বামী তথায় বন্দী, তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া গোবিন্দলাল প্রভৃতির সাহায্যে উক্ত স্থানে উপস্থিত হই-লাম। জানিলাম, এই বন্দীদ্বয়ের পরস্পর আলাপ হইয়াছে; কিন্তু ইহাঁরা

যে পিতাপুত্র, তাহা উভয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অতঃপর আমি আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু এবার রায়-মহাশয়ের অতি কঠোর বন্দোবস্ত! হটাৎ কোন সদুপায় করিতে পারিলাম না। গোবিন্দলালের পরামর্শে অচিরে একটি উপায় সংঘটিত হইল। যে ব্যক্তি আহার করাইয়া আইসে, তাহাকে কোন উপায়ে বশ করিয়া কোন রূপে এক খানি আশ্বাসপত্র অন্নচূড়ের ভিতর লুক্কায়িত করিয়া দিলাম। তাহাতে 'অতি শীঘ্রই আমরা উভয়ে মিলিত হইব' এই কথাই লিখিত ছিল।

কিন্তু আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে আমার কোন অনুচর কর্ত্তৃক একটি সুসংবাদ শুনিতে পাইলাম। নীলপাহাড়ের অতি নিকটেই একটি তপস্বিনী বহুদিন বাস করিতেছেন। তখনই যেন কে আমাকে বুঝাইয়া দিল, উনিই আমার সেই দুঃখিনী শাশুড়ী। তখনই নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। কোন কথাই তাঁহার নিকট গোপন করিলাম না। অধিকন্তু অতুল উল্লাসের কথা এই ;—(ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হরিহরবাবুর নিকট হইতে যে চাবী ভুলাইয়া লইয়াছিলাম, সেই চাবী এই রত্নগৃহের) তখনকার কিন্তু আমাদের শাশুড়ী-বধূর হৃদয়োল্লাস আবার যে কি বিষাদে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমার পরম-পূজনীয় তপস্বিনীদেবীর শ্রীমুখে বর্ণিত হইয়াছে।

অগত্যা আবার আমি আমার স্বামীর কারাগারে ফিরিয়া আসিলাম। এই রূপে তিন মাস কাটিয়া গেল। অতঃপর গোবিন্দলালের সাহায্যে যাহা যাহা করিয়াছি, ইহঁাদের অজ্ঞাত পিতাপুত্রের চাক্ষুস-মিলন, রাজাধিরাজের কাল্পনিক মৃত্যু, তদুক্ত এবং মদুল্লিখিত দানপত্রাদি সমুদায় বৃত্তান্তই ত্রিংশচক্রে বিবৃত হইয়াছে। তবে একটি কথা বলিবার আছে, রাজাধিরাজের কাল্পনিক-মৃত্যুর সময় আমি কেন হটাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলাম? তাহার কারণ এই ;— আমাদের প্রতিপালক মামাবাবুর ভয়ঙ্করী জননী সেই অন্ধকারে প্রকাশিত হইয়াছিলেন! আমি সেই জন্যই সারিয়া পড়িয়াছিলাম, তখনকার এই আমার অনুপস্থিতির কারণ!

তার পর শুনিলাম, আমার স্বামী সেই গারদ হইতে পলায়ন করিয়াছেন; অতঃপর যে যে ঘটনা আমা কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই শ্রীল শ্রীমৎ মহারাজার শ্রীমুখে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই রূপে কিছুদিন পর আমার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কোন সংবাদ পাই না;—সেই কয়েক দিন আমি যে কি মনোকষ্টে কাটাইয়াছিলাম, বলিতে পারি না। হটাৎ একদিন আমার কোন বিশ্বাসীচরের মুখে সংবাদ পাইলাম, পরম করুণাময়ের অপার করুণায় ইহাঁরা মাতা-পুত্রে একত্রে সংমিলিত হইয়াছেন। শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ তথায় যাত্রা করিলাম। উপস্থিত হইয়াই অতি গোপনে সমস্ত পরিচয়, সমস্ত কথাই তাঁহাকে কহিলাম। তাহার পর কি অদ্ভুত শুভঘটনায় 'রত্নগৃহ' প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আর আমি কিছুই জানি না, এই আমার শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীপাদপদ্মে বিনীত নিবেদন;—

এই আমার দুর্ভাগ্যময়ী জীবনী !

একচত্বারিংশ চক্র।

সংসার-চক্র ভেদ !

তখন চতুর্দ্দিকে চাহিয়া, ধীর গম্ভীর স্বরে রাজাধিরাজ শ্রীমৎ শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহিতে লাগিলেন,—"রায়মহাশয়, বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় ! তোমাদের দুই মহাশয়কেই বলি, কি শাস্তি দিলে আমাদের মনস্তুষ্টি হয়, তাহা কোন জাতির শাস্তিবিধানে উল্লিখিত নাই। তোমাদের মৃত্যু-

দণ্ডই ইহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু তাহা আমার অভিপ্রেত নয়। মৃত্যু হইলেই ত সকল যন্ত্রণার অবসান হইল; অবশ্য ইহাও নিশ্চয় জানিও, পরম কারুণিক ভগবানের চক্ষে তোমাদের কোন রূপেই পরিত্রাণ নাই। তাহা হইলেও ইহজীবনের পাপ ইহলোকেও কতকটা ভোগ করা উচিত! হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়! তুমি যে কি ভয়ানক পাপে পাপী, তাহা এখন তুমি আপনি মনে মনে বিচার কর। মনে করিওনা যে, সামান্য অনুতাপে তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমি ইংরাজরাজের হস্তে তোমাকে এখনি সমর্পণ করিতে পারি; কারণ তাহাতে তোমার নিশ্চয় প্রাণদণ্ড হইবে! স্বাভাবিক-মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়াই উচিত। অতএব এই আমার ন্যায়-যুক্তিবিচারে প্রতিপন্ন হইতেছে, আমার বরিশাল-পরগণাস্থিত বজ্রপুর গ্রামের লাখেরাজ হাজার বিঘা জমি তোমাকে দান করিতেছি, তথায় তোমার পাপীয়সী পাপসঙ্গিনী পত্নীর সমভিব্যাহারে জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবচ্চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভোগ করিতে থাক।”

মহারাজার বাক্যাবসান হইতে না হইতে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন,—“ধন্য মহারাজ! ধন্য আপনার করুণা! আপনার করুণায় আজ আমি প্রাণ পাইলাম! আর অধিক কি বলিব, আপনার দয়ার সীমা নাই! আর আপনার চক্ষের সমক্ষে বসিতে পারি না। আমি আমার হতভাগিনী পত্নীকে লইয়া এই ক্ষণেই তথায় যাত্রা করিতেছি! শ্রীশ্রীমান ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূপবাহাদুর! আমাকে ক্ষমা কর বাবা! আমি তোমাকে “ব্রজেন্দ্র-ভূষণ” কল্পিত নাম দিয়াছিলাম। তোমার অষ্টাদশবর্ষাবধি আমরা স্ত্রী-পুরুষেই তোমার পিতামাতা ছিলাম। তৎকালাবধি তোমাকে যে স্নেহ মমতা দিয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া কি আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না বাবা? যখন তোমার অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল, তোমার সাবালকত্ব ভয়ে তোমাকে বিবাহের অছিলায় এতাদৃশ পৈশাচিক কষ্ট দিয়াছিলাম। আমি তোমার নিকট কোটীকোটীবার ক্ষমা-প্রার্থী! আমরা স্ত্রী পুরুষে চলিলাম। তুমি তোমার পিতা, মাতা, রাজ-সংসার, অতুল-ঐশ্বর্য্য, রত্নগিরি আর এই মহা-

রাণী দেবীরাণীকে লইয়া সুদীর্ঘ জীবন ভোগ কর। অ
নিকটে মুখ দেখাইতে পারিব না।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

'অতঃপর রোষকষায়িতলোচনে কম্পিতকলেবরে রায়মহাশয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহারাজাধিরাজ কহিতে লাগিলেন,—"আর তুমি রায়মহাশয়! তোমার পাপ হরিহর অপেক্ষাও সহস্রগুণে অধিক! তোমা কোন্ শাস্তি দিলে উপযুক্ত হয়, জান? হস্তপদাদি বন্ধনানন্তর কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া "ডালকুত্তা" দ্বারা খাওয়াইয়া ম মধ্যে ক্ষত-স্থানে লবণের ছিটা দিয়া সংহার করিলে উপযুক্ত দণ্ড হ কিন্তু তাহাও আমি করিব না। হরিহরের সম্বন্ধে যেরূপ বিচার করিয়া তোমার পক্ষেও সেইরূপ বিচার করিব;—যাও, তুমি তোমার দল লইয়া ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী রাইপুর গ্রামের লাখেরাজ হাজার বিঘা লইয়া জীবনাবশিষ্ট কাল অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বাস কর! যাও, পল কর, আর হরিহরের মত পাগলামী করিও না।"

রায়মহাশয় আর কোন কথা না কহিয়া, তৎক্ষণাৎ অনুচরগণসহ হইতে প্রস্থান করিল।

'এতক্ষণে স্থান নিস্তব্ধ হইল! তখন গদগদ ভাবে—পরিপূর্ণ-স্নেহ 'ব্রজেন্দ্র' ওরফে ভূপেন্দ্রনারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বাপ এই নে' তোর রাজ-সংসার! এই রত্নগিরির জন্য আমার সাতপুরুষ কত ক'রেছেন, কেহই সন্ধান ক'ত্তে পারেন্ নি বাবা! আজ তুমিই তা'র আবি ক'র্‌লে। প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি,—আজীবন পরম পুণ্যবান হ'য়ে, এই রাজসংসারে স্ত্রীপুত্র ল'য়ে, সোণারসংসার—স্বর্গের সংসার ভোগ কর।"

"——,তবে এস মা, এস মা দয়ারাণি! ওমা দেবীরাণি! তোমার দেব-তুল্য পতির বামে স্বর্গের শোভা ক'রে একবার বোস মা! আমরা স্ত্রীপুরুষে নয়ন সার্থক করি। গোবিন্দলাল, বিজয়, জয়পাল, গঙ্গাধর! তোমরা আমার সাক্ষী হও। তোমরাই আমার পুত্রের ও পুত্রবধূর পরমহিতৈষী। তোমরা সকলে যথাযোগ্য-পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আমার বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

জয় জয় রবে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল!

"তবে এস এস তপস্বিনি! পূর্ব্বশোক ভুলে যাও! আজ কুড়িবৎসরের ার আমার পুত্র পুত্রবধূর চাঁদমুখ দেখে আমার বিরহ ভুলে যাও। এঁদের াজত্ব দিয়ে—রাজারাণী ক'রে, চল আমরা দেশান্তরিত হই! এস বীরজা- দবি! এস বৎস ভূপেন্দ্রনারায়ণ! তোমাদের সমস্ত সংসার বুঝিয়ে দিয়ে ামরা মহাপ্রস্থান করি।"

হা জগদীশ! ধন্য তোমার সংসার-চক্র! এই চক্রে াড়িয়া ব্রজেন্দ্রভূষণের মত নিষ্পেষিত বালক যেন ভূপেন্দ্র- ারায়ণের ন্যায় পরিণামে সুখী হয়। এই সংসার-চক্র যেন াদর্শ-সংসার হইয়া, পথের ধূলিপ্রায় অতি দীনদুঃখী ব্রজেন্দ্র- ষণ—শ্রীশ্রীমান ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূপবাহাদুর মূর্ত্তিতে রিণত হয়! ধন্য, ধন্য, সংসার-চক্র!
